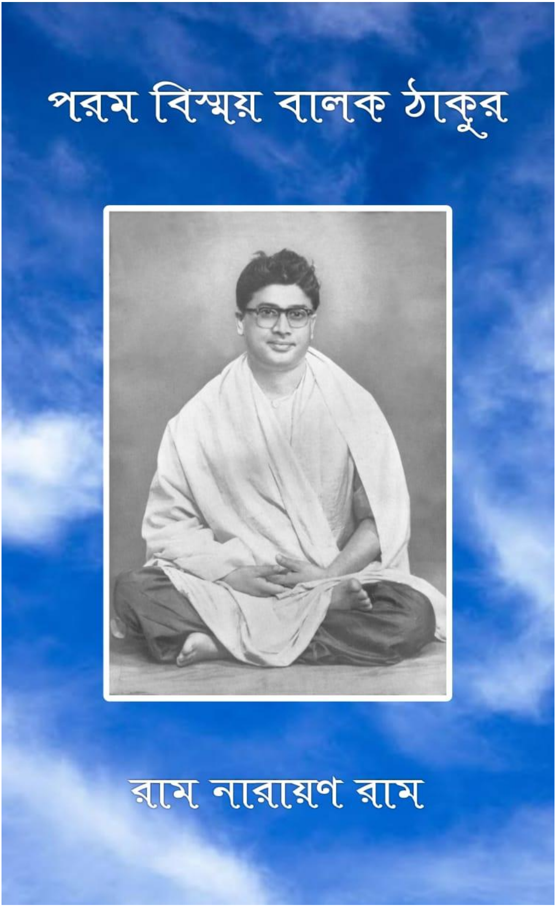
পরম বিস্ময় বালক ঠাকুর
রাম নারায়ণ রাম

পরম বিস্ময় বালক ঠাকুর

[জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
তত্ত্বময় জীবনের কয়েকটি কাহিনী]

রায়দা

প্রথম পর্ব

[মেদিনীমণ্ডল, উজানচর-কৃষ্ণনগর]

।। প্রথম পর্ব প্রকাশকাল – দোল পূর্ণিমা, ৬ই চৈত্র, ১৩৮৭
ইংরাজি ২০শে মার্চ, ১৯৮১

সূচীপত্র

বিষয়সূচী

প্রথম পর্ব

ভবিষ্যদ্বাণী

মাতুলালয় ও পৈতৃকভিটা

১। মহা আবির্ভাব।

২। অষ্টসিদ্ধির প্রকাশ।

৩। ধ্যানমগ্ন শিশু – লঘিমা।

৪। তত্ত্বরূপী শিশু – লঘিমা – প্রকৃতি নিয়ন্তা।

৫। তত্ত্বের স্ফুরণ – অত্যাশ্চর্য বিভূতি।

৬। পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ – তত্ত্বোপদেশ – অলৌকিক শক্তির প্রকাশ।

৭। একু হাজরার স্কুল – আশু মজুমদারের দীক্ষা।

৮। ভোলা গিরির সঙ্গে সাক্ষাৎ - দরদী বালক – তত্ত্বময় ভাষণ – বিভূতির সমাবেশ।

৯। মনাই ফকির – অলৌকিকত্ব প্রকাশ – রোগ নিরাময় – স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়াস।

১০। তত্ত্বালাপ - স্বপ্নে দীক্ষাদান – অণিমাদি বিভূতি –সংস্কারমুক্ত ধারা ।

১১। স্কুলে শিক্ষারম্ভ – কাঞ্চন মিঞা – স্কুল স্পোর্টস – বাস্তবভিত্তিক সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা – মৃতে প্রাণদান - অশ্বিনী চ্যাটার্জীর দীক্ষা – মাস্টারদা – অলৌকিক শক্তি।

১২। সহস্রারের সূর্য – সবার জন্য অসীম দরদ – সামাদের পিতা – বৈষম্যবিহীন -শোষণমুক্ত সমাজ-চিন্তা - পাহাড় পরিক্রমা – ঐশীশক্তির প্রকাশ।

১৩। উপনয়ন – নাগাসন্ন্যাসী – প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র – খেলাচ্ছলে শিক্ষাদান – পাহাড় পরিক্রমা - অলৌকিকত্বের প্রকাশ।

১৪। স্বাবলম্বী সংস্কারমুক্ত দরদী বালক – পাহাড় পরিক্রমা, তত্ত্বোপদেশ – অলৌকিক শক্তি – লোকশিক্ষা।

১৫। হাডুডু প্রতিযোগিতা – বাস্তব সমস্যার সমাধান – অলৌকিক বিভূতি, কায়াব্যূহ – স্কুলের পরীক্ষা।

১৬। স্কাউটসে – দেশাত্মবোধ – চন্দ্রনাথ পাহাড়ে – বাস্তবজীবন – তত্ত্বালাপ, ঐশীশক্তির প্রকাশ।

১৭। দেশাত্মবোধ – সমাধানের চিন্তা – গলাকাটা সন্তোষ – অলৌকিক ঘটনা – আনন্দময়ী মা-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ - তিব্বতী সাধক, তত্ত্বালাপ - খেলাচ্ছলে উপদেশ – ষোড়শী।

১৮। আড়াইহাজার জমিদার বাড়ী – সুধীর বোসের পুনর্জীবনলাভ – যোগেশ চৌধুরীর দীক্ষা – স্বপ্নাদেশ – তত্ত্বালাপ – কৃষ্ণধনবাবুর সন্তানলাভ।

১৯। রাজেন চৌধুরীর দীক্ষা – তত্ত্বালাপ – বাস্তব সমাধান – মৃত শিশুর পুনর্জীবনলাভ – অলৌকিক শক্তির প্রকাশ।

২০। মান্না মিঞার পিতা – সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ - সন্ন্যাসীর গৃহে প্রত্যাবর্তন – অণিমা – পাহাড় পরিক্রমা, তত্ত্বালাপ – অণিমাদি অলৌকিক শক্তির সমাবেশ।

পূর্বাভাস

"প্রকৃতির প্রকৃত তত্ত্ব আমার সবটাই জানা আছে। শুধু আমাকে তোরা এখানকার ভাষাটা শিখিয়ে দে - দেখবি কী জিনিস তোদের দিয়ে যাই!" - শিশু বয়সে সাথীদের যা বলতেন, আজও সেই কথাই বলেন। প্রচলিত শিক্ষালাভ করবার তাঁর অবকাশ হ'ল না। এখানকার শাস্ত্র–পুরাণ-দর্শনের সাথে পরিচিত হবার সুযোগও হয়ে উঠলো না। নিজে নিজে পড়ে যে আয়ত্ত করবেন তাও সম্ভব হল না, কারণ ভক্ত-শিষ্যদের ভীড় এত বাড়তে শুরু করলো যে নিজের বলে এক মুহূর্ত সময়ও তিনি পান না। ক্লাসে পড়ছেন, সেখানেও দরজার সামনে ভক্ত-শিষ্যেরা ভীড় করে দেখে তাঁদের গুরুদেব কি ভাবে ক্লাস করেন। ভক্ত-শিষ্যদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, কারণ যিনি তত্ত্বের সাগরে সবাইকে অবগাহন করাচ্ছেন, যাঁর অপূর্ব বিভূতির প্রকাশে সকলে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, তিনিই আবার সাধারণ ছাত্রের মত স্কুলের ক্লাসে বসে পড়া দিচ্ছেন, অঙ্ক কষছেন। কি আশ্চর্য! এখানেই শেষ নয়, মাঝে মাঝে ভক্ত-শিষ্যেরা হেডমাস্টারমশাইকে ধরতেন, "আমাদের গুরুদেবকে আজ একটু ছুটি দিন, আমরা অমুক জায়গায় বিশেষ একটা কাজে নিয়ে যাব।" অনেকেই তার মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাই হেডমাস্টারমশাই আপত্তি করতে পারতেন না। এইভাবেই তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছে – শেষে পড়াশুনা করা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না দেখে শিক্ষাজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে ঢাকা শহরে চলে গেলেন।

বাস্তবের দিক থেকে দেখতে গেলেও বেদজ্ঞ পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের ধারার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে ঠাকুরের মধ্যে। সমাজের স্বীকৃত এবং উচ্চস্তরের মানুষ নিয়েই শুধু তিনি

ব্যস্ত থাকেন নি। সর্বস্তরের মানুষকে বেদের ধ্যানে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলাই তাঁর আশৈশব প্রচেষ্টা।

প্রকৃতির বেদ হাতে নিয়ে, সহজাত সংস্কারবশে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়ে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মতই বৈদিক-সমতার ধারা সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। সহজাত জ্ঞান নিয়ে এসেছেন বলেই পুঁথিগত বেদ পাঠ করার প্রয়োজন তাঁর কখনও হয় নি। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীর মধ্যেই সমস্ত বেদের সারকথা, সারতত্ত্ব ছড়িয়ে আছে। সেই-জ্ঞান, সেই-ভক্তি, সেই-প্রেম দান করেই তিনি খুশী - প্রতিদানে কিছু চান না। তাঁর কথায় বলতে গেলে “ফুল বাগানের মালী আমি, ফুল ফুটলেই আমার আনন্দ। তোমরা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠো, তাতেই আমি খুশী।” বাস্তবের প্রয়োজন মেটাবার জন্য তাঁর পূর্বপুরুষদের মতই তিনি শ্রমদান করে উপার্জন করাটাকেই শ্রেয়: মনে করেন। ধর্মের নামে কারও দান বা অযাচিত অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল হতে চান না। কেউ যদি কখনও তাঁর জন্য ভালবাসার নিবেদন হিসাবে কিছু নিয়ে আসে - যা উপেক্ষা করলে তার মনে আঘাত লাগতে পারে, তা তিনি গ্রহণ করলেও সবার মধ্যে বিলিয়ে দেন।

শিশুবয়স থেকেই চরিত্রের এইসব বিশেষত্ব তাঁকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে। শ্রমে তিনি কখনই বিমুখ ন’ন, তাই আমরা দেখি তাঁর ছোট চৌচালা ঘরটি নিখুঁতভাবে লেপে-মুছে সাজিয়ে রাখতেন প্রতিদিন। একদিকে কাছারীবাড়ীর কোলাহল, দ্বন্দ্ব, কলহ – অন্যদিকে অদ্ভুত শান্তিময় সেই স্নিগ্ধ কুটীরখানি। ঠাকুর নিজের হাতে ভক্তদের সাহায্য-সহযোগিতায় গড়ে তুলেছিলেন এই ছোট্ট কুটীরখানি। বাঁশের বেড়া, মুলিবাঁশের চাল - তার উপরেই লতিয়ে উঠেছে কুঞ্জলতা - চালটি আর দেখা যায়

না। শুধু দেখা যায় লাল ফুলে ভরা সেই সবুজ লতা। সামনের ছোট বাগানটি নানারকম সুগন্ধী ফুলের গাছে সজ্জিত। ঠাকুরের নিজের হাতের পরিচর্যায় গাছগুলো সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছে। বাইরে থেকে শুধু দেখা যায় ফুলে সাজানো একটি বাগান; তাতে যেমন শিউলি, গন্ধরাজ, গোলাপ, স্থলপদ্ম, কদম, তেমনি আবার গাঁদা, বেলি, জুঁই, চাঁপা। গাছগুলো দেখে মনে হয় যেন কে সযত্নে ছেঁটে ছাতার মত তৈরী করেছে - কিন্তু তাদের ছাঁটতে হয় নি, আপনিই তারা ঐভাবে বেড়ে উঠেছে।

গাছের তলার মাটি সুন্দরভাবে গোবর দিয়ে লেপা। ঘর আর বাইরের কোনও তফাৎ নেই। গাছের ছায়ার তলে ঠাকুর বসে থাকতেন ধ্যানমগ্ন হয়ে, ভক্তেরাও আশেপাশে বসে পড়ে তাঁর দেওয়া নাম নিয়ে। শিউলিফুল তাঁর সমস্ত শরীরকে আচ্ছাদিত করে দেয় - যেন ফুলের সার্থকতা এখানেই। ঠাকুর মাঝে মাঝে এখানে চড়ুইভাতি করেন সঙ্গীসাথী সহপাঠীদের নিয়ে। ঠাকুর নিজেই রান্না করেন, যোগান দেয় অমল, নরেশ, সামাদ, আওয়াল, তাসাদ্দাক, মান্না, আব্বাস-রা। সংস্কারকে রাখেন আবার সংস্কারকে ভাঙ্গেন একই সঙ্গে, তাই তাঁর কাছে সহপাঠী, সাথী সবাই সমান – হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। তাঁর রহস্যময় জীবনে এটারই পুনরাবৃত্তি বারবার দেখা যায়। ঠাকুরের হাতের উপাদেয় রান্নার স্বাদ পরিতৃপ্তিসহকারে খেয়ে কেউ ভুলতে পারে না। এইভাবে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়ে তাঁর সমত্ববোধ, সংস্কারমুক্ত বাণী কর্মের মাধ্যমে প্রচার করে যান।

‘কর্মই ধর্ম’ মুখে বলেই তিনি শেষ করেন না, বাস্তবে তা রূপায়িত করে ছাড়েন। তাই তো লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমান, অচ্ছুৎ হরিজন তাঁর কাছে সমান আদরে কোল পায়, সমান

স্নেহের স্পর্শের অংশীদার। কোনও বাধ্যবাধকতা নেই তাঁর কাছে, তাঁর অনন্ত প্রেম-ভালবাসার টানেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করার জন্য।

ছাত্রাবস্থাতেই দুই-একজন সাথী নিয়ে দূর দেশে যেতে শুরু করলেন স্কুলছুটির ফাঁকে ফাঁকে। লং পাহাড়ে প্রোথিত ত্রিশূল যেদিন অনায়াসে তিনি তুলে ফেললেন, পাহাড়ের মানুষ সেদিন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে দলে দলে তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করলো। অনেকেই অনেকভাবে (কিংবদন্তী অনুসারে) শিবের প্রোথিত এই ত্রিশূল উত্তোলন করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কেউই কৃতকার্য হ'ন নি। প্রবাদ আছে যে, শিব স্বয়ং বা শিবতুল্য শক্তিমান পুরুষ ছাড়া সেই ত্রিশূল কেউ তুলতে পারবে না। সুতরাং পাহাড়ের মানুষ যখন বালক ঠাকুরকে সেই ত্রিশূল অনায়াসে তুলে ফেলতে দেখলো, তাদের আর কোন দ্বন্দ্ব-দ্বিধা রইলো না। আবার এর জন্য কিছু শক্তিমান সাধকের তিনি ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বালক ঠাকুরের পরম শক্তির কাছে হার মেনে তারা তাঁর শ্রীচরণে আশ্রিত হলো।

আবির্ভাবমুহূর্ত থেকে যে অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখা যায়, বয়স বাড়বার সাথে সাথে তার উৎকর্ষ, অভিনবত্ব বেড়েই চলে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়ে শত-সহস্র মানুষকে অভিভূত করে। ইতিহাসের পাতায় এই বিভূতিময় জীবনের তুলনা মেলা দুষ্কর। কোন ছয়দিনের শিশু হস্তসঞ্চালনে প্রকৃতির বারিধারাকে ডেকে আনতে পারে, স্তব্ধ করতে পারে - আবার সারাদিন ধরে বর্ষণ করাতে পারে? কোন দুই বছরের শিশু লঘিমা শক্তির বিকাশে ছাদ থেকে ধীরে ধীরে পালকের মত পড়ে প্রায় ওজনবিহীন অবস্থায় বৃদ্ধের কোলে অবতরণ করতে পারে? কোন পাঁচ বছরের শিশু - তরঙ্গময় নদীর উপর দিয়ে

খড়ম পায়ে দিয়ে ছুটে যেতে পারে বা ধ্যানাসনে বসে ভেসে চলতে পারে? শুধু অণিমা, ব্যাপ্তির কথাই যদি ধরা যায়, বালক ঠাকুরের জীবনে কয়েক সহস্র ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে। - নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে দূরবর্তী স্থান থেকে ঘুরে আসা তাঁর কাছে সহজ কথা। একই সময়ে দুই জায়গায় অবস্থান করে বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকার ঘটনাও অজস্র - দুই জায়গায় সঙ্গত কারণে মানুষ মনে করে ঠাকুর তাদের কাছে রক্ত-মাংসের শরীর নিয়েই আছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর বিভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে, আর তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তি কখনো নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন না।

কেউ যদি কখনো তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা তোলে, তিনি সহজভাবে বলেন যে এই শক্তি সবার ভিতরেই আছে, শুধু চর্চার অভাব। কেউ বিভূতির কথা বললে, তিনি বলেন যে ‘তত্ত্বই তাঁর বিভূতি।’ সেই পাঁচবছর বয়স থেকে যে অপূর্ব তত্ত্বের স্ফুরণ হয়ে চলেছে, আজও সেই তত্ত্ব একই ধারায় চলেছে। দুরূহ কঠিন তত্ত্বকে তিনি সহজ সরল করে মানুষের মাঝে বিতরণ করে চলেছেন - যেন অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্য তাঁর নখদর্পণে। এখানেই পরমবিস্ময় - যাঁর কোন দর্শন-শাস্ত্র-পুরাণ দেখবার সুযোগ জীবনে হয় নি, কি করে তিনি এত সহজ-সরল ভাষায় সৃষ্টির সমস্ত তথ্যের তত্ত্বকে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছেন! সহপাঠীদের তিনি প্রায়ই বলতেন, “আমি ‘উবাচ’র মধ্যে নেই, আমার তত্ত্ববাণীই আমার শাস্ত্র।” প্রতিটি কথায় তাঁর আছে যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তি।

বালক ঠাকুর সম্বন্ধে লিখতে গেলে লেখা আর শেষ হয় না, সুতরাং বিক্ষিপ্ত ঘটনা বেছে বেছে দেওয়া ছাড়া উপায়

নেই। কারণ তাঁর জীবনের একদিনের ঘটনা যদি কেউ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিবেশন করতে চায়, তবে একটি বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। কারণ হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন তাঁর সংস্পর্শে আসছে এবং তিনি অক্লান্তভাবে তাদের প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন, তার মধ্যেই যে কত বিভূতি ঘটে যাচ্ছে তার হিসাব রাখা কঠিন। আবার তার মধ্যেই চলছে তাঁর তত্ত্বের স্ফুরণ। সুতরাং সহজেই বোঝা যাবে যে এই গ্রন্থটির মত মোটামুটি একটি সময়ানুক্রমিক গ্রন্থে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংক্ষিপ্ত-আকারে লিপিবদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। যে সব ঘটনা দেওয়া হ'ল, সেইরকমের বহু ঘটনাই আছে – একই রকমের ঘটনা বহু ভক্তের জীবনেই ঘটেছে - শুনলে মনে হবে যেন একই ঘটনার পুনরুক্তি হচ্ছে, কিন্তু আসলে প্রতিটি ঘটনা পৃথক এবং সময়সীমাও সবসময়ে এক নয়। আবার এমন ঘটনাও আছে যে, একই সময়ে বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন এলাকায় ঠাকুরের দর্শন পেয়েছে।

সময়-অনুক্রম মোটামুটি ঠিক রেখে ধারাবাহিক ভাবে কিছু কিছু ঘটনা এবং তৎকালীন তত্ত্বের স্ফুরণ, যতটা সংগ্রহ করা গেছে, লিপিবদ্ধ করাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য, যাতে শিশুবয়স থেকে বয়সের কোঠায় পা দেওয়া পর্যন্ত কি ভাবে তাঁর জীবনধারা চলেছে তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে একথা বলতে হবে যে, সবসময়ে সঠিক সময়সীমা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। যদিও তিনি জন্মসিদ্ধ হয়ে বিরাট অলৌকিক শক্তি এবং পরম তত্ত্বের ভাণ্ডার নিয়ে এ ধরায় এসেছেন, তবুও বাস্তবকে তিনি দূরে ঠেলে ফেলেন নি, বাস্তবের সব দায়দায়িত্ব, বয়সোচিত খেলাধূলা সবই তিনি সুচারুরূপে করে গেছেন। যেটাতে ঠাকুর হাত দিয়েছেন, সেটাতেই তাঁর চরম নৈপুণ্য দেখা

যায়। তাঁর অনন্ত প্রেম-ভালবাসার যেমন তুলনা হয় না - সে মানুষের জন্যই হোক বা জীবজন্তুর জন্যই হোক, তেমনি তাঁর দেশাত্মবোধেরও কোন তুলনা হয় না। তাই তো চারণকবি মুকুন্দদাস আর মহান বিপ্লবী সূর্য সেন প্রায়ই একই সুরে বলেছিলেন, "বালক ঠাকুর, তুমিই পারবে দেশে একটা পরিবর্তন আনতে।" ঠাকুরের বয়স তখন দশ-এগারো।

অসীমের অসীমত্ব, বিরাটের বিরাটত্ব যেমন বর্ণনায় আনা যায় না, তেমনি বালক ঠাকুর যে কত বড় বিরাট, তা বাস্তবের মাপকাঠি দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সমর্পণ করে প্রার্থনা করি - যেন তিনি তাঁকে সম্যক উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টি আমাদের দেন।

ভূমিকা

বাল্যলীলাক্ষেত্র উজানচর-কৃষ্ণনগরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বিভূতির প্রকাশ দেখা যায়, বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঠাকুর সেই অলৌকিক শক্তির বিকাশকে ক্রমে সংযত করেন। তবু ঢাকাতেও তাঁর বিভূতির অন্ত ছিল না। একদিকে যেমন তত্ত্বের সাগরে সবাইকে প্লাবিত করেন, অন্যদিকে অলৌকিক শক্তির বিকাশে মানুষকে মুগ্ধ করেন। ইস্টবেঙ্গল টাইমস্ পত্রিকার প্রতিনিধিরা তো আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে – কেন তিনি এত বিভূতি দেখান? উত্তরে ঠাকুর যা বলেন, পত্রিকায় ওরা তাই ছাপিয়ে দেয় –

"কেন তিনি অলৌকিক বিভূতি দেখান? - এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগে। তাঁর (ঠাকুরের) কথা থেকে আমি যা বুঝেছি তা হ'ল – শিক্ষিত সমাজের যে, বিরাট অংশ, যারা কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না, তাদের তিনি বুঝিয়ে দিতে চান যে, তাদের দাম্ভিক দর্শনের বাইরেও অনেক কিছু আছে। সন্দেহাকুল নাস্তিকদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আমাদের এই বস্তুজগৎ এবং এই বাস্তবদেহ সেই অখণ্ড অনন্ত সত্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র; সুতরাং বাস্তব সম্পদের মালিকানার জন্য সর্ববিধ্বংসী, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাঁর কাছে এই বিভূতি হচ্ছে মানুষকে কাছে টেনে আনার জন্য একটা আধার - যাতে মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে তাঁর উপদেশ-নির্দ্দেশের মাধ্যমে বুঝতে পারে যে, তাদের প্রকৃত সত্তা হচ্ছে তেজ, চৈতন্য ও প্রেমের অখণ্ড সত্তা। এ ছাড়াও তিনি চান যে, অলৌকিক বিভূতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হোক।"

অনেক নামকরা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছেন, কিন্তু তাঁরাও আর পাঁচজনের মত শুধু অভিভূত হয়ে দেখেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন। 'অলৌকিক ঘটনা, আশ্চর্য ঘটনা' বলেই শেষ করেছেন, কিন্তু কেউ বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'বিভূতি কি করে দেখান' তার সমাধান করার দিকে মনোনিবেশ করেন নি। বোধ হয় সাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা দিয়ে অলৌকিক ঘটনার বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয় বলেই তাঁদের বৈজ্ঞানিক মন এদিকে বেশী দূর এগোতে পারে নি। ঠাকুর নিজে যে যুক্তি দিয়ে অলৌকিক শক্তির বিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করেছেন, তাতেই সবাই সন্তুষ্ট হয়েছে।

বোবা লোকটি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর ঠাকুর তার ব্রেনের চিত্রটি আঁকলেন, সেটি ডাক্তারী বইতে ব্রেনের যে ছবি দেখা যায় সেইরকম কতকটা দেখতে হলেও, ব্রেনের এত জটিল নক্সা কেউ দেখাতে পারে নি তখন পর্যন্ত। সেই ছবির মধ্যে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রী আঁকা হয়েছে, যেগুলো ডাক্তারী শাস্ত্রে তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তারইমধ্যে একটি স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র খুঁত (spot), তার জন্য নাকি বোবাটি কথা বলতে পারছে না। এটা যে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কল্পনার বাইরে, তাদের জ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে সুতরাং তারা ঠাকুরের অলৌকিক শক্তিতে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে? শুধু ডায়াগনোসিস্ করে এঁকে দেখিয়েই ছেড়ে দিলেন না ঠাকুর, তাকে সুস্থও করে দিলেন – কয়েক দিনের মধ্যে সে বাকশক্তি ফিরে পেল। ["প্রত্যক্ষ অনুভূতি" পাণ্ডুলিপি – বিশ্বপদ দাশগুপ্ত]

নিজের দেহকে যখন ক্ষুদ্র করতে করতে বাষ্পাকারে পরিণত করে কখনও এক ঝলক আলোর মত, কখনও বা অদৃশ্য হয়ে বদ্ধ ঘরের থেকে বেরিয়ে যান, – সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখে। কখনও আবার এক জায়গায় বসে কথা বলছেন আবার সেই মুহুর্ত্তে দূরবর্তী আরেক জায়গায় উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন কাজ করে আসেন এবং তার নিদর্শনও রেখে আসেন। মানুষ দেখে বিস্মিত হয় – বুদ্ধির অগম্য বলে, কিন্তু এরও যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে সেদিকে বিশেষ নজর দেয় না।

হাসপাতাল থেকে ফেরৎ-দেওয়া আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান টি.বি. রোগীকে যখন সাতদিন প্রখর রৌদ্রতাপে বসিয়ে রেখে রোগমুক্ত করে দেন ঠাকুর, ডাক্তারেরা অবাক হয়ে দেখে নিখুঁত এক্সরে রিপোর্ট, আশ্চর্য হয়ে যায় – কি করে এটা সম্ভব হ'ল! কিন্তু যে শক্তি ব্রেনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীর দোষ দূর করে বাকশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারে, যে শক্তি স্থুল দেহে এক জায়গায় অবস্থান করে অদৃশ্য করে ফেলতে পারে, যে স্থুল দেহে এক জায়গায় অবস্থান করে, একই রকম আরেকটি দেহ নিয়ে রোগে আক্রান্ত মৃত্যুপথের যাত্রীকে শুধু রৌদ্রতাপে রেখে নিরাময় করতে পারে, সেই শক্তির উৎস কোথায়, কি করে সেই শক্তি অর্জন করা যায় – সেই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা কোথায়? এক শ্রেণীর মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করেই শেষ করে, আর এক শ্রেণীর মানুষ "বিশ্বাস করি না", "এ কখনও সম্ভব?", "এ হতে পারে না" বলে শেষ করে। কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে যখন মানুষ বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে প্রকৃতিকে জানতে চাইছে, প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের আয়ত্তাধীনে আনতে চাইছে, তখন বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের এই বিষয়ে কৌতূহলের অভাব কি তাদের সীমিত জ্ঞানের কথাই প্রকাশ করে না? তাদের গবেষণা কি শুধু মানুষের ধ্বংসকল্পে মারণাস্ত্র উৎপাদন করার জন্য? সেখানেও মনন শক্তির অলৌকিক বিকাশের কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হবে। তিব্বতের কাছে একটি পাহাড়ে, স্বচ্ছ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মানুষ, বালক ঠাকুরের কাছে যে প্রশ্ন রেখেছিল, কথাপ্রসঙ্গে সেই কথাটি মনে পড়ছে, "মনন শক্তি দিয়েই যখন একজনের সঙ্গে আরেকজন ভাবের আদানপ্রদান করতে পারে, তখন তোমাদের ঐ সব (টেলিগ্রাফ, টেলিফোন) যন্ত্রের কি দরকার?"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লোকে লোকারণ্য আড়াইহাজারের জমিদার বাড়ীতে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তারই বা ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কি হবে? একদিন কথায় কথায় ঠাকুর বলেছিলেন, "আমি যদি কখনও শুয়ে

থাকি - আমাকে না জিজ্ঞাসা করে স্পর্শ করবে না।” ......সেদিন ঠাকুরের তত্ত্বালাপ শুনতে জমিদার বাড়ীর বিশাল কামরাটিতে সকলেই উপস্থিত। সবাই ভাবল, ঠাকুর একটু বিশ্রাম করছেন। এ অবস্থায় তাদের অপেক্ষা করা উচিত। মশা তাড়াবার জন্য দু'জন বাতাস করছে - কিন্তু একি ব্যাপার! শুয়ে থাকলেও ঠাকুর ১০/১৫ মিনিটের মধ্যেই আবার উঠে পড়েন। কিন্তু সেদিন ২/৩ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, ঠাকুর একই ভাবে শুয়ে – নিথর নিস্পন্দ। দেখে মনে হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে না; শক্ত পাথরের মত পড়ে আছেন। স্পর্শ করার আদেশ নেই – তাই সবাই নিঃশব্দে বসে আছে। মনে যে একটু দুশ্চিন্তা নেই - তা নয়। দেখে বেশ বোঝা যায় যে এটা স্বাভাবিক বিশ্রাম নয়। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হ'ল – ঠাকুর ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। বাড়ীর বর্ষীয়সী মহিলা নৈশবালা প্রশ্ন করলেন, “ঠাকুর, আমরা তো সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তুমি তো এতক্ষণ এভাবে থাক না, কি হয়েছিল তোমার?” ঠাকুর বললেন, “যুদ্ধ চলছে তো! বিপদে পড়ে বহুদূর থেকে লোক ডাকছে, না গিয়ে পারছি না। তাই দেরী হ'ল ফিরতে।”

এই রকম বহু জায়গায় বহু ঘটনা ঘটেছে। উজানচর-কৃষ্ণনগর থেকে চলে আসবার কয়েক মাস আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা ঠাকুরের সহপাঠীদের মনে একটা গভীর দাগ কাটে। গতবার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেন নি – তাই সেবার ঠাকুর ঠিক করলেন ‘শেষ বারের মত একটা চেষ্টা করে দেখবেন।’ আরো দুটি সহপাঠী আসেন – একজন মুসলমান আর একজন হিন্দু। তিনজনে একসঙ্গে পড়াশোনা করেন! ঠাকুর ওদের বলেছিলেন, “আমি যদি কখনও শুয়ে পড়ি দেখিস, আমাকে ডাকবি না বা স্পর্শ করবিনা। তোরা তোদের মত পড়াশোনা করে চলে যাবি। আমি পরে একসময়ে পড়ে নেব।” সেদিন সহপাঠী দুজনে এসে দেখে ঠাকুর কাছারীর ঘরে শুয়ে আছেন।

ওরা কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, ঠাকুর পাথরের মত নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন, শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে না। ভয় পেয়ে পায়ে হাত দিয়ে দেখে বরফের মত ঠাণ্ডা শরীর। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল টিপেও কোন সাড়া পেল না। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে ওরা ঠিক ক'রল, বাড়ীতে একটা খবর দিতে হবে। কাছে কেউ নেই যে তাকে দিয়ে খবর পাঠাবে, একাও কেউ ঠাকুরের কাছে থাকতে সাহস পাচ্ছে না। সুতরাং তারা ঠিক ক'রল, বাইরে থেকে দরজায় শিকল এঁটে দিয়ে ওরা বাড়ীতে খবর দেবে। শিকল এঁটে ঠাকুরের বাড়ী যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াতেই ওরা দেখে ঠাকুর পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন, বলছেন "আমি মরিনি রে মরিনি, এই দেখ আমি বেঁচে আছি।" সহপাঠীরা একটু ধাতস্থ হলে পর ঠাকুর বললেন, "আমি শুয়ে থাকলে তোদের ছুঁতে নিষেধ করেছিলাম না! কথা শুনলি না তো।" ওরা স্বীকার করলো যে ভয় পেয়ে ওরা ঠাকুরের নির্দেশ ভুলে গিয়েছিল।

'বিশ্বাস করি না' বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ পথ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে এই ঘটনার মূল তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করা কি উচিত নয়?

তাঁর অলৌকিক শক্তির বিকাশকে বুঝতে হলে জন্মের পূর্ব থেকেই যে সব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি অনুধাবন করতে হবে। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব তাঁর মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের কাছে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মাতুল বংশের ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষে ভাগিনেয়রূপে অবতীর্ণ হয়ে বালক ঠাকুর শিশুকাল থেকে চরম অষ্টসিদ্ধির প্রকাশে সবাইকে অভিভূত করেন। পাঁচ বছর বয়স থেকেই সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্বের স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ মানুষকে মুগ্ধ করে।

যোগীবর লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও ত্রৈলঙ্গস্বামী অর্ধ্বশতাব্দী পরে পূর্ণব্রহ্ম অবতারের দর্শনলাভ করার যে আশ্বাস সাধক অশ্বিনী চ্যাটার্জীকে দেন,

অপ্রত্যাশিতভাবে অশ্বিনী চ্যাটার্জীর অর্ধমন্ত্র পূর্ণ করে দিয়ে বালক ঠাকুর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সময়সীমা রক্ষা করেন।

প্রায় পূর্বনির্দিষ্ট সময়েই যোগেশ চৌধুরীকে লোকনাথ ব্রহ্মচারীপ্রদত্ত গেরুয়া কাপড়খানি পরে এসে দীক্ষাগ্রহণ করতে বলে, পূর্ণব্রহ্ম যে তিনিই – তার সঙ্কেত দেন। বালক ঠাকুর তখন বালক মাত্র।

প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে রোগশয্যায় শায়িতা মুমূর্ষু ষোড়শী ঠাকরুণের স্বপ্নে দেখা সেই অপরূপ দেবমূর্তির জীবন্ত রূপায়ণ নবীন যুবক বালক ঠাকুরের মধ্যে দেখে ষোড়শী ঠাকরুণ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমার আর দুইহাত কোথায়?"

হিমালয়বাসী মহাশক্তিধর যোগী আদিত্যনাথ বাবা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'সময় পূর্ণ হয়ে এসেছে, লগ্ন নিকটে। এবার তিনি নিজেই আসবেন, স্থাপন করবেন নূতন ধর্মরাজ্য। একটি সর্বপরিপ্লাবী ধ্বংসাত্মক লীলা অনুষ্ঠানের পর শুরু হবে নবসৃষ্টি। যুগের ভিতরেই ঘটবে যুগান্তর। .....তিনি আবির্ভূত হবেন এই বাংলারই বুকে।'

এ ধরায় বালক ঠাকুরের আবির্ভাব কম বিস্ময়কর নয়। ঘোর অমাবস্যার রাত্রে, কালীপূজার শুভ লগ্নে প্রসববেদনাহীন মাতা চারুশীলাকে বিস্মিত করে যে স্বয়ংপ্রকাশ দেবশিশু মুক্তাঙ্গনে ভূমিশয্যায় শুয়ে অঙ্গ সঞ্চালন করছিলেন, বুঝে-ভরা দৃষ্টিতে পরিবেশ লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর জ্যোতির্ময় দেহে কোন ক্লেদ পঙ্কিলতার চিহ্ন ছিল না। যেন সেই মুহূর্তে কেউ তাঁকে স্নান করিয়ে শুইয়ে দিয়ে গেছে। সেই অস্বাভাবিক জন্ম লক্ষ্য করেই পরে তাঁর জ্যেঠিমা মনোরমা দেবী এই দেবশিশুকে কেঁদে দেখিয়ে দিতে বললেন যে তিনি বোবা ন'ন। জ্যেঠামশায় বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ সুন্দর ঠাকুরও সংস্কার বিসর্জন দিয়ে তখনই জন্ম পত্রিকা গণনা করতে বসে গেলেন। জন্মের পূর্বে যে পাগল সাধক এই মহান আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি আবার এসে

বললেন, 'ওরে এসেছে রে, এসেছে! পরে বুঝবি।' এই বিরাট পুরুষের শুভ আবির্ভাবের সেই পুণ্য দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে (২৩শে কার্ত্তিক, ১৩২৭; ৯ই নভেম্বর, ১৯২০ – ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মেদিনীমণ্ডল গ্রাম)।

শিশুবয়স থেকেই অত্যাশ্চর্য বিভূতি এবং ক্রমে তত্ত্বের স্ফুরণ দেখে সবাই তাঁকে 'বাচ্চা ঠাকুর, বাচ্চা গোঁসাই, বালক ঠাকুর, বালক গোঁসাই' – যে যে-নামে খুশী ডাকতো। ছোটবেলার সেই 'বালক' নামই মানুষের মুখে মুখে 'বালক ব্রহ্মচারী' হয়ে গেছে।

স্বচ্ছ, সরল এই বিরাট পুরুষকে সম্যক জানা কারো পক্ষেই হয়তো সম্ভব নয়। যার যার উপলব্ধির স্তর থেকেই যে যতটুকু সম্ভব তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারবে, তার জন্যই তাঁর জীবনের ঘটনা-পরম্পরার কিছু কিছু দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সমর্পণ করে প্রার্থনা করি, যেন তিনি তাঁকে সম্যক উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টি দেন।

।। রাম নারায়ণ রাম ।।

বংশ পরিচয়

শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতৃকুলপঞ্জী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতামহ (শচীদেবীর পিতা)
নীলাম্বর চক্রবর্তী

নীলাম্বর চক্রবর্তীর পুত্র
(১) বিষ্ণুদাস চক্রবর্তী
(মহাপ্রভুর মাতুল)
↓
(২) গোপালদাস
↓
(৩) রাজীবলোচন
↓
(৪) রামকৃষ্ণ
↓
(৫) রামচন্দ্র
↓
(৬) রামদেব
↓
(৭) বলরাম
↓
(৮) রামশঙ্কর
↓
(৯) রামকিংকর সিদ্ধান্ত
↓

নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা
শচীদেবী (মহাপ্রভুর মা)
↓
শচীদেবীর পুত্র
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

(১০) হরনাথ শিরোমণি

↓

(১১) অম্বিকানাথ বিদ্যাভূষণ

↓

কন্যা

(১২) চারুশীলা দেবী

↓

(১৩) ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী

(চারুশীলা দেবীর পুত্র)

পুত্র

(১২) হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ

শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃকুলপঞ্জী

(১) হরিদেব

↓

(২) সদানন্দ

↓

(৩) রামরতন

↓

(৪) রামলোচন

↓

(৫) দীনবন্ধু

↓

(৬) সুরেন্দ্রচন্দ্র

↓

(৭) বীরেন্দ্র চন্দ্র (শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী)

লেখক পরিচিতি

রায়দা (প্রফেসর পি.কে. রায়) ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইনস -এ শিক্ষালাভ করে ফার্স্টক্লাস কলিয়ারী ম্যানেজার হয়ে কিছুদিন কাজ করেন। অতঃপর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ নিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ লীডস, ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করে রিজিওনাল ইনস্পেক্টর অফ মাইনস- এর পদে কাজ করেন। পরে ১৯৫৭ সাল থেকে দীর্ঘকাল শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, মাইনিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর এবং হেড হয়ে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে অবসর গ্রহণ করার পূর্বে তিনি শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে কাজ করেন। বহু বছর ধরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে আছেন।

*

তাঁর রচিত অন্যান্য পুস্তক —

গতিসত্তম * পরিচিতি * গতিস্তম * New Messiah * Just A Few Words (Translated) * Three Decades with The Divinity * পরিচিতি – চিত্রকথা *

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁরা যাঁরা এই গ্রন্থটি রচনার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা নিয়ে তথ্য ও তত্ত্ব সংকলনে ও প্রকাশনে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি - বিশেষ করে –

তথ্য সংকলন –

স্বর্গত কৃষ্ণধন সাহা	
স্বর্গত প্রকাশ চন্দ্র বল	শ্রীশ্রীঠাকুরের মাস্টারমশায়
স্বর্গত সনাতন হাজরা	
স্বর্গত শ্যামাচরণ সমাজদার	শ্রীশ্রীঠাকুরের মামাতো ভগ্নীপতি
স্বর্গত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী	শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতা
শ্রীমতী গীতা ভট্টাচার্য	শ্রীশ্রীঠাকুরের ভগ্নী
শ্রী অসিত ভট্টাচার্য	শ্রীশ্রীঠাকুরের মাসতুত ভাই
স্বর্গত ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ	স্বর্গত রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
স্বর্গত আশু মজুমদার	স্বর্গত শচীন দাস
স্বর্গত বিনয় সোম	শ্রী ভূপেন্দ্র রায়চৌধুরী
স্বর্গত বিজয় সোম	শ্রী হরিবন্ধু রায়
স্বর্গত ভূপেন্দ্র নাথ রায়	শ্রী দ্বিজেন চক্রবর্তী
স্বর্গত ইন্দ্রনাথ সেন	শ্রী শান্তিদাস মজুমদার
স্বর্গত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ	শ্রী হরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী
স্বর্গত বিশ্বপদ দাসগুপ্ত	শ্রীমতী নিভারাণী মজুমদার
স্বর্গত বি. এল. রায়	শ্রীমতী আশালতা বিশ্বাস(আশু সেনের কন্যা)
স্বর্গত অনিল কুমার সেনগুপ্ত	শ্রীমতী অঞ্জলি রায় চৌধুরী
স্বর্গত নির্মাল্য সেনশর্মা	শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত
স্বর্গত খগেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী	

এবং আরও অনেকে।

পুস্তক প্রকাশনে -
পরম ভক্ত বলরাম ব্যানার্জী, গোবিন্দ সাঁতরা দম্পতি, বলাই চন্দ্র সাহা, ডাক্তার বিনয় পাল রায় ও শ্রীমতী রমা চৌধুরী।

* এই গ্রন্থের কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে শ্রীবীরেন্দ্রবাণী, শৈশব কাহিনী, স্বয়ংপ্রকাশ দেবশিশু, জীবন দর্শন, গতিসত্তম, বিশ্ব কল্যাণ প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রথম পর্ব

[উজানচর-কৃষ্ণনগর]

পৃথিবীর মানুষ অবাক বিস্ময়ে শুনেছে শক্তিশালী জারসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের রক্তক্ষয়ী বিপ্লব - জারের শক্তি পদদলিত করে রাশিয়ার জনসাধারণ আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে গেছে। দীর্ঘ চার বছর রণদামামা বাজবার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান দেখে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভারতের উপর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আঁচ না লাগলেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসে। কারণ, তখনও ব্রিটিশ ভারতের বুকে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশরাজ বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলেও অর্থনৈতিক মানে অনেকাংশে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববাংলার উপর দিয়ে ভয়াবহ এক ঘূর্ণিঝড় বহুলোককে গৃহহীন করে গেল। খুব কম লোকই ছিলেন যাঁরা এই বিধ্বংসী ঝড়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হ'ননি। এত বড় ঝড় নাকি ইতিপূর্বে হয় নি, তাই পূর্ববাংলার মানুষ ছাব্বিশ সনের [১৩২৬ সনের আশ্বিন মাসের (১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে) এই বিধ্বংসী ঝড় বয়ে যায় পূর্ববঙ্গের উপর দিয়ে] এই ঝড়কে সময় নির্ণয়ের একটা নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করে।

কে তখন জানতো যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবে, অন্তত: এক জায়গায় জনসাধারণের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, পূর্ববঙ্গের উপর দিয়ে এক বিরাট ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাবে, তারপর এক বিরাট মহানের আবির্ভাব হবে এই বাংলারই বুকে এবং তিনি ইতিহাস মুছে ফেলে এক নতুন ইতিহাসের রচনা করে যাবেন?

জানতেন অনেকেই। মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁর মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি আবার তাঁর

মাতুল বংশের ত্রয়োদশ উত্তর পুরুষে ভাগিনেয়রূপে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করে যাবেন। বিষ্ণুদাস ঠাকুরের কড়চায় এবং তাঁর জামাতা কবি গোপীনাথ কণ্ঠাভরণের রচনায় সে কথা তো পাওয়া যায়ই, তাছাড়া বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বংশে মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বংশপরম্পরায় চলে আসছে। তাই বিষ্ণুদাসের দশম উত্তরপুরুষ হরনাথ শিরোমণি তাঁর পুত্রের বিবাহবাসরে ঘোষণা করেছিলেন যে, সেই বিবাহজাত এক কন্যার গর্ভেই মহাপ্রভু আবার আসবেন। হরনাথ শিরোমণির পুত্র অম্বিকানাথ বিদ্যাভূষণ তাই তাঁর কন্যাদের নবজাত সন্তানদের মধ্যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন জন্ম নিলেন, তখন আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হ'ল না। তাঁর জন্মের মধ্য দিয়েই অলৌকিকতা প্রকাশ পেল আর সেই বার্তা বৃদ্ধ অম্বিকানাথের কাছে গিয়ে ঠিকই পৌঁছল।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের কথা। কাশীতে তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে সবাই জীবন্ত শিব জ্ঞানে ভক্তি করে - কিন্তু সহজে কেউ তাঁর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত লোকনাথ ব্রহ্মচারী তখন ঢাকা জেলার বারদী গ্রামে। অশ্বিনী চ্যাটার্জী তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর - রান্না ক'রে লোকনাথ বাবাকে খাওয়ান, অসুখে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন। লোকনাথ বাবাও অশ্বিনীকে খুব স্নেহ করেন। অশ্বিনী চ্যাটার্জী কিন্তু বেশী দিন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে থাকতে পারলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল ওঁর সেবা করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। লোকনাথ বাবা একদিন অশ্বিনীকে ডেকে অর্ধমন্ত্র দিয়ে বললেন যে, অর্ধশতাব্দী পরে এক পূর্ণব্রহ্ম অবতার তাঁর অর্ধমন্ত্র পূর্ণ করে দেবেন। তিনি অশ্বিনী চ্যাটার্জীকে ঘরে ফিরে গিয়ে সংসারধর্ম পালন করতে বললেন। গুরুর নির্দেশ শুনে অশ্বিনী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। লোকনাথ

ব্রহ্মচারী তাঁকে কাশীতে গিয়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে বলে বললেন, "তুই তো ভাল রান্না করিস্ - বাবাকে বাংলাদেশের পরমান্ন রেঁধে খাওয়াস। তিনি খুব খুশী হবেন।" সেদিনই তিনি কাশী অভিমুখে রওনা হলেন। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁর জন্য প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছেন। অশ্বিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দাদু, তুমি কি করে জানলে আমি আসব?" ত্রৈলঙ্গ স্বামী উত্তর দিলেন, "লোকনাথ আমাকে জানিয়েছে।" কী পদ্ধতিতে লোকনাথ বাবা খবর পাঠিয়েছেন বুঝতে না পেরে অশ্বিনী বিস্মিত হলেন। পরে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর অনুমতি নিয়ে অশ্বিনী দুইমণ দুধের পরমান্ন রাঁধলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী পরম তৃপ্তি সহকারে সেবা করতে শুরু করলেন। সব শেষ করে ফেলছেন দেখে অশ্বিনী শেষে বলে উঠলেন, 'দাদু, আমাদের জন্য কিছু প্রসাদ রাখবে না?' একগাল হেসে স্বামীজী অল্প কিছু রেখে দিলেন। অশ্বিনী চ্যাটার্জীর সঙ্গে এইরকম অন্তরঙ্গতা দেখে স্থানীয় ভক্তেরা বিস্মিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলো। অশ্বিনী জবাব দিলেন, 'এ কি আর আমার জন্য? লোকনাথ বাবা পাঠিয়েছেন তাই।' সে রাত্রি তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে গাছতলাতেই কাটালেন। পরদিন বিদায় নিয়ে অশ্বিনী দেশে ফিরে গেলেন। বিদায়ের পূর্বে ত্রৈলঙ্গ স্বামী অশ্বিনীর সেবাযত্নে তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, - "ঘাবড়াস না। এক পূর্ণব্রহ্ম অবতার আসবেন প্রায় অর্ধশত বছর পরে এবং তিনিই তোর গুরু হবেন।" ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মুখে একই আশ্বাসবাণী শুনে অশ্বিনী চ্যাটার্জী নিশ্চিন্ত হলেন, তাঁর মনের ভার কমে গেল। ফিরে গিয়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে সবকথা জানালেন এবং তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। ঐ সময় যাঁরা যাঁরা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে যেতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আড়াইহাজারের যোগেশ চৌধুরী, ঢাকার ললিত সাধু এবং আরও

অনেকে। যোগেশ চৌধুরীকে লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্ত্রদীক্ষা দিলেন না, পরিবর্তে দিলেন একখানি গেরুয়া কাপড়, আর বললেন, "এবার আসছেন এক পূর্ণব্রহ্ম অবতার। তাঁর সঙ্গে তোর দেখা হবে প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে। তিনি তোকে এই গেরুয়া কাপড়টির কথা জিজ্ঞাসা করবেন এবং কাপড়টি পড়ে যেতে বলবেন। তিনিই তোর গুরু হবেন।" যোগেশ চৌধুরী ক্রমে বি.এ. পাশ করলেন। তখনকার দিনে বিশ-পঁচিশ গ্রামের মধ্যে তিনিই প্রথম গ্র্যাজুয়েট। শিক্ষা জগতে প্রবেশ করে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেন এবং বহুদিন হেডমাষ্টার হয়ে অধ্যাপনা করলেন। লোকনাথবাবা ললিত সাধুকে শুধু বললেন, "চিন্তা করিস না। তুই-ও কৃপা পাবি।"

ভারতের ও বাংলার বহু সাধু-সন্ত-মহান পূর্ণব্রহ্ম অবতারের যে আবির্ভাব হবে তার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। প্রভু জগবন্ধু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বামাক্ষেপা প্রমুখ বহু সাধু-সন্ত পূর্ণ-ব্রহ্ম অবতারের আবির্ভাবের কথা বলে গেছেন।

হিমালয়বাসী বিরাট যোগী আদিত্যনাথ বাবার [সাধু-সন্তের-মহাসংগমে - শঙ্করনাথ রায়] কথা সত্যি বিস্ময়কর! আদিত্যনাথ বাবার দর্শন নাকি সবার মেলে না, অনেকের কাছেই তিনি অদৃশ্য হয়ে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মের কয়েক বছর আগে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "এবার একজন পূর্ণব্রহ্ম অবতার এই ধরায় অবতীর্ণ হবেন এবং এই বাংলারই বুকে। প্রচ্ছন্ন থেকে তিনি তাঁর কার্যকলাপ চালিয়ে যাবেন, লোকে তাঁকে চিনতে পারবে না। পৃথিবীর বুকে এক বিরাট ধ্বংসের লীলা বইয়ে দিয়ে তিনি শান্তিস্থাপন করবেন। পরিশেষে তিনি সচ্চিদানন্দঘন ভগবান রূপে প্রকট হবেন। তাঁকে চিনতে পারবে কয়েকজন ঋষি, ঋষিকল্প পুরুষ এবং কয়েকজন পার্শ্বচর"।

আদিত্যনাথ বাবার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-লীলার আশ্চর্য মিল দেখা যায়। অষ্টসিদ্ধি নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শিশুবয়স থেকেই তাঁর অষ্টসিদ্ধির প্রকাশ মানুষকে অভিভূত করেছে। অণিমাসিদ্ধ মহাপুরুষ খুবই বিরল। যোগীবর ত্রৈলঙ্গ স্বামী অণিমাশক্তির ব্যবহার পাঁচ-ছয়বার করেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের শৈশবেই এক এক রাত্রিতে পাঁচ-ছয়বার অণিমা-শক্তির বিকাশ দেখা গেছে। অণিমা তাঁর কাছে সহজসাধ্য – শুধু নিজে একা ন'ন, পার্শ্বচরদের নিয়ে তিনি অণিমা ও ব্যাপ্তি ব্যবহার করে দূর দেশে কিছুদিন থেকে এসেছেন,- একই সময়ে স্থুল দেহে এক স্থানে, চিন্ময় দেহে আর এক স্থানে বিরাজ করে ভিন্ন ভিন্ন কার্য-কলাপ চালিয়ে যেতে তাঁর কোনই পরিশ্রম হয় না। দুই স্থানেই তাঁর ফটো নেওয়াও সম্ভব হয়েছে। তবে বিভূতি সম্বন্ধে বেশী বলা উচিত নয়, কারণ বাংলা দেশের কিছু লোক দেখলে, বাকি মানুষ স্বীকার নাও করতে পারে। ভারতের সব মানুষ দেখলেও চীনের মানুষ স্বীকার নাও করতে পারে। সুতরাং তত্ত্ব নিয়েই মহানের পরিচয় পাওয়া শ্রেয়: আর সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, শ্রীশ্রীঠাকুরের সীমাহীন শক্তির স্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ কোন পাঁচ-ছয় বছরের শিশু সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব পরিবেশন করতে পারে সহজ সরল ভাষায়? সাধারণ পাঁচ-ছয় বছরের শিশুর অনুভব শক্তিই ভাল করে বিকশিত হয় না - সেই বয়স থেকেই শিশু-ঠাকুর কী করে কোথা থেকে সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব সাবলীলভাবে দিয়ে চলেছেন - ভাবতে আশ্চর্য লাগে! তাতেই তাঁর অপরিমেয় শক্তির আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের কিছুদিন পূর্বেই মাতা চারুশীলা স্বপ্নে দেখেছেন যে, এক বিরাট দেবজ্যোতি আসছেন। সরস্বতী-পূজার দিন দিবানিদ্রার মাঝে দেখলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম

হাতে বিষ্ণুকে, - তিনি বলছেন - ‘আসছে রে, আসছে’। শিবরাত্রির দিন তন্দ্রার ঘোরে দেখলেন জটাজুটধারী শিবকে - তিনি বলে গেলেন বিরাট দেব-প্রতিভার আগমনের সংবাদ। দোল পূর্ণিমার দিন শুনলেন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী - তিনিও দিয়ে গেলেন সেই নিত্য পরম দেবতার আগমনের শুভ সংবাদ। বংশ - পরম্পরায় চলে আসা মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী মাতা চারুশীলা শুনেছেন বহুবার, তার উপর এই তিনটি স্বপ্ন। এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁর মন ভরে ওঠে।

আবার মনসা পূজার দিন আর একটা ঘটনা। কোথা থেকে এক পাগল সাধক এসে হাজির। মাতা চারুশীলাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলে উঠলেন, “ওরে আসছে রে, সে আসছে। এলে আবার আমি আসবো।” পাগল সাধক হঠাৎ যেমন এসেছিলেন, হঠাৎ-ই চলে গেলেন কাউকে প্রশ্নোত্তরের সুযোগ না দিয়ে।

মহাপ্রভুর মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বাসস্থান ছিল ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাউলীপাড়া গ্রামে। বিষ্ণুদাস ঠাকুরের দশম উত্তরপুরুষ হরনাথ শিরোমণি প্রথমে কাউলীপাড়া ছেড়ে আসেন। সে এক বিচিত্র ঘটনা। হরনাথ শিরোমণির স্ত্রী প্রাতঃস্নান সমাপ্ত করে তুলসী তলায় প্রণাম করতে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ মাটির ফাটল দিয়ে এক ঝলক জল এসে তাঁর মুখে লাগল। অতীব বুদ্ধিমতী হরনাথ-গৃহিনী তখনই আশু-বিপদের সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করলেন; বুঝতে পারলেন কীর্তিনাশা পদ্মা তল দিয়ে খেয়ে গেছে এবং কাউলীপাড়া গ্রাম শীঘ্রই পদ্মার গ্রাসে পড়বে। বিরাট গ্রাম-সেখানে পোস্টাফিসই আটটি, হাইস্কুল ২৪টি, টোল, থানা তো আছেই - এই বর্ধিষ্ণু গ্রাম পদ্মার গ্রাসে বিলীন হয়ে যাবে। হরনাথ-গৃহিনী এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সবাইকে এই বিপদের কথা জানিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে গ্রাম খালি হয়ে গেল - যে যতটুকু

উদ্ধার করতে পারে তাই নিয়ে বিপদ সীমা পেরিয়ে চলে গেল। বিরাট গ্রাম কয়েকদিনের মধ্যেই পদ্মার বুকে বিলীন হয়ে গেল। হরনাথ শিরোমণি পরিবারবর্গ নিয়ে একের পর এক কয়েক জায়গায় আশ্রয় হারিয়ে শেষ পর্যন্ত দোগাছি গ্রামে এসে বসবাস করতে লাগলেন। ছোট্ট গ্রাম, একটি ছোট পোস্টাফিস আছে। সেখানে সবকিছু করা যায় না। স্কুল, থানা বা হাট নেই, আছে শুধু ছোট একটি বাজার। গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট কাটা খাল - নাম তার 'আঠারো-বেঁকী', পদ্মায় গিয়ে মিশেছে। মাতা চারুশীলার জন্ম এই দোগাছিতেই।

প্রায় এক-দেড় মাইল দূরে মেদিনীমণ্ডল গ্রাম। দোগাছির থেকে বড়। ষ্টীমার ষ্টেশন, পোস্টাফিস, বাজার সবই আছে যদিও হাই স্কুল বা থানা নেই। গ্রামের দক্ষিণে কীর্তিনাশা পদ্মা। পদ্মার পাড়ে একটি ছোট ষ্টেশন - মেল ষ্টীমার থামে না, থামে শুধু মিক্সড ও মালবাহী জাহাজ। ষ্টীমার ষ্টেশন থেকে কালিরখিল খালপাড়ের রাস্তাটি ধরে উত্তর দিকে গেলে বাজার ছাড়িয়ে যে বাড়ীটি চোখে পড়ে, সেইটিই বৈদিক বাড়ী বা বারো ভাইয়ের বাড়ী বলে পরিচিত। বৈদিক বাড়ী নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে বিশারদ পণ্ডিতেরা সেখানে বসবাস করেন।

বৈদিক বাড়ীর ইতিহাস তখনকার বঙ্গদেশের অধিপতি বল্লাল সেনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বল্লাল সেন বৈদিক ক্রিয়াকর্মের জন্য কান্যকুব্জ থেকে সদ্ব্রাহ্মণ নিয়ে এলেন। কথিত আছে প্রথম যাঁদের এনেছিলেন তাঁদের কাজের মধ্যে কিছু ত্রুটি ছিল। তাই যাজনিক ক্রিয়ার জন্য তিনি দ্বিতীয় এক পরিবার নিয়ে এলেন। তাঁরাই যাজনিক ক্রিয়াবিদ্ হিসাবে ঢাকা বিক্রমপুরে প্রসিদ্ধ এবং তাঁদের বাসস্থান ঢাকা বিক্রমপুরে 'বৈদিক বাড়ী' বলে খ্যাত। তখনও পূর্ববঙ্গে অনেক বৈদিক-ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবু বল্লাল সেন

'বৈদিক বাড়ী'র ব্রাহ্মণদেরই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন। কথিত আছে যে বল্লাল সেন এঁদের একটা মাসোহারা করে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এঁরা দান গ্রহণ করাতে অস্বীকৃত হওয়ায় জমি, গাভী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বৈদিক বাড়ীর পূর্বপুরুষেরা সেই ঋণ নিজেরা পরিশ্রম করে কড়াক্রান্তি পর্যন্ত শোধ করে দেন। একবার পরীক্ষা করার জন্য বল্লাল সেন লোক মারফৎ পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বৈদিক বাড়ীর সেই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ সেই টাকা গ্রহণ করলেন না, বললেন, 'চাষবাস, গো-সেবা, যজন-যাজন, বেদ-অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা আমাদের বৃত্তি। আমরা দান গ্রহণ করে আদর্শচ্যুত হতে পারি না।'

বালক ঠাকুরের পিতামহ দীনবন্ধু চক্রবর্তী ছিলেন অমায়িক, সরল, পরদুঃখে কাতর। সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপন করে তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী ছিল গ্রামের দীনদুঃখী অভাবী মানুষদের বাড়ী বাড়ী ঘোরা এবং যার যা প্রয়োজন সেই অনুসারে প্রত্যেককে যথাসাধ্য সাহায্য করা। লোকে তাই বলতো, 'সত্যিই তিনি দীনবন্ধু'। পুরুষানুক্রমে নিজেদের অধ্যবসায়ে এঁরা কিছু সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সম্পদ তাঁরা নিজেদের জন্য ব্যয় করে শেষ করতেন না, দীন-দরিদ্র সবাইকে ভরণ-পোষণ করতেন। দীনবন্ধু এবং পরবর্তী উত্তরপুরুষ ভগবতী ঠাকুর বাস্তব সম্পর্কে এত উদাসীন ছিলেন যে ক্রমে তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করলো। ভগবতী ঠাকুর তো একেবারেই উদাসীন ছিলেন - যজমান বাড়ী পূজা করে তিনি চলে আসতেন, কোন দান-সামগ্রী আনতেন না। পরে যজমানরা কিছু কিছু জিনিস পাঠিয়ে দিতেন। অথচ ক্রিয়াবিদ্ হিসাবে তাঁর এত সুখ্যাতি ছিল যে, তিনি উপস্থিত থাকলে আর কেউ যাজনিক ক্রিয়া করতে সাহস পে'ত না। একবার বালক ঠাকুরের মাতামহ অম্বিকানাথ বিদ্যাভূষণ

পুরোহিত দিয়ে কি এক যাজনিক অনুষ্ঠান করছেন। ভগবতী ঠাকুর পাশের গ্রাম থেকে যাজনিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে ফিরছেন। যাবার পথে আত্মীয় বাড়ীতে দেখা করে যাবেন বলে ঠিক করলেন। ভগবতী ঠাকুর উপস্থিত হয়েছেন দেখে অম্বিকানাথ, পুরোহিত সবাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ভগবতী ঠাকুর বিব্রত হয়ে বললেন, 'আপনারা উঠলেন কেন? আপনারা কাজ করে যান। আমি বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছি তাই দেখা করতে এলাম।' অম্বিকানাথ উত্তর দিলেন, "আত্মীয়তা সম্পর্কে তুমি ছোট হলেও, তোমার গুণের সম্মান তো আমাদের দিতেই হবে। তুমি 'ক্রিয়া সাগর' – যাজনিক ক্রিয়ায় তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। সুতরাং সেই সম্মান তোমায় নিতে হবে।" মানুষের কাছ থেকে এত সম্মান পেয়েও ভগবতী ঠাকুর ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষদের মতই সহজ, সরল, স্বচ্ছ। সব সময়ে বেদের চর্চাতেই মগ্ন থাকতেন। মাঝে মাঝে ভাইয়েরা সবাই নিজেদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় বসতেন। যাজনিক ক্রিয়া করতে গিয়ে সূক্ষ্মেও যদি তাঁদের মনে কোন জিনিসের জন্য বা দানের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগতো তো তাঁরা অকপটে স্বীকার করে ভবিষ্যতে যাতে সেই আকাঙ্ক্ষা না জাগে তার জন্য প্রার্থনা করতেন। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা – এই তাঁদের কর্তব্য। তার মধ্যে কোন লোভ বা মোহের স্থান থাকবে না। জীবিকা নির্বাহের জন্য চাষবাস এবং যাজনিক ক্রিয়ায় অযাচিত ভাবে যতটুকু প্রাপ্য, সেটুকুই তাঁরা যথেষ্ট মনে করতেন। ভগবতী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করতেন খোলাখুলিভাবে, 'পূজা করতে গিয়ে কারও কোন দ্রব্যের প্রতি কি আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল?' কারোর যদি সে ভাব এসে থাকে তিনি অকপটে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

বারো ভাইয়ের মধ্যে এত সদ্ভাব ছিল যে, তাঁরা কখনও কারো প্ররোচনায় ভুলতেন না। একবার এক ভাইয়ের স্ত্রী, তখনও

তিনি বৈদিক বাড়ীতে নতুন, একদিন স্বামীকে তাঁর খাবার জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। তিনি সব চুপ করে শুনলেন। তার পরদিন ভাইদের আসরে, তাঁর স্ত্রী কি বলেছিলেন সব কথা অকপটে ফাঁস করে দিলেন। সেদিন থেকে মহিলারা বুঝলেন যে, তাঁদের স্বামীরা এত সহজ সরল যে তাঁদের কাছে সহজভাবে থাকাই শ্রেয়:।

ভাইদের শিশুসুলভ মনোভাব দেখে সবাই বিস্মিত। সেদিনকার ঘটনা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই আশ্চর্য হয়ে গেছেন। চার ভাই মিলে পাশা খেলতে বসেছেন, আরও দুই ভাই খেলা দেখছেন। চালে একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে দেখে এক ভাই আর এক ভাইকে একটা কিল বসিয়ে দিলেন। বয়স তাঁদের তখন সবারই ষাটের উপরে। কিল খেয়ে ভাইটি ‘উঃ’ করে উঠলেন। ইতিমধ্যে নাতিদের মধ্যে দু’চারজন গিয়ে ঠাকুমার কাছে নালিশ করলেন। ঠাকুমা একটা বাঁশের কঞ্চি নিয়ে এসে যে ভাই মেরেছিল তাঁর পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন। মার খেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, ‘মা, আর ক’রব না’। এই শিশুসুলভ চরিত্রই তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

সবুর সারেঙ্গের মাকে বিজয়ার পর প্রণাম করলেন ভগবতী ঠাকুর। তাই নিয়ে ব্রাহ্মণ সমাজে শোরগোল পড়ে গেল। ব্রাহ্মণেরা একত্র হয়ে আলোচনা সভায় বসলেন। সবারই একমত - এত বড় একজন ক্রিয়াবিদ্ হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি মুসলমানকে ছুঁয়ে প্রণাম করলেন, এর থেকে বড় অনাচার আর কি হতে পারে? ভগবতী ঠাকুরকে আলোচনা সভায় ডাকা হ’ল। ব্রাহ্মণেরা অনুযোগ দিলেন, ‘এত বড় মানী লোক হয়ে একি করলেন আপনি? আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেল।’ ভগবতী ঠাকুর সবুর সারেঙ্গের মাকে মা ডেকেছেন। অভিযোগের বিরুদ্ধে তিনি বললেন ‘মাকে প্রণাম করেছি, এ তো কখনও নীতি-বিরুদ্ধ হতে পারে না। মাকে

প্রণাম করা কোন নীতিতে বাধে? সে নীতি কখনই আমি সমর্থন করতে পারি না। মায়ের কাছে মাথা হেঁট করায় মান-অপমানের প্রশ্ন কি করে আসে?' ব্রাহ্মণেরা বুঝলেন যে, এই যুক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন তুলে কোন লাভ নেই। সুতরাং তাঁরা ভগবতী ঠাকুরের কথা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

কয়েক বছর পরের কথা। সবুর সারেঙ্গের মা মারা গেছেন। ভগবতী ঠাকুর সবুর সারেঙ্গকে বললেন, "তোমরা মুসলমানের কাজ কর, আমি আমার কাজ করবো।" এই সরল অমায়িক মানুষটি তাঁর সংকল্পে অটল। এগারো দিন অশৌচ পালন করে তিনি মস্তক মুণ্ডন করে যথারীতি শ্রাদ্ধ করলেন। সবুর সারেঙ্গ এবং তার পরিবারের লোকেরা সেখানে উপস্থিত। হিন্দু সম্প্রদায় নীরবে সব দেখলো, কিন্তু কেউ কোন উচ্চবাচ্য করলো না। মুসলমান সম্প্রদায় থেকে আপত্তি এল সবুর সারেঙ্গের কাছে। সবুর সারেঙ্গ উত্তর দিলেন, 'ভগবতী ঠাকুর তাঁর মায়ের সদগতির জন্য যা করার করবেন। এতে কার কি বলার থাকতে পারে?' মুসলমান সম্প্রদায় চুপ করে গেল।

বৈদিক বাড়ীর পরিচারক দুর্গামোহন কোনদিন সূক্ষ্মেও ভাবতে পারতো না যে সে বৈদিক বাড়ীর চাকর। সে ভাবতো যে সেও পরিবারের একজন। কিন্তু তাকেও একদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হ'ল। যাজনিক এক কাজে ভগবতী ঠাকুর তাকে এক জায়গায় পাঠিয়েছেন, ফিরে এসে তাকে ভগবতী ঠাকুরের সঙ্গে যেতে হবে। ভগবতী ঠাকুর ইতিমধ্যে দুর্গার ময়লা কাপড়-চোপড় নিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে ইস্ত্রি করে ফেলেছেন। টোলের ছাত্রেরা তো দেখে অবাক! বলে, 'পণ্ডিতমশাই, একি করছেন?' ভগবতী ঠাকুর বলেন, 'আমার সঙ্গে বে'র হবে তো। ওর জামাকাপড়গুলো ময়লা হয়ে রয়েছে, তাই পরিষ্কার করে ফেললাম'। এই সহজ সরল

উক্তি শুনে ছাত্রেরা আর কথা বলতে পারে না। দুর্গামোহন ফিরে এসে লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়লো – তার ময়লা কাপড় জামা ভগবতী ঠাকুর নিজেই কেচে পরিষ্কার করে ইস্ত্রি করে রেখেছেন। দুর্গামোহন বুঝলো যে ভগবতী ঠাকুরের মহত্ত্ব ও সমদৃষ্টি অতুলনীয়।

একদিন ভগবতী ঠাকুর হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে একটা কুড়াল নিয়ে কাঠ ফাড়ছেন, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক ভগবতী ঠাকুরকে বাড়ীর চাকর মনে করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই, বলতে পার ভগবতী ঠাকুর কোথায়?' ভগবতী ঠাকুর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার নামই ভগবতী।' ভদ্রলোক তো অপ্রস্তুত – সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, 'এর জন্যই আপনাকে সবাই এত মহৎ বলে।'

বারো ভাইয়ের প্রত্যেকের মধ্যেই সহজ স্বচ্ছ সরলতা ছিল বলেই তাঁরা কখনও তাঁদের পাণ্ডিত্যের অভিমান করতেন না, নিজেদের আর সবার চেয়ে পৃথক বলে মনে করতেন না। এইজন্য লোক তাঁদের যেমন শ্রদ্ধাভক্তি করতো, তেমনি ভালবাসতো। বাস্তববুদ্ধি তাঁদের অবশ্য কম ছিল এবং সেইজন্য পিতৃপুরুষের সম্পত্তি তাঁরা রক্ষা করতে পারলেন না। ধীরে ধীরে তাঁদের সাংসারিক অবস্থার অবনতি হতে লাগল। ম্লেচ্ছ ভাষার উপর তাঁদের তখনকার প্রথা অনুযায়ী অদ্ভুত বিরাগ, তাই ইংরাজী লেখাপড়া শিখলেন না। বাড়ীর অবস্থাও বিশেষ ভাল না। তাই শেষ পর্যন্ত বালক ঠাকুরের পিতা সুরেন্দ্রচন্দ্রকে তাঁর মায়ের নির্দেশে জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী গ্রহণ করে দূরে যেতে হ'ল।

যাজনিক ক্রিয়ায় প্রাপ্ত শাড়ী-গামছা কাঁধে নিয়ে ভগবতী ঠাকুর নিজেই হাটে যেতেন বিক্রী করতে। হাটে বহুলোক তাঁকে প্রণাম করতো, কিন্তু তিনি নির্বিকার। শাড়ী গামছা নিয়ে যে যা দাম

দিত তাই সাদরে গ্রহণ করতেন – দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতেন না। কাপড় বিক্রীর পয়সা দিয়ে হাটবাজার করে বাড়ী ফিরতেন। শিশুবয়সে বালক ঠাকুরও অনেক সময়ে জ্যেঠামশায় ভগবতী ঠাকুরের সঙ্গে হাটে যেতেন।

।। এক ।।

এই বারো ভাইয়ের বাড়ীতে দীপান্বিতার দিন কালীপূজা হয়ে আসছে বংশপরম্পরায়। অন্যান্য বছরের মত সেবারও পূজায় আড়ম্বরের কোন ত্রুটি নেই – আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীতে বাড়ী জমজমাট। ঢাক, ঢোল, সানাই সবই আছে। যূপকাষ্ঠ তৈরী - মায়ের কাছে বলি দেবার জন্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আতসবাজি জ্বালিয়ে আনন্দ করছে। সর্বত্র আনন্দের কোলাহলে মুখর আজ বৈদিক বাড়ী। পূজারম্ভের লগ্ন উপস্থিত, অথচ মিষ্টির থালা দেওয়া হয়নি। তন্ত্রধার ভগবতী ঠাকুর চিৎকার করছেন। সামনে কাউকে না দেখে আসন্ন প্রসবা মাতা চারুশীলা চিনির থালা হাতে করে ত্রস্তপদে উঠানে নামলেন। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে মাতা চারুশীলা অপ্রস্তুত - চিনির থালা হাত থেকে পড়ে গেছে। কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারলেন না। বড় জা মনোরমা দেবী মাতা চারুশীলার অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন। তিনি তো অবাক - বললেন, 'তোর তো সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে রে!' মাতা চারুশীলা হতবাক – পূজার নৈবেদ্য পড়ে গেছে। কোন প্রসব বেদনা নেই, কোন ইঙ্গিত নেই। সারাদিন রান্নাঘরে কাটিয়েছেন কিছুই তো বুঝতে পারেন নি!

কি অনিন্দ্যকান্তি দেবশিশু - প্রাঙ্গণের আলো-আধাঁরি পরিবেশেই শিশুর রং ফুটে বে'র হচ্ছে, দেহের কোথাও কোন ক্লেদ-পঙ্কিলতার ছাপ নেই, মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র শিশুটিকে কেউ স্নান করিয়ে শুইয়ে দিয়ে গেছে।

শিশু বুঝে - ভরা দুই চোখ মেলে চারদিকে তাকাচ্ছেন - যেন সবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। এদিকে সাত জোকার শুনে ভগবতী ঠাকুরের হাত থেকে ঘণ্টা পড়ে গেল – "সর্বনাশ!" পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে - অশৌচ, সুতরাং মাতৃপূজা বন্ধ। সকলেরই মন ভারাক্রান্ত – একি অশুভ সূচনা! তার ওপর আবার শিশু নির্বাক, তবে কি এক বোবা শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে মাতৃপূজায় বিঘ্ন ঘটালো? মনোরমা দেবী কিন্তু জন্মের এই অলৌকিকতা লক্ষ্য করছিলেন। তাই যখন সকলে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে দেখলেন, তিনি শিশুর কাছে হেঁট হয়ে বললেন, 'একটু কেঁদে দেখিয়ে দাও যে তুমি বোবা নও।' তিনবার তারস্বরে চিৎকার করে শিশু জানিয়ে দিলেন যে তিনি সুরে ভরপুর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেঠামশায় সুন্দর ঠাকুর জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী। জ্যোতির্বিদ্ হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। প্রচলিত প্রথা অনুসারে ছ'দিন পার না হলে গণনা করা নিষেধ। হঠাৎ সুন্দর ঠাকুরের মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। সমস্ত সংস্কার উপেক্ষা করে তিনি গণনায় বসে গেলেন। বললেন, 'মহাদেবই দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন। আমাদের মাতৃপূজা যিনি বন্ধ করলেন, দেখা যাক ইনি কোন মহাদেব।' কালবিলম্ব না করে তিনি জন্মকুণ্ডলী তৈরী করতে বসে গেলেন। শিশুর ঠাকুমা অর্থাৎ সুন্দর ঠাকুরের মাও বললেন, 'দেখতো, কে

এসেছে! কালাপাহাড় নাকি?' সবার মনের মধ্যেই ধাক্কা দিল, 'এ কোন পাঠান এলো রে?'

পনের মিনিট কেটে গেল। সুন্দর ঠাকুরের চোখে জল দেখে তাঁর ছাত্রেরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'পণ্ডিত মশাই, কাঁদছেন কেন?' ঠাকুমা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কিরে চন্দ্রকান্ত, কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?' সুন্দর ঠাকুর জবাব দেন, "কাঁদছি কেন? এ কালাপাহাড় নয়, এ যে কালাচাঁদ। বৃহস্পতি তুঙ্গে, সব তুঙ্গে। সন্ন্যাস নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আমরা উদ্ধার হয়ে যাব; শুধু আমরাই নয়, আমাদের সাতপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। শুধু আমাদের কেন, সমস্ত দেশ জুড়ে সবাই উদ্ধার হয়ে যাবে। আনন্দ কর - আমাদের সাতপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে"। ঠিক সেই সময় সেই পাগল সাধক এসে উপস্থিত, পিছন থেকে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এসেছে রে, এসেছে।" সবাই প্রশ্ন করতে লাগলো, 'কে এসেছে?'

- 'পরে বুঝবি, পরে বুঝবি', বলতে বলতে পাগল সাধক শিশুকে দর্শন করে দ্রুতপদে চলে গেলেন।

পরে অনেকেই অবশ্য উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু সেই আবির্ভাব-মুহূর্তেই জ্যেঠিমা মনোরমা দেবী জন্মের অলৌকিকত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। প্রচলিত নিয়মের মাধ্যমে যে এই আবির্ভাব হয় নি, তা তিনি বুঝেছিলেন। আর বুঝেছিলেন সুন্দর ঠাকুর। তাই তিনি সংস্কারের

বাধানিষেধ উপেক্ষা করে জন্মকুণ্ডলী তখনই তৈরী করলেন।

১৩২৭ সালের ২৩শে কার্তিক, মঙ্গলবার ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই শুভদিনের রাত্রি ১০টা ২০ মিনিটে এসেছেন সেই জন্মসিদ্ধ মহান, যার আগমন বার্তা জানিয়ে গেছেন আদিত্যনাথ বাবা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, প্রভু জগবন্ধু প্রমুখ সাধু-সন্ত-মহাপুরুষ।

শিশু ক্রমশ: কলায় কলায় বাড়ছেন বাড়ীর অন্য পাঁচটি শিশুর মত, কিন্তু তারও মধ্যে পার্থক্য আছে। সবারই ধারণা, শিশু বুঝে বুঝে প্রতি পদক্ষেপে চলেন। ছ'দিনের দিন ষষ্ঠী--শিশুর কল্যাণে পূজা। গ্রামের সব ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে - শিশুকে আশীর্বাদ করার জন্য। সকলের পায়ের ধূলা নবজাত শিশুকে গ্রহণ করতে হয়। পূজার সব আয়োজন প্রস্তুত। কিন্তু প্রকৃতির এমনই রহস্য যে সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হ'ল। নিমন্ত্রিতদের কারও আর আসা হ'ল না, কেউ আশীর্বাদ করতে পারল না। ছ'দিনের শিশুর সেদিনকার কার্যকলাপ তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে বিস্ময়াপ্লুত করে তুলেছিল। বৃষ্টি এক এক বার থেমে আসে, আর শিশু জোরে জোরে হাত নাড়তে থাকেন। তাঁর হাত নাড়ার সাথে সাথে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, তাঁর হাত নাড়ার গতি যেমন মন্থর হয়ে আসে, বৃষ্টিও কমে আসে – হাত নাড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বেশীক্ষণ বৃষ্টি বন্ধ থাকতে দেন না, প্রবল উৎসাহে

আবার হাত নাড়া শুরু করেন। বৃষ্টিও মুষলধারে নামতে থাকে। এই খেলা তাঁর সারাদিন চলে – বৃষ্টিও থামবার সুযোগ পায় না। জ্যেঠিমা মনোরমা দেবী বেশ কিছুক্ষণ ধরে শিশুর এই অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে বৃষ্টি ধারার সম্বন্ধ লক্ষ্য করে সবাইকে ডেকে এনে দেখান। ছ'দিন বয়সেই প্রকৃতি যার নিয়ন্ত্রণাধীন – তিনি কে? – এই প্রশ্ন সবার মনে জাগে।

আর পাঁচজনের মতই শিশু বড় হচ্ছেন, কিন্তু কত প্রভেদ! - সবাই যখন কাঁদে, তিনি তখন চুপ করে থাকেন। সবাই যখন চুপ করে, তিনি কেঁদে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বারো ভাইয়ের বৈদিক বাড়ীতে বাচ্চা শিশুর অভাব নেই, যে যখন সময় সুযোগ পান বাচ্চাদের বুকের দুধ খাইয়ে যান। কিন্তু এই দেবশিশু মা ছাড়া আর কারও বুকের দুধ স্পর্শ করেন না। মহিলাদের মধ্যে এটি একটি প্রচণ্ড কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। সকলেই শিশুর মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে মুখ লুকিয়ে নিজের বুকের দুধ এগিয়ে দেন। কিন্তু আশ্চর্য! শিশু ঠিকই বোঝেন, তিনি আর কারও বুকের দুধ স্পর্শ করেন না, মুখ ফিরিয়ে নেন। শেষে নিরুপায় হয়ে সকলেই চেষ্টা ছেড়ে দেয়।

ক্রমে শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় হয়ে এল! জল্পনা-কল্পনা চলছে, এমন সময় পিতা সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তীর চাকরী ঠিক হয়ে গেল। সপরিবারে তিনি উজানচর-কৃষ্ণনগরে রওনা হলেন এবং রূপবাবুর জমিদারী সেরেস্তায় গিয়ে কাজে যোগদান করলেন।

সুতরাং অন্নপ্রাশন স্থগিত রাখা হ'ল। অল্প মাইনে, মাস গেলে উনিশ টাকা পান - কোনমতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। উজানচর-কৃষ্ণনগরেই শিশু বাড়তে লাগলেন, মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ী দোগাছি যান, ওখান থেকে মেদিনীমণ্ডলও যান।

উজানচর-কৃষ্ণনগরের বাড়ীর কাছেই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। জন্তু-জানোয়ার, সাপ-খোপের উৎপাতও আছে। শেয়াল বাচ্চাদের নিয়ে গেছে – এ রকম ঘটনাও ঘটেছে। একদিন শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন মাতা চারুশীলা। তিনি রান্নার কাজে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে একটা শেয়াল বাচ্চার ঘরে ঢুকে পড়েছে, বাইরে থেকে তার লেজটি দেখা যাচ্ছে। কোথা থেকে 'বাঘা' কুকুরটা ছুটে এসে শেয়ালটার লেজ কামড়ে ধরলো। বাঘা দুর্ধর্ষ কুকুর – তার হাতে পড়লে আর রেহাই নেই। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধস্তির পর শেয়ালটা ওর হাতেই মারা গেল। এত যে চিৎকার, শেয়ালের অন্তিম আর্তনাদ – তাতেও শিশুর ঘুম ভাঙে না। পরম শান্তিতে শিশু ঘুমোন।

শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখেছেন। হামাগুড়ি দিয়ে নেমে উঠোনের শেষে ঝোপ-জঙ্গলের প্রান্ত পর্যন্ত চলে যান। গোসাপগুলোর সঙ্গে খেলা করেন, লেজ ধরে টানেন, মুখে হাত ঢুকিয়ে দেন। গোসাপরা কিছু বলে না। তারা খেলার শেষে শিশুকে লেবু গাছের তলা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়।

সুরেন্দ্রবাবুর ছেলেটিকে সবাই ভালবাসে - এমন সুন্দর দেখতে খুব কমই দেখা যায়। শুধু ফুটফুটে ফর্সা বললে সব বলা হয় না - এত উজ্জ্বল সেই বর্ণ, যেন মনে হয় আলো ঠিকরে পড়ছে। তার ওপর আবার শিশুর জন্মবৃত্তান্ত মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। সুতরাং অনেকেই দেখতে আসেন। তাঁদের মধ্যে উজানচরের বিখ্যাত জ্যোতিষী মাধবাচার্য আর মাথাভাঙ্গার নামকরা সাধক মহিম আচার্যের কথাই শুধু বলা হচ্ছে। মাধবাচার্য শিশুকে খুব ভাল করে দেখলেন, বললেন "এ তো সাধারণ শিশু নয়। ইনি এক বিরাট মহান। এঁকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।"

কৃষ্ণনগরে মহিম আচার্য্যের অনেক ভক্ত ছিলেন। তাই তিনি মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন। সেইবার কৃষ্ণনগরে গিয়ে শুনলেন এই দেবশিশুর কথা। তাঁর ভক্তেরা নিয়ে গেলেন শিশুর বাড়ীতে। প্রথম দর্শনেই তিনি বলে উঠলেন, "ইনি এক অসাধারণ পুরুষ।"

।। দুই ।।

বছর পেরিয়ে গেছে। হাঁটতে শিখেছেন, শিশুকে বশে রাখা কঠিন, নিজের ধারায় তিনি চলতে চান। মায়ের সাথে শিশু গেছেন মেদিনীমণ্ডলে, মা খাইয়ে দাইয়ে শিশুকে বিছানায় শুইয়ে রেখে যান। পরক্ষণেই দেখেন, কি উপায়ে যেন শিশু বিছানা থেকে নেমে উঠানে

গিয়ে খেলছেন। মা আবার তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন। কিন্তু কি অদ্ভুত, নিজে উঠানে পৌঁছবার আগেই দেখেন শিশু উঠানে খেলছেন। মা আশ্চর্য্য হয়ে যান, জ্যেঠিমারা প্রমাদ গোনেন। বারবার একই ঘটনা ঘটছে – বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই দেখেন শিশু সেই উঠানে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন মা, জ্যেঠিমা মনোরমাদেবী বুঝিয়ে দেন শিশুর মাকে – 'দেখতে তো পাচ্ছিস, ও তো সাধারণভাবে হেঁটে আসছে না, অদৃশ্য হয়ে উড়ে চলে আসছে, তা না হলে আমাদের আগে উঠোনে পৌঁছচ্ছে কি করে?' শিশুর মাও এই অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করেন কিন্তু মুখে শুধু বলেন 'ওর সবটাই কেমন অদ্ভুত!'

বছর দেড়েকের শিশু, কি করে যে ইঁট দিয়ে উঁচু করা খাটের উপর থেকে অনায়াসে নেমে পড়েন, দেখবার মত। আবার জলচৌকি বা চেয়ার টেনে এনে কেমন সুন্দর বিছানায় উঠে পড়েন। একদিন শিশু ঘুমের মধ্যে গড়াতে গড়াতে খাটের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। ঘরে তখন জ্যেঠামশায় সুন্দর ঠাকুর বসে বসে পান খাচ্ছেন। হঠাৎ শিশু খাট থেকে পড়ে গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! মাটিতে পড়তে তাঁর বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগলো। সামান্য একটু শব্দ হ'ল, শিশু কেঁদে উঠলেন। শিশু অপূর্ব এক হাসি দিয়ে জ্যেঠামশায়কে অবাক করে দিলেন। তাঁর এই ভাইপো যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে এসেছেন, তা সুন্দর ঠাকুরের অজানা নয়। ঘটনাটির

পরে তিনি সবাইকে শিশুর অন্তর্যামিত্বের কথা জানালেন। পান চিবোতে চিবোতে সুন্দর ঠাকুরের বাসনা হয়েছিল শিশুর কিছু অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখতে। এত তাড়াতাড়ি যে তাঁর আশা পূর্ণ হবে, তিনি চিন্তাও করতে পারেন নি। খাট থেকে শিশু মাটিতে পড়লেন এত ধীরে ধীরে যেন একটি পালক পড়ছে – পড়ার শব্দ হ'ল তাও অতি সামান্য। শাস্ত্রে পড়েছেন অষ্টসিদ্ধির কথা, সেদিন লঘিমা - শক্তির বিকাশ দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

মেদিনীমণ্ডল থেকে দোগাছি ফিরে গেলেন শিশু। পিতা সুরেন্দ্রচন্দ্র মফঃস্বল থেকে ফেরার সময় স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে গেলেন উজানচর-কৃষ্ণনগরে।

সুন্দর ফুটফুটে শিশু, সবাই আদর করে কোলে নেয়। কোলে কোলেই এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরে বেড়ান। রূপবাবুর কাছারীর নায়েব ত্রৈলোক্য সোম আর শিশু ঠাকুরের পিতা সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ী প্রায় একবাড়ীর মত। শিশুঠাকুর প্রায়ই ত্রৈলোক্য সোমের স্ত্রী শিশির কুমারীর কাছে থাকেন। ওঁর মেয়ে অণিমা আর শিশুঠাকুর প্রায় সমবয়সী। শিশিরকুমারী শিশুঠাকুরের মধ্যে অনেক কিছুই অদ্ভুত দেখেন। এতটুকু শিশু, তার মধ্যে এত ভাবগাম্ভীর্য আসে কোথা থেকে! শিশিরকুমারী প্রায়ই বলেন যে, শিশুর দেহ থেকে একটা অপূর্ব গন্ধ বেরোয়। ত্রৈলোক্য সোম বিশ্বাস করেন না, বলেন - ওর মা নিশ্চয় কোন সেন্ট মাখিয়ে দেন। শিশিরকুমারী মানতে রাজী ন'ন। বাজারের কেনা সেন্টের গন্ধ এটা নয়। যাই হোক,

তর্কাতর্কি না করে একদিন ছুটির দিন দেখে শিশুঠাকুরকে নিজেই গরম জল দিয়ে স্নান করালেন। পরিষ্কার জামা কাপড় পরিয়ে দিলেন। কিন্তু আবার সেই সুমধুর গন্ধ শিশুর দেহ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। ত্রৈলোক্য সোম সেদিন থেকে মেনে নিলেন যে, সেই সুমধুর গন্ধ শিশুর সহজাত।

।। তিন ।।

দুই বছরের শিশু যে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। তাই মাতা চারুশীলা যখন ডেকে ডেকে পেতেন না, চারিদিক খোঁজাখুঁজি করেও ছেলের সন্ধান পেতেন না, তিনি বিরক্ত হয়ে উঠতেন। শেষে খুঁজে পেতেন খাটের তলায় ধীরস্থিরভাবে বসে আছেন। মা কিন্তু বুঝতেন না, তাই শিশুঠাকুর ভর্ৎসনার হাত থেকে রেহাই পাননি।

সেবার জন্মাষ্টমীতে মাতা চারুশীলা শিশু ঠাকুরকে নিয়ে এসেছেন ঢাকাতে। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখবার মত। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে মানুষ আসে মিছিল দেখতে। এমন বর্ণাঢ্য মিছিল বাংলাদেশে বিরল। ঢাকার এই মিছিলের তুলনা নেই, তাই দেশ বিদেশ থেকে মানুষ দেখতে আসে বর্ণে-সমারোহে পূর্ণ এই বিরাট মিছিল। হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে হরিনামাঙ্কিত নিশানে নিশানে রাজপথ প্লাবিত করে আসছে মিছিল। বৈদিক বাড়ীর মেয়েরাও এসেছেন মিছিল দেখতে

– তন্ময় হয়ে দেখছেন বিশাল জনসমুদ্র আর রংয়ের বাহার। মায়ের সঙ্গে শিশুঠাকুরও দেখছেন। হঠাৎ একটা রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে শিশু পড়ে গেলেন। মিছিলের কারও কারও এই দুর্ঘটনার দিকে নজর পড়লো - তারা চিৎকার করে উঠলো। মাতা চারুশীলা তাকিয়ে দেখেন শিশু পড়ে যাচ্ছেন – দুশ্চিন্তায় তাঁর মন কেঁদে ওঠে। কি করবেন বুঝতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। অত উঁচু থেকে পড়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু!

এদিকে শিশু পড়ছেন একটি হাল্কা পালকের মত অতি ধীরে ধীরে। সামনে সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন – মনে দ্বিধা, ভার সইতে পারবেন কিনা। শিশু এসে ভদ্রলোকের হাতের উপর পড়লেন। তাকিয়ে দেখলেন ভদ্রলোক – শিশু খিল খিল করে হাসছে। কোন ওজনই তিনি অনুভব করলেন না। দু’বছরের শিশুর এই লঘিমা-শক্তির বিকাশ দেখে মানুষ সেদিন আশ্চর্য হয়ে যায়। দ্বিগুণ উৎসাহে মিছিল চলতে থাকে।

শশীকলার মত শিশু দিন দিন বাড়ছেন। তিন বছর পূর্ণ হতে আর বেশী বাকি নেই। বয়োজ্যেষ্ঠা আত্মীয়ারা শিশুর কথা শুনে হাসেন, বলেন - ‘ও যে বিজ্ঞের মত কথা বলে, যেন সব জেনে বসে আছে।’ নিজের ইচ্ছা মত শিশু ঘুরে বেড়ান।

একবার দেশের বাড়ীতে দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই একটু বিশ্রাম করছেন। শিশু এই

ফাঁকে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। দুধের সর খেতে তিনি ভাল বাসেন। ঢুকেই দেখেন উনুনের পাশে মস্ত বড় একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সাপটা চলে না গেলে তিনি দুধের কড়াইয়ের কাছে যেতে পারছেন না – তাই রুটি বেলার বেলনটা নিয়ে সাপের দিকে তেড়ে গেলেন। সাপটা ফোঁস করে ফণা তুলে উঠলো। শিশু বেলনটা দিয়ে সাপটাকে মারতে যাচ্ছেন, সাপটাও মুখ সরিয়ে ফোঁস ফোঁস করে উঠছে। সাপের গর্জন শুনে কে একজন উঁকি মেরে দেখে, ভয়ে ‘সাপ’ ‘সাপ’ বলে চেঁচিয়ে উঠল। শিশুঠাকুর কিন্তু নির্ভীকভাবে সাপটার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত সাপটা ক্লান্ত হয়ে ঘরের নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হ’ল। ইতিমধ্যে শিশুঠাকুরের মা-জ্যেঠিমারা এসে পড়েছেন। তাঁরা দেখছেন, কিন্তু এমন একটা অবস্থা যে এগিয়ে এসে কিছু করতেও পারছেন না। সাপটা পালিয়ে গেলে শিশুঠাকুরকে কোলে নিয়ে মাতা চারুশীলা ঘরে চলে গেলেন এবং মনে মনে অন্তর্যামীকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

।। চার ।।

শিশুর খেলাও অদ্ভুত। কৃষ্ণনগরে কাছিম নিয়ে খেলার কথাই ধরা যাক। বিনয় সোম কোথায় যেন যাচ্ছিল। উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শিশুর খেলা দেখতে লাগলো। গতকাল বাজার থেকে যে কাছিমগুলো

কিনে এনেছে, শিশু সেগুলো এক এক করে লেজ আর চাড়া ধরে উল্টে দিচ্ছেন। শিশুর কাছিমগুলোকে উল্টে দেবার কায়দা বিনয়ের বেশ ভাল লাগছিল, তাই সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটা কাছিম উল্টোতে গিয়ে লেজ না ধরে ভুল করে শুঁড় ধরতে গেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে কাছিমটা শিশুর হাত কামড়ে ধরেছে। কাছিমের কামড় সাংঘাতিক – অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। 'গেল' 'গেল', বলে বিনয় চিৎকার করে উঠলো। শিশু কিন্তু নির্বিকার, রাগ করে কাছিমটাকে বলছেন, 'ছাড়লি না, ছাড়লি না – না ছাড়লে মজা দেখিয়ে দেব।' বিনয়ের চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এসেছে, কিন্তু ততক্ষণে কাছিমটা শিশুর হাত ছেড়ে দিয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে যে, শিশুর হাতে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই, কাছিমটা যে কামড়ে ধরেছিল তা বোঝাই যাচ্ছে না।

বয়স তিন বছর হলে কি হবে, শিশু স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। লোকে যাতে বিরক্ত না করে, তার জন্য কখনও তিনি সুপারী বাগানে, কখনও বা কলাবাগানে গিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হন। কতকগুলি শেয়াল মাঝে মাঝে এসে তাঁকে ঘিরে বসে, কিন্তু কোন ক্ষতি করে না। এদিকে শৃঙ্খলা বোধ বেশ আছে, ঠিক সময়মত বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ন যাতে মায়ের কাছে ভর্ৎসনা খেতে না হয়। তাঁর সাথীরা মনে করতো – এটাও আর একটা খেলা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে বসে থাকা অতটুকু বাচ্চার পক্ষে কি করে সম্ভব! খেলার সাথীদের

সঙ্গে আবার কখনও কখনও খেলাও করেন। ক্রমে বয়স বাড়ছে। বয়স্ক সাথীদের সাথে আনন্দ মাষ্টারের পাঠশালায়ও গিয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকেন।

গ্রামের সরল মানুষ কিন্তু এই তত্ত্বরূপী শিশুকে চিনতে পারে এবং যখনই সুযোগ পায় শিশুকে মাঠের মধ্যে আসনে বসিয়ে পূজো করে, তাঁর চরণামৃত নেয়, ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান খোঁজে। শিশুঠাকুর ওদের কথা মন দিয়ে শোনেন। আধো আধো দু'একটি কথায় ওদের সমস্যার সমাধান করে দেন। শিশু ঠাকুরের কথা ওরা খুব মানে, কারণ তাঁর কথা ওরা কখনও মিথ্যা হতে দেখেনি।

খেলাধুলাতে শিশু সাথীদের সঙ্গে যোগ দেন। একবার 'ছোঁওয়া-ছোঁওয়ি' খেলা চলছে। মাঠের ধারে নিচু হয়ে হেলে পড়া গাছটার কাছেই বাচ্চারা খেলতে ভালবাসে। সবাই গাছে ওঠে, লাফ দিয়ে ধুপ করে পড়ে। শিশুঠাকুরও লাফ দিলেন, কিন্তু তাঁর মাটিতে পৌঁছতে লাগে পাঁচ-দশ মিনিট। কাছে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অবাক লাগে এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে। লোকের মুখে মুখে এই কথা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু এত প্রত্যক্ষদ্রষ্টার মুখে শুনে বিশ্বাস না করেও পারে না। ক্রমে তাঁকে দেখার জন্য লোকের ভীড় বাড়তে থাকে।

ত্রৈলোক্য সোমের মেয়ে অণিমা শিশুঠাকুরের সমবয়সী। খেলতে খেলতে শিশুঠাকুর তাকে নানারকম

সুস্বাদু, দুষ্প্রাপ্য ফল দেন। অসময়ে ঐ সুস্বাদু ফল অণিমার হাতে দেখে ত্রৈলোক্য সোম ওকে রাগ ক'রে জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে সে ঐ ফল পেল। কাঁদতে কাঁদতে অণিমা বলে, শিশুঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছে। দুই চারদিন এই ভাবে অণিমাকে ফল আনতে দেখে একদিন শিশুকে ডেকে পাঠালেন ত্রৈলোক্য সোম, জিজ্ঞেস করলেন, 'অণিমাকে তুমি ফল দিয়েছ?' শিশুঠাকুর বলেন, 'হ্যাঁ।' শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে ত্রৈলোক্য সোম আর কিছু বললেন না। শিশুঠাকুরের অলৌকিক শক্তির কথা তাঁর কানে আসে, সুতরাং আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করেন না।

শিশুঠাকুর একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেন, 'মা, আঁতুড় ঘরে একদিন মালসার আগুনের ফুলকি এসে আমার পেটে পড়েছিল না? পেটের এই দাগটা কি সেই ফোস্কার দাগ মা?' মাতা চারুশীলা তো অবাক! চারদিনের দিন আগুনের একটা ফুলকি গিয়ে শিশুর পেটে পড়ে – একটা ফোস্কাও পড়েছিল - কিন্তু ও জানলো কি করে? শিশুঠাকুর বললেন, 'মা, সে কথা আমার বেশ মনে আছে। তুমি তাড়াতাড়ি কি একটা ওষুধ লাগিয়ে দিলে, তাই না?' চারুশীলা মুখে কিছু বলেন না, মনে মনে ভাবেন 'কী ধরনের ছেলে – আশ্চর্য করে দেয়! আর তো কেউ জানেও না যে ওকে বলবে।'

বয়স অল্প হলে কি হবে! প্রতিদিন এত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে তার হিসেব রাখা কঠিন। ভক্তের সংখ্যাও

যেমন বাড়ছে, শিশুঠাকুরের লীলাও তেমনি বাড়ছে। তাঁর স্পর্শে যদি কঠিন রোগ নিরাময় হয়ে যায়, তাঁর আশীর্বাদে যদি দুরূহ সমস্যা থেকে মানুষ মুক্তি পায়, তবে ভক্তেরা ভীড় করবে না কেন?

গ্রামের অশিক্ষিত কিন্তু সহজ সরল মানুষই শিশুঠাকুরের দেবত্ব উপলব্ধি করতে পারে সর্বপ্রথম, তাই তারা মহানন্দে তাঁর জন্মোৎসব পালন করে। চার বছর বয়স – ভক্তেরা তাঁকে কাঁধে করে নাচে। শিশুঠাকুর আধো আধো ভাষায় বলেন – ‘সবাই তোমরা ভগবানকে পাবে। ভগবানকে তো পেয়েই আছ, শুধু উপলব্ধি করতে পারছ না। সবার মধ্যেই তো ভগবান আছেন। ...’ সেই যে তত্ত্বের স্ফুরণ, পাঁচ বছর বয়স হতে না হতে তা’ অফুরন্ত ধারায় নেমে আসতে শুরু করলো।

এদিকে অলৌকিক ঘটনারও অন্ত নেই। একদিন শিশুঠাকুর ঘটি নিয়ে নদীতে গেছেন জল আনতে। একটু অসাবধান হয়েছেন আর এর মধ্যেই একটা ঢেউ এসে ঘটিটা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ঘাটে বসে আনন্দ মাষ্টার আহ্নিক করছিলেন। শিশু ঠাকুর তাঁকে বললেন, ‘আমার ঘটিটা ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ওটাকে এনে দিন।’ ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আনন্দ মাষ্টার বলেন, ‘তুমি ভেব না, তোমাকে একটা নতুন ঘটি কিনে এনে দেব হাট থেকে।’ শিশু কিন্তু ওই কথায় দমবার পাত্র নন। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঘটিটা অনেকদূর চলে গেছে। শিশু ঠাকুর জলের উপর দিয়ে এক দৌড় দিয়ে ঘটিটা ধরলেন, তারপর

সাবলীল গতিতে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে এলেন। আনন্দ মাষ্টার তো দেখে অবাক! এ কি করে সম্ভব! রক্তমাংসের শরীর নিয়ে জলের ওপর দিয়ে কী করে হাঁটতে পারে! এ দৈবশক্তি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

গ্রামের লোক যখনই কোন বিপদে পড়ে, বাচ্চা গোঁসাই-এর শরণাপন্ন হয়। সেবার ভীষণ খরা চলছে - মাঠ ফেটে চৌচির – চাষের কোন আশা নেই। চাষীরা এসে বাচ্চা গোঁসাইকে ধরলো – বৃষ্টি আনতে হবে। গোঁসাই মিটি মিটি হেসে বললেন, ‘বৃষ্টি এখন খেলতে গেছে। খেলা শেষ হলে, তোমাদের যেমন ডেকে আনি, বৃষ্টিকেও ডেকে আনব, তোমরা বসো।’ কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে গোঁসাই বললেন, ‘কই বৃষ্টি এল না তো। বৃষ্টি, না এলে তোমাকে দেখিয়ে দেব।’ আকাশে মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, প্রখর রৌদ্র-তাপে সব জ্বলছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথাও কিছু নেই, কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ মেঘ করে প্রবল বর্ষণ শুরু হ’ল। জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেল। চাষীরা আনন্দে বলে উঠলো, 'গোঁসাই, আর দরকার নেই।' বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। এই ভাবে ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করলেন। ওরা মনের আনন্দে বিদায় নিল।

অন্নপ্রাশন বা নামকরণ কোনটাই হয়নি। নাম রাখা হয়েছে বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী- বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, ‘বীরু’ বলে ডাকেন। ভক্তেরা নাম ধরে ডাকতে চায় না, তাই বাচ্চা ঠাকুর, বাচ্চা গোঁসাই, বালক ঠাকুর, বালক গোঁসাই – যার যে নামে খুশী ডাকে।

শিশুঠাকুর তিতাসের পাড়ের মাঠটায় প্রায়ই গিয়ে বসতেন ভক্ত পরিবৃত হয়ে। সেদিনও মাঠে বসে আছেন; হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘এই রে ডুবলো!’ সবাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ‘কি ডুবলো?’ উত্তর এল, ‘মেঘনা নদীতে হঠাৎ একটা নৌকা ডুবে গেছে, ওটাতে লালমোহন আর কেষ্টা আছে।’ হাতটা সামনে বাড়িয়ে, পরমুহূর্তেই বলে উঠলেন, “এই তো দেখ, ওদের বাঁচিয়ে রেখেছি।” দুদিন পরে লালমোহন আর কেষ্ট নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এসে বললো যে, তারা অতল জলে তলিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভাবে যে বেঁচে গেল বুঝতেও পারল না।

।। পাঁচ ।।

শিশু পাঁচ বছরে পড়েছেন। প্রায়ই তাঁকে দেখা যায় কখনও নদীর ধারে, কখনও সুপারী বাগান বা কলা বাগানে ধ্যানে মগ্ন। তাঁকে ঘিরে থাকে শেয়ালের দল, একটা জাতি-সাপও ফণা তুলে শান্তভাবে বসে থাকে। সাত হাত লম্বা এই জাতি-সাপটা হঠাৎ একদিন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঠাকুরের পিছু ধরলো। তিনি হাঁটলে, পোষা কুকুরের মত পিছন পিছন চলে। তিনি দাঁড়ালে, ও দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে এই সময় তিনি আনন্দ মাষ্টারের পাঠশালায় গিয়ে বসেন, সাপটাও পাঠশালা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, আবার বাড়ী ফেরবার সময় পিছু নেয়। এটা হ’ল

নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ঘরের ভিতর যখন বসেন, সেই জাতি-সাপটা এসে বিড়া পাকিয়ে বসে থাকে। এত বড় বিষধর সাপকে সেখানে দেখে সবাই ভয় পায় এবং সাপটাকে আসতে দেওয়ার জন্য সবাই অনুযোগ দেয়। শিশুঠাকুর তাঁর স্বভাবসুলভ সরলতায় মাখা আধো আধো ভাষায় বলেন, "সাপটা দেখলে তো ভয় করে, কিন্তু ও আমাকে এত ভালবাসে যে কিছু বলতে পারি না।" শিশুঠাকুর ধ্যানে বসলেই সাপটা এসে হাজির হয়। সারারাত তিনি ধ্যানে বসে থাকেন, সাপটাও বসে থাকে। ভক্তদের যখন উপদেশ-নির্দেশ দেন, সেও বসে শোনে আবার ভোর হলেই চলে যায়। এই ব্যাপার দেখে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, 'এভাবে ও রোজ আসে কেন?' শিশুঠাকুর বলেন, "তোমরা যে কারণে আস, ও সেই একই কারণে আসে।"

পূজার সময়ে মায়ের সঙ্গে শিশু দেশের বাড়ীতে গেছেন। ধূমধাম করে কালীপূজা হচ্ছে। বলি দেবার সময় হয়ে এল। শিশুঠাকুর তাঁর এক সাথীকে নিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে পূজা দেখছিলেন। ছাগশিশুর আর্তনাদে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো। - তিনি তাঁর সাথীকে বললেন – 'এ বলি কিছুতেই হতে পারে না।' তিন-চার বার চেষ্টা করেও ছাগশিশুকে বলি দেওয়া গেল না। শিশুঠাকুর নিশ্চয় কিছু করেছেন ভেবে সবাই তাঁকে ধরলো। শিশু দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'মায়ের সামনে

তাঁর সন্তানকে হত্যা করবে আর মা সেটা নীরবে সহ্য করবেন – এ কখনও হতে পারে না।’

-‘কিন্তু এ তো শাস্ত্রের বিধান’- তাঁরা বলে উঠলেন।

- ‘কখনই না’, বলতে বলতে শিশুর মধ্যে এক দিব্য জ্যোতি দেখা গেল, ‘শাস্ত্র বলে মনশুদ্ধির কথা, কারণ শুদ্ধ মনেতেই মহাশক্তির প্রকাশ হয়। মন শুদ্ধ করতে হলে ষড়রিপুকে বশে আনতে হয়। শাস্ত্রে ছাগশিশুকে বলি দেওয়ার কথা বলে নি, বলেছে জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে মনের কুবৃত্তিগুলিকে জয় করতে।’..........

পাঁচ বছরের শিশুর মুখে এই গভীর তত্ত্ব শুনে সেদিন সবাই অভিভূত হয়েছিল।

দেশের বাড়ীতে ভোর বেলায় স্নান করে বৈদিক বাড়ীর মেয়েরা পূজার ফুল তুলতে যায়। শিশুঠাকুরও ওদের সঙ্গে যান। মেয়েরা ফুল তুলে সাজিতে ভরে, আর শিশু সেই ফুল নিয়ে নিজের পায়ে ঢালেন। মেয়েরা রাগ করে, বলে ‘তোর কি সাহস, পূজার ফুল তোর পায়ে ঢালছিস!’

শিশু জবাব দেন, ‘কেন, কি হয়েছে? আমার পায়ে দিচ্ছি, আমি বুঝতে পারছি, আমার ভাল লাগছে। তোরা তো পাথরের উপর ফেলবি – পাথর বুঝবেও না।’

মেয়েরা বলে, ‘দেখিস, ভগবান রাগ করবে। ঠাকুর যখন শাপ দেবেন তখন বুঝবি।’

শিশু জবাব দেন 'তোদের ঠাকুর বুঝি খুব রাগী? আমি কিন্তু ঠাকুর হলে একটুও রাগ করতুম না। বরং সকলকে ভালবাসতুম – খুব ভালবাসতুম।' শিশুঠাকুর নিজের গায়ে ফুল ছেটান, নিজের পায়ে নমস্কার করেন। ওরা চটে গিয়ে বলে, 'তুই শিব-পূজার ফুল নষ্ট করছিস, বলে দেব।' শিশুঠাকুর উত্তর দেন, 'চেঁচাচ্ছো কেন দিদি? মাটি, পাথর যদি ভগবান হয়, তবে আমার খেলার পুতুলটাও ভগবান ... ভগবান কোথায় নেই? মাটি যদি ভগবান হয়, তবে মানুষই বা ভগবান হবে না কেন?'

মেয়েরা সেদিন বদ্ধ পাগল ভেবে শিশুর কথা উপেক্ষা করেছিল, কারণ ছোট ভাইকে কি আর অত সহজে মানা যায়! যে গভীর তত্ত্ব তিনি সেদিন দেন, তা বুঝবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

গৃহদেবতা গোবিন্দের মূর্তি সরিয়ে যেদিন নিজের খেলার পুতুলকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন, সুন্দর ঠাকুরের মত জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতও সেদিন কিন্তু সংস্কার দূর করে শিশুঠাকুর কি বলতে চাইছেন তা' বুঝতে পারেন নি। তাই গোবিন্দকে নিয়ে পাঁচ বছরের শিশুকে পুকুর পাড়ে খেলা করতে দেখে তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠলেন, 'না জানি, কি অমঙ্গল হয়!'

শিশুঠাকুরের এক জ্যেঠামশায় হরেন্দ্র ঠাকুর তো ভীত কণ্ঠে বলেই উঠলেন, 'কি কালাপাহাড়ই এলো!'

শিশুঠাকুরের ঠাকুমা কিন্তু তাঁর প্রত্যয়ে অটল, 'তোরা যাই বল বাপু- কালাপাহাড়ই বলিস আর যাই

বলিস, দেখবি একদিন ওই কালাপাহাড়ই কালাচাঁদ হয়ে আসবে।'

শিশুঠাকুরের শিক্ষাজীবন তখনও শুরু হয়নি, পাঠশালায় ভর্তি হন নি, তবু কলাপাতা বগলে করে আনন্দ মাষ্টারের পাঠশালায় গিয়ে মাঝে মাঝে বসেন। আনন্দ মাষ্টার শিশুকে খুব ভালবাসেন। শিশু সাথীদের সাথে 'গাউছা-মাউছা' খেলছেন, একটা হেলানো পিটুলী গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ছেন, ছোটাছুটি করছেন। আনন্দ মাষ্টার তখন পিটুলী গাছেরতলা দিয়ে যাচ্ছেন। শিশু লাফ দেবেন, বলে উঠলেন 'মাষ্টার মশায় ধরুন', বলে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। আনন্দ মাষ্টার ঘাবড়ে গেলেন, ছেলেটির ওজন সইবার ক্ষমতা কি তাঁর আছে! কিন্তু কি আশ্চর্য! শিশু যখন আনন্দ মাষ্টারের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আনন্দ মাষ্টার অবাক হয়ে দেখলেন শিশুর দেহ পালকের মত হাল্কা! কি করে এটা সম্ভব! লঘিমা শক্তির কথা বইয়েই শুধু পড়েছেন, সেদিন শিশুর কাছে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পেয়ে আনন্দ মাষ্টার অভিভূত হয়ে পড়লেন।

বিরাট শক্তির অধিকারী হয়েও কিন্তু শিশুঠাকুর বাস্তবের সব আচার-ব্যবহার নিখুঁত ভাবে মেনে চলেন। যে যা বলে, অম্লানবদনে তাই করে দেন। তাই অনেকের ফুটফরমাস তাঁকে খাটতে হয়। কারও পাকাচুল বেছে দেন, কাউকে গা টিপে দেন, কারো বা তামাক সেজে দেন।

নায়েব ত্রৈলোক্য সোমের জামাই আশু মজুমদার শিশুঠাকুরের সাজা তামাক খেতে খুব ভালবাসেন; বলেন, ‘ও যে তামাক সাজে, তা খেতেও যেমন চমৎকার, চলেও তেমনি অনেকক্ষণ।’ আশু মজুমদার পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার - থাকেন নারায়ণগঞ্জে। যখনই কৃষ্ণনগরে আসেন, শিশুঠাকুরের হাতে সাজা তামাক খাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সেদিন শিশুকে তামাক সাজতে বলেছেন। কাছারীঘরে ভীষণ ভীড় - কিসের দরবার চলছে। শিশুঠাকুর তামাক সেজে নিয়ে এলেন – কী অপূর্ব তার স্বাদ, কী চমৎকার গন্ধ! হঠাৎ আশু মজুমদারের খেয়াল হ’ল যে, তামাক তো রয়েছে কাছারীঘরে, ওখানে তো এখন ঢোকার উপায় নেই – আর শিশু তো উল্টোদিকে ওই বড় গাছটার পিছন থেকে এল! ওখানে তামাকই বা পেল কোথায়, আগুনই বা কোথায় পেল? আশু মজুমদারের মনে খটকা লাগলো। তবে কি শিশুঠাকুরের ঐশ্বরিক শক্তির কথা যা’ শুনে আসছেন বহুদিন ধরে, তা’ সত্যি? সেদিন থেকে আশু মজুমদার আর শিশুঠাকুরকে তামাক সাজতে বলতে পারেন না।

শিশুঠাকুরের মধ্যে নানা পরিবেশে নানা ভাব ফুটে ওঠে। যাঁরা তাঁকে সন্তানের মত দেখেন তাঁদের কাছে তিনি দুরন্ত শিশু, ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ান – বয়সোচিত চঞ্চলতা, ছেলে-মানুষী দেখান আর তারই মধ্যে উপযুক্ত পরিবেশ দেখে আপন স্বরূপের কিছু আভাস দেন। যাঁরা

তাঁকে আর পাঁচ জন শিশুর মত ভাবেন - তাঁদের কাছে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালেরাখেন – তাই তাঁরা তাঁকে ‘বুদ্ধিহীন’ বলে ভাবতেও দ্বিধা করেন না।

শিশুঠাকুরের মাসীমা কমলা দেবী শিশুঠাকুরকে খুব স্নেহ করেন। মামাবাড়ী দোগাছিতে যখনই যান, মাসীমাই তাঁর দেখাশুনা করেন। খাবার সময় পার হয়ে যায়, শিশুঠাকুর কোথায় কোথায় যান খুঁজেও পাওয়া যায় না। সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, সব জায়গায় বেশ জল দাঁড়িয়ে গেছে। মাসীমা শিশুঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করছেন, এমন সময় দেখেন শিশুঠাকুর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন জলের ওপর দিয়ে; জায়গায় জায়গায় এক হাঁটুরও বেশী জল অথচ শিশুঠাকুরের পায়ের পাতাও ভিজছে না। অবাক বিস্ময়ে মাসীমা ভাবেন – ‘কে ইনি!’ শিশুঠাকুর দেরী করা স্বত্বেও সেদিন তিরস্কারের হাত থেকে তাই রেহাই পেলেন।

তিনি কোথায় যে কখন থাকেন কেউ বলতে পারে না। মেঘনা নদীর উত্তাল তরঙ্গের উপর ধ্যানাসনে পাঁচ বছরের শিশুঠাকুর যখন শান্ত সমাহিত হয়ে বসেছিলেন, হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান নদী-পাড়ে ভীড় করে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ মানুষের কোলাহল শুনে বেরিয়ে এলেন, দেখে তো হতবাক, জলের উপর বসে থাকা কি করে সম্ভব! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, আবার না করেও উপায় নেই। সবাই তো একই দৃশ্য দেখছে।

।। ছয় ।।

ক্রমে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হ'ল। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে – লেখা-পড়া তো শিখতে হবে! পিতা সুরেন্দ্রচন্দ্র বালককে ভর্তি করে দিলেন লববাবুর পাঠশালায়। পাঠশালা বললে সাধারণত: মানুষের মনে হয় একটি দীন, সংস্কারবিহীন ঘর - সেখানে ছাত্ররা একটা অনাড়ম্বর পরিবেশে, দেশীয় ধারায় শিক্ষালাভ করে। শিক্ষার ধারা পাঠশালার ঐতিহ্য অনুসারে হলেও লববাবুর পাঠশালা ছিল নতুন টিনের বাংলো প্যাটার্নে তৈরী ঘর। সুন্দর রং করা ঘর। চারজন পণ্ডিত - তার মধ্যে লববাবুই প্রধান ছিলেন। পাঠশালায় তিনটি ক্লাস - অধ্যয়ন শেষ করতে লাগে তিন বছর। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করলে হাইস্কুলে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হওয়া যায়। এই লববাবুর পাঠশালায় বালক ঠাকুর ভর্তি হলেন ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে। কিন্তু পড়াশুনায় তাঁর মন নেই। কলাপাতা বগলে করে পাঠশালায় ঠিকই যান, কিন্তু পুরো লেখা কোনদিনই দেখাতে পারেন না – একটা গরু প্রায়ই পিছনে পিছনে আসে আর কলাপাতার অর্ধেক খেয়ে ফেলে - বালক খেয়ালও করেন না। লববাবুর পাঠশালা বালকের বিশেষ ভাল লাগে না, কারণ পণ্ডিত মশায় তুচ্ছকারণে পড়ুয়াদের যে গুরু শাস্তি দেন, তাতে তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগে। গোবিন্দ পণ্ডিত কঠোর শাস্তি দিতেন। - একদিন বালককেও শাস্তি পেতে হ'ল। আর সেদিনই ঘটনাক্রমে পণ্ডিতমশায়ের পেটে দারুন শূলব্যথা শুরু হ'ল। বালক বললেন,

'পণ্ডিতমশাই, আপনার পেটের ব্যথাটা কমিয়ে দেব?' প্রথমে বালকের কথায় চটে গেলেও, শেষ পর্যন্ত ব্যথা সহ্য করতে না পেরে বালকের সেবা গ্রহণ করতে গোবিন্দ পণ্ডিত রাজী হলেন। বালক ঠাকুর গোবিন্দ পণ্ডিতের পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন। সেই যে তাঁর শূলব্যথা ভাল হয়ে গেল, আর কোনদিন তাঁকে পেট-ব্যথা ভোগ করতে হয়নি।

আনন্দ মাষ্টার বাড়ীতে বালক ঠাকুরকে পড়ান। নিয়মিত তিনি পড়াতে আসেন ঠিকই, কিন্তু কাকে পড়াবেন? -পড়ায় যে বালকের মন নেই। সব সময়ে কোন ধ্যানে বালক মগ্ন হয়ে থাকেন, আনন্দ মাষ্টার বুঝতে পারেন না।

শেষে একদিন বললেন, "সবে পাঁচ বছর বয়স। ধ্যান-ধারণা কী জান না, জানবার কথাও নয়। পড়াশোনাও কর না, কিন্তু সারাক্ষণ দেখি চুপ করে বসে থাক। ডাকলে মনে হয় ঘুম থেকে উঠলে। কোথায় থাক তুমি?"

- কেন, আমি তো আমাতেই ডুবে আছি - এই বাস্তবজগতে বস্তুর সাথে মিশেই তো রয়েছি আমি। অনন্ত জগতের সুরের মধ্যেই তো ঘুরে বেড়াই। সব কিছুর সাড়াই তো পাচ্ছি আমি। সব কিছুর মাঝে তো আমি আমাকেই খুঁজে পাই।

- কই, আমরা তো সে সব বুঝতে পারি না?

- সবাই আমরা একই যোগাযোগে আছি। বিরাটের সুর - অনন্ত জগতের সেই সুর সবার ভিতরেই আছে। আপনারা মুখ বুজে আছেন, জিহ্বা কাজে লাগাচ্ছেন না - স্বাদ পাবেন কি করে? চিনি মিষ্টি ঠিকই আছে। কিন্তু জিভ লাগাতে হবে তো! জিভ দিয়ে চেটে চেটে তবে তো বিশ্বের স্বাদ পেতে হবে। তখন আসবে তন্ময়তা, আসবে গভীরতা। তখন দেখবেন খেয়াল থেকেও নেই - নিজের মাঝেই নিজে তন্ময় হয়ে আছেন – সব কিছুতেই আপনি মিশে আছেন। এই যে আস্বাদ নেবার জিহ্বা - বাস্তব জগতের দুঃখ-বেদনার সুরে, ব্যথা ও শোকের সুরে এটা খুলতে থাকে। মহাশান্তি ও পরিতৃপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এসব রোগ, শোক, দুঃখ যাতনা – আক্কেল দেবার জন্য নয়। প্রকৃতির নিয়মে সবারই সে জিহ্বা সহজ গতিতে স্বাভাবিকভাবে খুলছে। সবারই শক্তির স্ফুরণ হবে একদিন। ফুটিয়ে তোলার সেই নিয়মটা পালন করতে হবে। ঠিক সময়ে আপনিই ফুটে উঠবে। বীজ আকারে রয়েছে, গাছ আকারে বের হবেই। ....

আনন্দ মাষ্টার অবাক হয়ে বালকের কথা শোনেন আর ভাবেন – ‘কী শেখাবেন তিনি! সবই তো বালক জেনে বসে আছেন।‘ তবু তাঁকে শিক্ষকের কর্তব্য পালন করতে হয়।

এত বিরাট তত্ত্বজ্ঞ – তাঁকেও বাস্তবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেসুরকে সুরে আনতে হয়। খেলার সাথীরা

শুধু চঞ্চল দুরন্তই নয়, অনিষ্ট করার বুদ্ধিও তাদের মধ্যে আছে। প্রায়ই তারা পাখীর বাসা থেকে ছানা নিয়ে এসে পোষে। বালকের এটা মোটেই ভাল লাগে না। তিনি নিষেধ করেন কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। বিভিন্ন পাখীর বাসা থেকে ডিম নিয়ে এসে বালককে দেখায়। কোনটা কাকের, কোনটা শালিকের, কোনটা বা দোয়েলের ডিম। বালক বলেন, "যা রেখে আয়। ডিমটা ফুটতে কোনটা কুড়ি বাইশ দিন, কোনটা একমাস দেরী। ইচ্ছে করলে, এখনই ফুটিয়ে দিতে এবং বাচ্চাকেও বুড়ো বানিয়ে দিতে পারি। যে কারণে ডিমটা ফোটে, সেই কারণটা ওর মধ্যে জমাট করে দিতে পারলেই হ'ল।" একটা ডিম হাতে ছিল, বলার সঙ্গে সঙ্গে ডিমটা ফেটে বাচ্চা বের হ'ল। আবার পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে ছানাটা বড় হয়ে ডাকতে শুরু করলো – ওরা তো দেখে অবাক! দুই তিন বছরের পাখির ক্ষমতা ওর মধ্যে এসে গেল। বালক ঠাকুর বললেন, 'কালই ও ডিম পাড়বে।' তারপর ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এই মুহূর্তটা আনাই হচ্ছে প্রয়োজন, এটাকেই লাভ করতে হয়, যেমন ব্যবসায়ে লাভ করে।' বালকের কথা তারা বুঝেছিল কিনা, বুঝলেও কতটা বুঝেছিল বলা শক্ত তবে সেদিন থেকে ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, বালকের কথা কখনও আর অগ্রাহ্য করে না তারা।

আবালবৃদ্ধবনিতা বালককে সমীহ করে চলে, কারণ তাঁর অন্তর্যামিত্বের কথা সবাই জানে। তাঁকে লুকিয়ে কেউ কোন কাজ করতে পারে না। বালক কখনও না-

বোঝার ভান করে থাকেন, আবার কখনও কখনও তাদের মনের কথা, কি করছে না করছে, সবার সামনে বলে দেন। তাই বালকের প্রতি সকলেরই যেমন ভালবাসা, তেমনি শ্রদ্ধা-ভক্তি।

তিতাসের পাড়ে বিরাট মাঠটায় খেলাধূলার পর বালক প্রায়ই গিয়ে বসেন। সেদিন কয়েকশ' লোক সেখানে জমা হয়েছে। প্রায় দু'শ আড়াইশ' লণ্ঠনের আলোতে বেশ একটু আলো হয়েছে। ভক্তেরা ধূপধূনা জ্বালিয়ে দিয়েছে। বালক ঠাকুর মাঝখানে বসে আছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "তোমরা সবাই একটু লক্ষ্য রেখ – আমায় যেন বাতাসে উড়িয়ে না নেয়।" সকলেই সতর্ক হয়ে বালককে ঘিরে বসলো, মুখে চোখে একটা আতঙ্কের ছাপ - কি জানি কি হয়! দেখতে দেখতে আকাশ কালো করে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। বালক গোঁসাই যেখানে বসে আছেন, সেখানেই ঝড়ের মাতামাতিটা যেন বেশি – হাওয়ার জোরে গোঁসাই দুলতে লাগলেন, আর কিছু দেখা গেল না। হঠাৎ তিনি উড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেলেন। – ঘটনাটি যে ঘটে গেল, কেউ টেরও পেল না। শুধু দেখলো বালক গোঁসাই নেই। একটু পরে নদীর ওপার থেকে গোঁসাই-এর গলা শোনা গেল, "আমায় নিয়ে যাও।" ফাল্গুন মাস - নদী পার হতেই চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট লাগে। খেয়া নৌকা চলে গেছে, সুতরাং উপায় নেই। চেঁচিয়ে সবাই বললো, 'যেভাবে গিয়েছো, সেই ভাবেই ফিরে এস।' একটু পরেই দেখা গেল বালক আগের মতই আসনে বসে

আছেন – হাতে তাঁর কয়েকটি ক্ষেতের ক্ষীরা। সকলেই প্রসাদ পে'ল।

।। সাত ।।

কিছুদিন পরে মাতা চারুশীলার সঙ্গে মামাবাড়ী দোগাছি গেলেন। সেখানে একু হাজরার [সুরেন হাজরার ডাক নাম একু হাজরা] স্কুলে ভর্তি হলেন। শিশুদের জন্য এই স্কুল - পাঠশালা নয়, কতকটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মত। লববাবুর পাঠশালায় বালকের পড়তে বেশি ভাল লাগতো না। লববাবু এবং পণ্ডিতমশাইয়েরা বালককে খুব ভালবাসতেন, সুতরাং বালক ঠাকুরের নিজের দিক থেকে কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু সামান্য কারণে পণ্ডিতমশাইয়েরা পড়ুয়াদের যে কঠিন শাস্তি দিতেন, সেটা তাঁর ভাল লাগতো না। একু হাজরার স্কুল একেবারে অন্যরকম – পড়াশুনা ভাল হয়। পরিবেশটাও বালকের পছন্দ। দুই একমাস পরে মা কৃষ্ণনগরে ফিরে গেলেন – বালক মামাবাড়ী দোগাছিতে মাসীমার কাছেই রয়ে গেলেন। ক্লাসে পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী - সবাই বালককে ভালবাসে। শেফালী, জয়ন্তী, অন্নপূর্ণা, মোহন, বাদলী, মণির তো বালকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। সবাই একত্রে স্কুলে যায় - একত্রে বাল্যশিক্ষা পড়ে, একত্রে অঙ্ক করে। সবাই সমবয়সী এবং সহপাঠী, ভালবাসার অন্ত নেই, কিন্তু বালককে ওরা সবার সঙ্গে এক

করে ভাবতে পারে না। ওদের কাছে তিনি হচ্ছেন 'গোপাল ঠাকুর' - যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যায়, অন্তরে সযত্নে ধরে রাখা যায়, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক - তার মধ্যে এখানকার হিংসা, দ্বেষ, কলহ-বিবাদ ডেকে আনা যায় না। সবাই এক পাত্র থেকে মধু পান করছে – কে বেশী পেল, কে কম পেল তা নিয়ে মান-অভিমান নেই, কলহ-বিবাদ নেই। সবাই বালকের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু কে বেশীক্ষণ পেল, কে কম সময় পেল তা নিয়ে কোন মন কষাকষি নেই, এমনি স্বচ্ছ ওদের ভালবাসা। অন্য সহপাঠীরাও বালককে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, কিন্তু তারা মান অভিমানের ঊর্ধ্বে তখনও উঠতে পারেনি। বালকের পরিবেশটি বেশ ভাল লাগে, কিন্তু বেশীদিন দোগাছির [বাংলাদেশ ছাড়বার পর আর শেফালী, জয়ন্তীর সঙ্গে ঠাকুরের দেখা হয় নি, তবুও প্রায়ই তিনি তাদের অন্তরের টানের কথা বলেন] স্কুলে পড়া হ'ল না। পূজার ছুটি এসে পড়লো। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। পূজার ছুটিতে দোগাছির বাড়ীতে মামা-মাসিরা সবাই এসেছেন। বালকের মা-বাবাও এসেছেন। বালক ঠিক করলেন, পূজার পরে কৃষ্ণনগরে ফিরে যাবেন এবং আনন্দ মাষ্টারের পাঠশালায় গিয়ে ভর্তি হবেন।

এদিকে পূজা কেটে গেল – কালী পূজা এগিয়ে আসছে। কালী পূজার দিন বালকের জন্মোৎসব – অনেক জায়গাতেই উৎসব করছে। স্কুলের সহপাঠীরা সবাই মিলে ঠিক করলো, তারা বালকের জন্মোৎসব পালন

করবে। বাড়ীতে সবাই বলেছে - বন্ধুর জন্মদিন পালন করবে। নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলেছে - সবশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকা উঠেছে। তখনকার পঞ্চাশ টাকা কম নয়। তাই দিয়ে ফল, মিষ্টি প্রভৃতি কিনে পূজার আয়োজন করেছে। বাড়ীর কাছেই একটা সপেটা গাছ ছিল। সেখানে ঠাকুর এবং তাঁর সমবয়সীরা ‘গাউছা-মাউছা’ খেলেন। গাছটা বেশ নিচু হয়ে ডালপালা ছড়িয়ে বেড়ে চলেছে। গাছের গোড়ায় ঠাকুরের সহপাঠীরা মিলে ভাল করে গোবর লেপে পরিষ্কার করেছে। সেখানে গাছের গোড়ায় একটি আসন পেতে ঠাকুরকে বসালো। ঠাকুরকে কেউ বলতো বন্ধু, কেউ বলতো প্রভু, কেউ বলতো গোঁসাই। বাড়ীতে সবাই বলে এসেছে, ‘আজ আমাদের বন্ধুর জন্মদিন, আমরা সারাদিন ওখানে খাওয়া দাওয়া করবো’। বয়সে বড় হলেও ঠাকুরকে খুব ভালবাসে বলে প্রফুল্ল হোড়, বাদল, কেরামত এবং আরও দুই একজনকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে – ওরা বিকালে আসবে। শেফালী (সবাই ‘শেফা’ বলে ডাকে), জয়ন্তী, অন্নপূর্ণা, বাদলী, মোহন, মণি প্রভৃতি দশ বারোটি ছেলেমেয়ে এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। সকলেরই বয়স ছয় সাত বছর। কারো কারো বড় ভাই বা বোন এসেছে, তবে বারো বছর বয়সের উপরে কেউ নেই। শেফা পুকুর থেকে করঙ্গ করে জল আনতে যাচ্ছিল, ঠাকুর নিষেধ করলেন, সুতরাং তার বড় বোন গিয়ে জল নিয়ে এল। বাড়ী থেকে চন্দন বেটে নিয়ে এসেছে। তাই দিয়ে ঠাকুরকে মনের মত করে সবাই সাজালো। একটা নতুন

শাড়ী চাদরের মত করে গলায় পরিয়ে দিল। তারপর ফল-মিষ্টির নৈবেদ্য সামনে সাজিয়ে দিয়ে শেফা পূজা করতে শুরু করলো। সংস্কৃত মন্ত্র তারা জানে না, সহজ সরল বাংলা ভাষায় হাতজোড় করে বলছে, 'আমাদের বাল্যবন্ধু, আমাদের দধিবাহন [দধিবাহন - শেফালীদের বাড়ীর বিগ্রহের নাম], আমাদের নারায়ণ, তুমি কৃপা করবে - আমরা যেন তোমার আদেশ মত চলতে পারি। হে কৃপাময়, আমরা অতি শিশু, আমরা শিশুবয়স থেকে একসাথী, – আমরা চিরকালই যেন সাথী হয়ে থাকতে পারি। তিনি বলুন – আমাদের কথাগুলো, আমাদের প্রার্থনা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছে কিনা। জানতে চাই, তিনি বলুন। আমাদের দয়া করে বলতে হবে।' ঠাকুর তখন বললেন, 'তোমরা যা বলেছ আমি শুনেছি। আমি খুব খুশী হয়েছি। আমি আশীর্বাদ করছি তোমরা চিরকাল আমার সাথী হয়ে থাকতে পারবে।' শেফা কাঁদতে লাগলো। ঠাকুর বললেন, 'তুমি কাঁদছো কেন?' শেফা বললো, 'আমরা থাকতে পারবো তো?' ঠাকুর তখন চন্দন নিয়ে সকলের কপালে দিয়ে দিলেন। ওরা গান গাইলো – 'গোপাল নারায়ণ, গোপাল ঠাকুর, গোপাল গোঁসাই'। গাছের পাতা এনে ঠাকুরের পায়ে দিল। জয়ন্তী সুরকি গুলে পায়ে লাগিয়ে দিল। শেফা বললো, 'তাঁর পা তো এমনিই লাল। আর লাল করবার দরকার কি?' শেষে শেফা পূজারিণীর ভঙ্গিতে ভোগের থালা নিয়ে ঠাকুরকে নিবেদন করলো। ঠাকুর একটু মুখে দিয়ে সবাইকে প্রসাদ দিলেন।

এইভাবে সহপাঠীদের পূজা সাঙ্গ হলো। ঠাকুরের ভক্ত বর্ষীয়ান পথচারী দুই-একজন যারা সেদিন সেই পূজা দেখেছিল, তারা সবাই একমত যে, এত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পূজা করতে তারা পূর্বে কখনো দেখেনি। ঠাকুরও তেমনি অন্তর-ঢালা ভালবাসা দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন।

এরপর খাওয়া-দাওয়া শুরু হ’ল। ওখানেই সবাই খাওয়া-দাওয়া করলেন, তারপর বেলা চারটে পর্যন্ত বিশ্রাম করলেন। চারটের সময় প্রফুল্ল হোড়, মানিক, কেরামত এবং আরও দুই-একজন নিমন্ত্রিত ছেলেরা এল। ঠাকুরকে প্রণাম করে ওরা খাওয়া-দাওয়া করলো। ওরা সবাই বললো, “চিরকাল যেন আমরা একত্রে থাকতে পারি।” ঠাকুর বললেন, “তোমরা আমার অন্তরের।”

এইভাবে বালক ঠাকুরের সপ্তম জন্মতিথির উৎসব পালিত হ’ল। ঠাকুর ছয় বৎসর পূর্ণ করে সাতে পড়লেন।

পূজার পর বালক মায়ের সঙ্গে উজানচর-কৃষ্ণনগরে ফিরে এসেছেন। দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতির পর ঠাকুরকে পেয়ে সকলেই খুশী। প্রতিদিন নানা ঘটনা ঘটে চলেছে – বালকের কার্যকলাপ দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে।

একদিন বালক কাছারীর পিছনে কলাবাগিচায় বসে আছেন, এমন সময় হরিচরণ লাঠি হাতে হন্তদন্ত হয়ে

ছুটে এসে বালককে জিজ্ঞাসা করলো, “গরুটা কোনদিকে গেছে দেখেছো?”

হরিচরণের ক্রূদ্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। শশাগাছটা শাখাবিস্তার করে ঝাঁকা বেয়ে উঠেছে – উপরে কচি কচি ডগায় অনেকগুলি শশা হয়েছে – এত ফল ফলেছে যে সবাই খেয়েও শেষ করতে পারবে না। গরুটা যদি দুই একটা ডগা খেয়ে চলে যেত, তবে হয়তো হরিচরণ এতটা রাগ করতো না। শুধু ডগাই খায়নি, গাছটাকে সমূলে উৎপাটিত করেছে। বালক মুস্কিলে পড়লেন: গাভীটাকে যদি দেখিয়ে দেন তবে আর ওর হাড়গোড় থাকবে না। আবার ‘জানিনা’ বললেও মিথ্যা কথা বলা হবে। বালক জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হয়েছে হরিচরণদা, তুমি এত চটেছো কেন?” হরিচরণ বলে, ‘চটবো না? ও আমার শশাগাছটাকে শেষ করে দিয়েছে, ওকে আজ মেরেই ফেলবো । বলো কোন দিকে গেছে।’ বালক জবাব দিলেন, ‘গরুটা কি জানে ওটা তোমার গাছ? ও খাবার জিনিস পেয়েছে, খেয়েছে – নিজের মনে করেই খেয়েছে। ওর দোষ কি? ওকে মারবে কেন?’

বালকের কথায় হরিচরণের রাগ পড়লো না, আবার জিজ্ঞাসা করলো “বলো, কোন দিকে গেছে।” এবার বালক বললো, “তুমি ওকে অযথা মারধোর করবে। আমি জানলেও বলবো না।” উত্তেজিত হরিচরণ সেদিন বালকের যুক্তি মানতে পারে নি; কিন্তু পরে বুঝেছিল কতটা সৎসাহস নিয়ে বালক নিরপরাধ গাভীটিকে অযথা

নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই শিশু বয়সেও সত্যকে তিনি বজায় রেখেছেন।

ছোট মেয়ে উৎসার [উৎসা - প্রতিভা ভট্টাচার্য (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের স্ত্রী এবং উজানচরের অতুল চন্দ্র রায়চৌধুরীর কন্যা) এখন বাঁশবেড়িয়াতে থাকেন] খেলার মধ্যে মাটির প্রতিমা তৈরী করে পূজো করা ছিল একটা প্রধান খেলা। মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ে, বুনো ফল, মাটি, বালি দিয়ে নৈবেদ্য সাজায়, মাটি দিয়ে নাড়ু তৈরী করে ভোগ দেয় - শিশুঠাকুর এসে সব ভেঙে চুরে দেন। বাল্য বয়সে খেলার সাথী উৎসার বীরুদা না এলে জমেনা, আবার বীরুদা এসে পূজা-পূজা খেলা ভেঙে দেয় - সেটাও ভাল লাগে না। সেদিন মন দিয়ে খেলছে উৎসা – শিশুঠাকুর এসে সব ভেঙে দিলেন। উৎসা কাঁদতে লাগলো। ঠাকুর বললেন – 'কাঁদছিস কেন, বোকা! এই নে, নাড়ু খা।' মাটির তৈরী নাড়ুগুলো একটি একটি করে ঠাকুর উৎসার হাতে দেন। উৎসাও পরম আনন্দে খেতে থাকে। - শিশু-মন, তাই তখনও বেশী প্রশ্ন জাগেনি। উৎসা ভাবতো বীরুদা দিলে মাটির নাড়ুগুলো অপূর্ব ক্ষীরের নাড়ুর মত খেতে লাগে। ঠাকুরের স্পর্শে যে মাটিরও ক্ষীরের মত স্বাদ লাগে, সে বুঝবার বয়স উৎসার তখনও হয়তো হয়নি। বাড়ীতে গিয়ে কিন্তু রোজই উৎসা বলতো, 'আমার মাটির নাড়ুগুলো বীরুদা কেমন ক্ষীরের করে দেয়। খেতে খুব ভাল লাগে।'

বালক ঠাকুরের বয়স ছয়-সাত বছর। পাঠশালার পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন ছুটি। রাঢ়ির খাল অনুকূল পালের বাড়ী উৎসব হবে। দোগাছি থেকে রাঢ়ির খাল আড়াই মাইল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ঠাকুরকে পালকি করে নিয়ে যাবে। সত্য কর্মকার রাজী হ'ল না, বললো, 'গোঁসাইকে আমি কাঁধে করেই নিয়ে যাব।' সারা পথ সে ঠাকুরকে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে গেল - বলে গোঁসাইয়ের তো কোন ওজনই নেই। প্রফুল্ল হোড়, টগরা, মানিক, বাদল, মোহন, শচীন, মনু এবং আরও অনেকে গেল রাঢ়িরখালে। ঠাকুরের মাসীমা কমলা দেবীকে নেওয়া হ'ল - তিনি উৎসবের রান্না করলেন। ছয় সাত বছরের শিশুঠাকুর - তাঁর জন্য উঁচু মঞ্চ করা হয়েছে। সেখানে বসিয়ে সকলে তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো। ঠাকুর সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। প্রচুর মানুষ সেদিন এসেছিল শিশুঠাকুরের কাছে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে। বয়সে শিশু হলে কি হবে - তত্ত্বে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, অলৌকিক শক্তিতে তিনি ভরপুর - তাই কাতারে কাতারে মানুষ আসে তাঁর দর্শন অভিলাষে। সেদিন যারা তাঁকে চিনতে পারেনি, তথাকথিত শিক্ষার অহমিকায় যারা শিশু বলে তাঁকে উপেক্ষা করেছে, তারাও পরে তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে।

এদিকে উজানচর-কৃষ্ণনগরে তামাক সাজার ঘটনা নিয়ে ত্রৈলোক্য সোমের মেয়েজামাই আশু মজুমদারের যে পরিবর্তন এসেছিল, তার সূত্র ধরে বহুদিন

তিনি চিন্তা করেছেন। একদিকে বালকের ঐশ্বরিক সত্তা তাঁকে আকর্ষণ করে, আর একদিকে তাঁর নিজের শিক্ষার এবং প্রতিষ্ঠার অহমিকা বাধা দেয়। এই দোটানার মধ্যে পড়ে বেশ কিছু দিন তিনি আড়াল দিয়ে থাকলেন। অবশেষে মনস্থির করে একদিন ঠাকুরের কাছে পারের কড়ি চাইলেন। সস্ত্রীক বালক ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। বোধ হয় এই প্রথম বালক ঠাকুর দীক্ষা দিতে শুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স ছয় সাত বছর হবে।

।। আট ।।

ক্রমে বালকের বয়স সাত-আট বছর হ'ল। একা-একাই ঘুরে ফিরে বেড়ান। মামাবাড়ী দোগাছিতে গেছেন। ওখান থেকে দেশের বাড়ী মেদিনীমণ্ডল মাত্র দেড় মাইলের পথ। বালক হেঁটেই বাড়ী চলেছেন। বর্ষার দিনে নৌকা করে যেতে হ'ত আর শুকনোর দিনে হয় হেঁটে, না হয় পালকি করে যেতে হ'ত। দু'জন ভদ্রলোকও হেঁটে চলেছেন, সঙ্গে চারজন মহিলাকে নিয়ে একটি পালকি। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে পালকির বেহারারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে – তাতে আবার ভারী পালকি নিয়ে চলতে হচ্ছে। নিরুপায় হয়ে ভদ্রলোকেদের ওরা বললো পালকিটা একটু হালকা করে দিতে। একজন ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'কেন, কম পয়সা নেবে নাকি?' বালকের মনে কষ্ট হ'ল - এগিয়ে গিয়ে বেহারাদের থামতে বললেন। ওরা দাঁড়ালো -বালক

পালকির ডাণ্ডা স্পর্শ করে বেহারাদের চলতে বললেন। ওরা আশ্চর্য হয়ে দেখলো, পালকি এত হাল্কা হয়ে গেছে যে দৌড়ে চলতেও কোন কষ্ট হচ্ছে না, কাঁধে কিছু আছে বলে মনেই হচ্ছে না। তাঁর স্পর্শে কি করে এমন হ'ল জিজ্ঞেস করায় বেহারাদের বালক ঠাকুর বললেন, 'বাতাসে কিছু ওজন দিয়ে দিয়েছি।' বালক ঠাকুরকে প্রণাম করে বেহারারা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রল। বালক উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের মতনই আছি।' ভদ্রলোক দুইজন যেন কেমন হয়ে গেলেন, বালকের পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। বালক ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেলেন - তাঁর সরলতা, অমায়িকতা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল।

ঢাকা শহরে স্বামীবাগে মামার একটি বাড়ী আছে। মাঝে মাঝে বালক সেখানে গিয়ে উঠতেন। আর যখন ঢাকায় যেতেন - কাছেই ছিল বিখ্যাত ধর্মগুরু ভোলাগিরির আশ্রম, সেখানে আশ্রমের পুষ্করিণীতে স্নান করতে যেতেন। সেবার ভোলাগিরি এসেছেন আশ্রমে। বালক স্নান করে একটা গামছা পরে, আর একটা গামছা গায়ে দিয়ে ভাটলার সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন – হাতে করঙ্গ, পায়ে খড়ম। ভোলাগিরি ভক্ত-পরিবৃত হয়ে কাছেই একটা আমগাছের গোড়ায় বাঁধানো আসনে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে উঠে পুষ্করিণীর দিকে এগিয়ে গেলেন। সবাই তো অবাক! বালক ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে গদ-গদ-ভাবে হিন্দীতে বললেন, 'মেরা জীবন সার্থক হুই, ব্রহ্ম পুরুষ মিল গেই।' বালক ঠাকুর ভোলাগিরির দিকে তাকিয়ে

মুচকি হাসলেন, জবাব দিলেন না। আশ্রমের ভক্তেরা সব এসে বালক ঠাকুরের পাদপদ্মে গড় হয়ে পড়তে লাগলো। তাঁর মুখে শুধু এক পরম করুণাময় হাসির রেশ। জমিদার যোগেশচন্দ্র দাস ভোলাগিরি আশ্রমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাঁরই বদান্যতায় ওই আশ্রমটি গড়ে উঠেছিল। বালককে তিনি অনেকদিন ধরেই চেনেন, কারণ বালক ঠাকুরের মামা পণ্ডিত হেরম্বনাথ তর্কতীর্থের কাছে তিনি বহুদিন থেকে বেদান্ত পড়ছেন। সেদিন কিন্তু তিনি পেলেন এক নতুন দিকের সন্ধান। তাঁর অধ্যাপকের টোলের বাইরে যে বালককে কখনও কখনও দেখেন, তিনি অবোধ বালক ন'ন, তিনি অসাধারণ।

মাথাভাঙ্গার বিখ্যাত সাধক, মহিম আচার্য এসেছেন উজানচর-কৃষ্ণনগরে। সেখানে তাঁর বেশ কিছু শিষ্য-ভক্ত আছে। নায়েব ত্রৈলোক্য সোম উদ্যোগী হয়ে তাঁকে এনেছেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে ছোট-খাট বেশ একটা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বহু লোক এসেছে তাঁর দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের আশায়। উৎসব চলছে। দরজা খুলে দিলে ভীড় হয়ে যাবে, তাই গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আগে দর্শন সেরে নিলেন। কথা প্রসঙ্গে বালক ঠাকুরের কথা উঠল। অনেকেই তাঁর অত্যাশ্চর্য বিভূতির কথা বলতে লাগলেন। এতটুকু বালক কি করে পরম তত্ত্বের সন্ধান পেলেন, তাঁরা বুঝতে পারেনা। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে যে, দুরূহ তত্ত্বকে তিনি কি সহজ ভাষায় প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেন! সব শুনে মহিম আচার্য

সসম্ভ্রমে বলেন, ‘উনি এক জন্মসিদ্ধ মহান, ওঁর কথাই আলাদা। নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন – নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করতে নারাজ। দেখবে, একদিন সারা দুনিয়ার ওপর দিয়ে এক বিরাট পরিবর্তনের ঝড় বইয়ে দেবেন।’ একটু পরেই দরজা খোলা হ’ল। ভক্তদের ভীড়ে ঢোকাই দায়। তার মধ্যেই এক ফাঁকে বালক এসে উপস্থিত। মহিম আচার্য তাঁকে প্রণাম জানালেন। দু’একটা কথা হ’ল। বালক একটু হেসে বেরিয়ে গেলেন।

ঠাকুরের খেলার সাথীরা অনেক সময় এমন কাজ করতো, যা ঠাকুর পছন্দ করতেন না। একদিন কয়েকটি ছেলে জঙ্গল থেকে বাঘডাশার বাচ্চা ধরে নিয়ে এসেছে। বাঘডাশা হিংস্র জন্তু, অনেকটা হায়েনার মত, বাচ্চা শিশু পেলে নিয়ে চলে যায়। তা ছাড়া গৃহপোষ্য জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চা, হাঁস, মুরগী তো নেয়ই। ঠাকুর সাথীদের নিষেধ করেন বাচ্চাগুলোকে ধরে রাখতে, বলেন, “ওদের ছেড়ে দিয়ে আয়।” ওরা কথা শোনে না। এদিকে বাঘডাশা বাচ্চা খুঁজতে খুঁজতে টের পেয়ে যায় কারা নিয়েছে এবং ওদের বাড়ী পর্যন্ত তাড়া করে। এরপর ওরা ভয়ের চোটে ঠাকুরের কাছে বাচ্চা রেখে দিয়ে যায়। ঠাকুর বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে-দাইয়ে জঙ্গলের ধারে নিয়ে ছেড়ে দিলেন। ‘যা যা’ বলে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিলেন। হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটা বাঘডাশা এগিয়ে এল আর বাচ্চাগুলোকে ধীরে ধীরে নিয়ে গেল। মাকে পেয়ে বাচ্চাগুলো দুধ খেতে শুরু করলো। বালক ঠাকুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন,

বাঘডাশা ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে ঠাকুরের দিকে, যেন বাচ্চাগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ঠাকুরকে তার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে - সে বুঝতে পেরেছিল যে ঠাকুর তার কোন ক্ষতির চিন্তা করছেন না। এরপর কলাবাগানে যখন যেতেন ঠাকুর, বাঘডাশাগুলো প্রায়ই তাঁর আশেপাশে ঘুরে বেড়াতো আবার মাঝে মাঝে এসে কাছে বসতো, যেন কত তাদের আত্মীয়তা ঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু অন্য ছেলেদের দেখলে তারা সঙ্গে সঙ্গে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করতো। হিংস্র জন্তু – সেও স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার ছোঁয়াচ বোঝে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করে।

একদিন আনন্দ মাষ্টার, পিতার সহকর্মী আশু সেন এবং আরও কয়েকজন নৌকা করে যাচ্ছিলেন। শ্রীমদ্দী ষ্টেশন ছেড়ে মেঘনা নদীর উপর দিয়ে নৌকা চলছে; বেশ কিছুদূর এগিয়েছে এমন সময় উল্টোদিক থেকে ভৈরবের ষ্টীমার আসতে দেখা গেল। একে মেঘনা নদীর প্রবল ঢেউ, তার ওপর আবার জাহাজ- ফলে নৌকাতে জল উঠতে লাগলো। এমন অবস্থার সৃষ্টি হ'ল যে জাহাজ যদি চলে যায়, তবে নৌকা ডুবে যাবে। সবাই ভয়ে চীৎকার করে উঠল। বালক এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, বয়োজ্যেষ্ঠদের আতঙ্ক দেখে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।' একটু জল হাতে নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন, অমনি জাহাজটি থেমে গেল, এবং প্রায় তিনদিন ঐ ঘাটে আটকে রইল। এইভাবে সেই যাত্রায় সবাইকে বাঁচালেন। বালকের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে

সবাই অভিভূত হয়ে পড়লেন - ওঁকে ভগবান ছাড়া আর কি বলা যায়!

মামাবাড়ী দোগাছিতে গেছেন। একটা উৎসব উপলক্ষে হরিসভা হচ্ছে – বহু লোক জমায়েত হয়েছে। বালক ঠাকুর কয়েকজন সাথীর সঙ্গে হরিসভা দেখতে গেছেন। হাজার বারোশো মানুষের সেই সভায় একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন, গীতা সম্পর্কে আলোচনা করছেন - আবার বলছেন জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা না হলে ভগবদ্-দর্শন হয় না, পাপী-তাপীদের ভগবান-দর্শন মেলে না। নানারকম ভাবের কথা, রাধা-কৃষ্ণের কথা বলছেন আর ভক্তেরা চোখ মুছছে। ছোট লাল শালুর কাপড় পরা, গায়ে সাদা চাদর, পায়ে একজোড়া খড়ম - বালক ঠাকুর মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ালেন। অনেকেই তাঁকে চেনে, কিছু বলবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করে। ঠাকুরের হাতে একটা খালি ঠোঙ্গা। সেটা দেখিয়ে বললেন, ‘এতক্ষণ যা চলছিল, এই ঠোঙ্গার কথা - চাল, ডাল, মশলা জাতীয় কথা।’ সবাই চিৎকার করে বললো, ‘গোঁসাই, কৃষ্ণের কথা বলুন।’

ঠাকুর বলতে শুরু করলেন, “কৃষ্ণও ছিলেন তোমাদেরই মত একজন। তোমরা সবাই যে পথ দিয়ে এসেছ, সেই পথ দিয়েই তিনিও এসেছিলেন। তোমরা যে বোধ নিয়ে এসেছ, তিনিও এসেছিলেন সেই বোধেই। তাঁর মাঝেও ছল, বল, কৌশল ছিল। তিনি যদি ভগবান হন, তবে জগতে সবাই আমরা ভগবান। আমি যে কৃষ্ণকে

জানি, যে কৃষ্ণের কথা বলছি - তিনি যুগে যুগে আসেন না। তিনি সকল সময়েই সর্বত্র বিরাজ করছেন - তিনি একযুগেই এসেছেন। আজও সেই যুগেই রয়ে গেছেন - যুগ একটাই তিনি কোন নামানামির মধ্যে নেই, পাপী-তাপী নেই তাঁর কাছে। পাপ-পুণ্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে তিনি বিরাজ করেন। জীবজগতের সবাইকেই নিয়ে যাচ্ছেন তিনি পথ দেখিয়ে।”

‘তবে রাধা গেলেন কোথায়?’ – ওরা জিজ্ঞাসা করে।

ঠাকুর একটু হেসে বলেন, “কৃষ্ণের বিরহে রাধা কাঁদতেন, কৃষ্ণ বুঝতেন না। আবার কৃষ্ণ যখন বিরহে কাতর হতেন রাধা অভিমানে দূরে সরে যেতেন – এই মান-অভিমানের কথা, এই সব কথাবার্তায় আছে আমাদের ঘরের বুঝ। আর আমি যে কৃষ্ণের কথা বলছি তাঁর হ’ল বিশ্ববুঝ - নিজের বোধ, নিজের সত্তা বিরাট শক্তির সাথে এক প্রেমের এক জ্ঞানে রেখেছেন, বিশ্বের মাঝে তাঁর বুঝটুকু রেখেছেন। সেখানে তাই অন্যকিছু নেই। আমি বলছি সেই জগৎকৃষ্ণের কথা, মন-কৃষ্ণের কথা। উপরে, নীচে, পায়ের তলায় - যেখানে তাকাই সেই কৃষ্ণকেই দেখি। সেই কৃষ্ণের সীমা নেই, মাপকাঠি দিয়ে তাঁকে মাপা যায় না, ভাষায় তাঁর বর্ণনা নেই। আমাদের বর্ণনাতেই তাঁর বর্ণনা। আমরাও নীলাকাশে - তিনিও নীলাকাশে, আমরা চিদাকাশে, তিনিও চিদাকাশে। আমরাও তাই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যদি ভগবান বা অবতার হন, আমরাও

সবাই ভগবান বা অবতার - সবাই আবার সাধারণ। এই সাধারণের মাঝেই রয়েছে অসাধারণ। এই যে উপলব্ধি, সেটাই হচ্ছে সত্যিকারের সাধনা। আকাশ মনোভাব নিয়ে মহাকাশে বিরাজ করছি সবাই, সবাই এগিয়ে চলছি দ্রুতগতিতে – জানাকেই জেনে যাচ্ছি পরিবর্তনের মাঝে পরিবর্তিত হতে হতে। বিরহ বা বৈরাগ্যের প্রশ্ন আসে না এখানে। মন, বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রেম যেখানে আছে, কৃষ্ণও সেখানেই আছেন। রাধার ধারাবাহিক যে ধারা, তা তাঁরই প্রতীক। রাধাকৃষ্ণের যে মিলন, তা-ই প্রকৃতি-পুরুষের মিলন, শিব-শক্তির মিলন। এটা আলাদা কিছু নয়। সেই মিলন অহর্নিশ চলছে জীবজগতের সবার মাঝে। শুধু জেনে যাও, বুঝে যাও। নতুন করে পাবার কিছু নেই। নিজেকেই তন্ন তন্ন করে খোঁজ, সেই খোঁজাতেই পাবে সবকিছু - তখন সাড়া দেবে তোমার সাড়াতে। জ্ঞান, বুদ্ধি ও মনের যে একত্র সমাবেশ - সেটাই হচ্ছে ত্রিনয়ন – সেখানেই ত্রিবেণী, প্রকৃতি-পুরুষ রাধা-কৃষ্ণ মিলছেন সেখানেই। কৃষ্ণ হচ্ছেন বিরাট, সবাই আমরা বিরাট। বিরাট হয়ে বিরাটেতে রয়েছি – আবার বিরাটকে জানার সাধনাতেই এগিয়ে যাচ্ছি প্রকৃতির সহজগতি নিয়ে। যে ধারাতে এসেছি, সেই ধারাতেই যেতে হবে - নিজের মাঝে নিজে তন্ময় হয়ে যেতে হবে। এই একটাই পথ - একটাই মত।”

গোঁসাইয়ের কথা শুনে সভায় একটা আনন্দের গুঞ্জরণ চলতে লাগলো। একজন এগিয়ে এসে তিলক-

ফোঁটার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানতে চাইল। ঠাকুর হেসে বললেন, “দিলেও হয়, না দিলেও হয়। এগুলো হচ্ছে পোশাকের মত – পরবার জন্য, তৈরী হবার, হুঁশিয়ার হবার জন্য। মনের ওপর পোশাকের একটা প্রভাব অবশ্য আছে। ভাল পোশাকে মনটা ভাল থাকে, ছেঁড়া কাপড় পরলে মনটা খারাপ লাগে। তবে পোশাক যে পোশাকই, এটা বুঝতে হবে আগে।”

এর পর অনেকেই নাম ও জপ সম্বন্ধে জানতে চাইল। ঠাকুর বললেন, “ভাল জিনিসের ফল তো ভাল হবেই। ভাল জিনিসের নাম শুনতে যদি ভাল লাগে, তবে এত বড় নাম যার, অর্থ যার এত বিরাট, তাঁর কথা শুনতে বা সেটা স্মরণ করতে খারাপ লাগবে কেন? এর জন্যই তো জগতে নাম-কীর্তনের ব্যবস্থা। বৃহৎ অর্থবোধে যে নাম, বৃহৎ অর্থবোধে যদি সেই নামকে চিন্তা করা যায়, তখনই আরম্ভ হয় স্পন্দন। তখন ভিতরের স্পন্দনে স্পন্দিত হয় অণু-পরমাণু। আমাদের সমাজে তাই নাম ও জপের প্রয়োজনীয়তা আছে। স্পন্দনেই গড়ে ওঠে সব, তাই নামের মাহাত্ম্য ও গুণ আছে, যদি অক্ষরে অক্ষরে নিয়ম-কানুন পালন করে চলি।”

আরও কিছু আলাপ আলোচনা হ’ল। তারপর ঠাকুর বললেন, “আরও আছে। নামের মাধ্যমে সমাজকে গড়বার চেষ্টা হয়েছে, কীর্তনে মনের দিক থেকে যেমন এগিয়ে যাওয়া যায়, চিন্তারও তেমনি প্রসারতা হয়। এই কীর্তনে আমাদের দৈহিক চর্চাটাও হয়। প্রভাতে উঠে এই

যে নাচানাচি - নগরকীর্তন, প্রভাত-কীর্তন - শারীরিক চর্চার দিক দিয়ে এরও প্রয়োজনীয়তা আছে। একজন বয়স্ক লোকের একা একা ব্যায়াম করতে অসুবিধা হয়। আর কীর্তনে হাত তুলে বুড়ো- বুড়ী সবাই মিলে এক সঙ্গে নাচছে, প্রভাতে উঠে মুক্তবায়ু, অক্সিজেন যাতে আছে, পেয়ে যাচ্ছে। নামের উপর নির্ভর করে এই যে চর্চা, মনটা তাতে যে দিয়ে রেখেছে – এরও প্রয়োজনীয়তা আছে।”

একটু থেমে গোঁসাই আবার বললেন, “ভগবান আছে কি নেই, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই এখন। নিজেকেই জেনে যাও, বুঝে যাও। নিজের দেহবীণাই বাজিয়ে যাও - সেই সুরকে সুরে আন, যে সুর হতে জগত সৃষ্টি হয়েছে। মনের যন্ত্রই তখন জানিয়ে দেবে ভগবান আছে কি নেই। এই যে আছে কি নেই, এটা জানবার ও বুঝবার জন্যই তো সাধনা। ‘আছে’ যারা বলে তারাও যেমন ভগবানকে পায়, ‘কি জানি, কি জানি’ করে যারা এগিয়ে যায়, তারাও ভগবানকে পায়। আমার কথা হচ্ছে, ‘আছে’ বলারও দরকার নেই, ‘নেই’ বলারও দরকার নেই। জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে, বাস্তব ইন্দ্রিয়-বোধ দিয়ে নিরপেক্ষ বিচার করে সব কিছু জেনে ও বুঝে যাও। যা যাবার যাবে, যা থাকবার থাকবে। জানতে জানতেই জেনে যাবে, তখন আর কোন গোলমাল থাকবে না, উক্তিও থাকবে না। তন্ময়তার মাঝে তন্ময় হয়ে যাবে - হারানোর মাঝে হারিয়ে যাবে। তোমার জ্ঞানের যন্ত্রই বাজিয়ে যাও

তুমি। মানা না-মানার প্রশ্ন নেই। সবকিছু সমস্যার সমাধান করবে তোমার সেই জ্ঞানরূপ যন্ত্র।”

বালক ঠাকুরের কথায় অনেকের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল – প্রকৃত পথের সন্ধান পেল, অনেকেই তাই ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতে এগিয়ে এলো।

পাঠশালার ক্লাস ওয়ানের ছাত্রের মুখ দিয়ে এমন সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় এইরকম কঠিন অথচ মৌলিক তত্ত্বের স্ফুরণ অনেককেই সেদিন অবাক করেছিল। কিন্তু অনেকেই আবার বালক ঠাকুরকে চিনতো এবং তাঁর ঐশী শক্তির কথা জানতো।

ভক্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বালক কখনও কাছারীর একটি ঘরে বসেন, কখনও অন্যত্র বসেন। বেশীরভাগই নদীর ধারে, খেলার মাঠে সবাইকে নিয়ে বসেন। সবারই মনে হ’ল একটা আলাদা ঘর হলে ভাল হয়। বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আনা হ’ল। কেউ দু-খানা পুরোনো টিন যোগাড় করলো, কেউ একটা হোগলার বেড়া। এইভাবে সকলে মিলেমিশে ছোট একটি চৌচালা ঘর তুলে ফেললো। বালক ঠাকুর নিজেও বেড়া বাঁধতে, পেরেক মারতে সাহায্য করলেন। সামনে একটি বাগান করা হ’ল, সেখানে ফুল গাছ লাগানো হ’ল। ভোরে উঠে বালক ঠাকুর নিজেই ফুলগাছগুলির তত্ত্বাবধান করেন, জল দেন, কিন্তু নিজে একটিও ফুল বা পাতা ছেঁড়েন না। এই চৌচালা ঘরে ভক্তবৃন্দ এসে ভীড় করে বসে, বালকের উপদেশ-নির্দেশ শোনে।

একদিকে বালক তত্ত্ব-জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে মানুষকে দিয়ে যাচ্ছেন, আর একদিকে অভিনব বিভূতির প্রকাশে সবাইকে করছেন হতবাক্। আবার বাস্তবের দিকটাও ঠিক রেখেছেন – সাথীদের সঙ্গে বিনা আড়ম্বরে ‘গাউছা মাউছা’ খেলছেন। একদিন গাছ থেকে যখন লাফ দিয়েছেন, একটা ষাঁড় সেদিকে ছুটে আসছে দেখে নিমেষে নিজেকে তিনি মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতমুখী গতি দিয়ে আবার গাছে উঠে পড়লেন। সাথীরা আশ্চর্য হয়ে চেঁচাতে লাগলো, ‘বীরু ঠাকুর উইরা যাইতাছে।’

বালক একদিন তাঁর জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে বিখ্যাত গোয়ালীমান্দার হাটে গেছেন নৌকা করে। তাঁকে বসিয়ে রেখে জ্যেঠামশায় গেছেন হাটে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে নৌকা ভেসে ধানক্ষেতে চলে যায়, আরও কয়েকটি নৌকা গেছে ভেসে। সবাই ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে, কিন্তু হাওয়ার বিপরীত দিকে নৌকা কিছুতেই নিতে পারছে না। বালক ‘বৈঠা’ বাইতে জানেন না, বৈঠাটা কোনোমতে ধরে রেখেছেন, কিন্তু বাইতে পারছেন না। তবু তাঁর নৌকা তীর বেগে ছুটলো ধানক্ষেত দিয়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে খালে এসে পড়লো। জ্যেঠামশায় পাড় থেকে বলছেন, ‘এদিকে আয়’। নৌকাও সেইভাবে ঘুরে জায়গামত পৌঁছে গেল। জ্যেঠামশায় কাণ্ড-কারখানা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। অনেক দর্শক জমায়েত হয়ে গেছে এই আশ্চর্য ঘটনা দেখতে।

নিভারাণীর মামীশাশুড়ী যখন উপহাস করে বললেন, ‘এ কি করলি তোরা? শেষ পর্যন্ত একটা শিশুর কাছে তোরা দীক্ষা নিলি! অনেক কথা তো বলিস, তোর গুরু এখানে গঙ্গা আনতে পারলে বুঝবো তার কিছু আছে।’ মামীশাশুড়ীর কথা শুনে নিভারাণীর জেদ চাপলো – ওঁকে দেখাতেই হবে। কিছুদিন পরে বালক ঠাকুর আসবেন ওদের বাড়ীতে। নির্দিষ্ট দিনে মামীশাশুড়ী এবং আরও কয়েকজনকে নিভারাণী নিমন্ত্রণ করলেন। বালক ঠাকুর এসেছেন - সবে বছর সাতেক বয়স। চৌকির ওপর আসনে বসে আছেন। নিভারাণীর মামাশ্বশুর ধীরেন্দ্র ভৌমিক, মামীশাশুড়ী, আরও কয়েকজন সামনেই মাটিতে কার্পেটের উপর বসেছেন। নিভারাণী মনে-প্রাণে ঠাকুরকে ডাকছেন, গঙ্গার জলে সবাইকে যেন ভিজিয়ে দেন। সকলেই নিঃশব্দে বসে আছেন। হঠাৎ কলকল করে জলের আওয়াজ হ’ল – কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জলের স্রোত বয়ে গেল ঘরের ভিতর দিয়ে – গঙ্গাজলের অপূর্ব গন্ধে ঘর ভরে গেল। মাটিতে কার্পেটের উপর যারা বসেছিলেন, তাঁদের কাপড় - জামা সব ভিজে গেল। সবাই বিস্ময়ে হতবাক! শরণাগত হয়ে বালক ঠাকুরকে প্রণাম করলেন তাঁরা।

আধ্যাত্মিক শক্তির চরম শিখরে থেকেও কিন্তু তিনি বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন নি। বাইরের মানুষের যেমন ফুটফরমাশ খাটেন, বাড়ীতেও মায়ের অনেক কাজ করে দেন। তাঁর কাজের মধ্যে কোন বিরক্তি

নেই। সময়েই হোক, অসময়েই হোক, যত কষ্টসাধ্যই হোক না কেন, তিনি বিনা দ্বিধায় সব কাজ করে দেন। আবার সমবয়সীদের সাথে খেলার মাঠেও যান। যে কোন খেলাই হোক না কেন, সবটার মধ্যেই তিনি আছেন।

।। নয় ।।

এইভাবে বাস্তবের ধারাতে ধীরে ধীরে তাঁর আট বছর পূর্ণ হ'ল। বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে মানুষ আসতে লাগলো, কেউ লোকমুখে শুনে, কেউ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে। সবাইকেই তিনি ভরপুর করে দেন।

ত্রিপুরার ময়নামতী পাহাড়ের বিখ্যাত সাধক মনাই ফকিরকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। ১৭৮ বছর বয়স্ক এই মুসলমান সাধকের কাছে অনেক হিন্দু-মুসলমান কঠিন রোগ সারাতে বা অভীষ্ট লাভ করতে যায়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই গভীর বিশ্বাস যে, মনাই ফকির যদি গ্রামের উপর দিয়ে হেঁটে যান, তবে সেই গ্রামে আর কলেরা-বসন্ত হবে না। প্রায় ছয় ফুট লম্বা কালো মানুষটিকে তাই গ্রামের অধিবাসীরা মনে-প্রাণে চায়। এই মনাই ফকির একদিন নিজের জীবন খতিয়ে দেখতে দেখতে বিষাদে ভেঙে পড়লেন। যৌবনে ঘর ছেড়ে পথের সন্ধানে বেরিয়েছেন, কিন্তু আজও কোন কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। সমস্ত জীবনটাই তাঁর বৃথা গেল। অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরছে ফকিরের গাল বেয়ে। এরমধ্যে কখন

যে তন্দ্রায় চোখ জুড়ে এসেছে, ফকির নিজেও জানেন না। তিনি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন, “কাঁদছিস কেন? আমি তো তোর জন্যই বালক বেশে অপেক্ষা করছি উজানচর-কৃষ্ণনগরে।” তন্দ্রা ছুটে যায়, -কথাগুলো ফকিরের কানে বাজতে থাকে - তর সয় না - ফকির তখনি রওনা হলেন এবং অনেক খুঁজে খুঁজে কৃষ্ণনগরে বালক ঠাকুরের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। ফকিরকে দেখেই বালক বলে উঠলেন, “এসেছ, যাও স্নান করে এস। তোমার জন্যই তো বসে আছি। তুমি না এলে তো আমি আরম্ভ করতে পারছি না।” বিস্মিত ফকির বালকের নির্দেশমত স্নান করে এলেন। বালক ঠাকুর দীক্ষা [‘শৈশব কাহিনী’তে বলা হয়েছে যে, শ্রীশ্রীঠাকুর আট বছর তিনমাস বয়স থেকে দীক্ষাদান শুরু করেন এবং মনাই ফকির তাঁর প্রথম শিষ্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত যে সব ঘটনা আমাদের গোচরে এসেছে, তাতে প্রমাণিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুর ছয়-সাত বছর বয়স থেকে দীক্ষা দিতে শুরু করেন] শেষ করে ফকিরের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, “তোমার ঠাকুর তোমার কান্না শুনতে পেয়েছিলেন, তাই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে নিজেই তিনি ডেকে এনে দিয়ে দিলেন তোমার কাম্য জন্মজন্মান্তরের সাধনার ধন!” ফকির ঠাকুরের পা ধরে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন - সে কান্নায় ব্যথার সুর নেই, আছে এক অজানা আনন্দ আর পরিতৃপ্তির রেশ। সেই থেকে ফকির সেখানেই রয়ে গেলেন। সারাদিন কাছেই এক জঙ্গলে কাটান আর গভীর রাত্রে এসে বালকের কাছে বসেন।

মনাই ফকির নিশুতি রাতের নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মাঝে দোতারা বাজিয়ে বালক ঠাকুরকে তাঁর মনের অর্ঘ্য ঢেলে দেন। মনাই ফকিরের গানের পদ বিশেষ থাকে না, থাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসা এক অপূর্ব সুরের মূর্ছনা। আল্লাতালার গানে তিনি তন্ময় হয়ে যান। গান শেষ করে পরে বালককে বলেন, "তুই এবার গা"। রোজ বলতে বলতে বালক ঠাকুর একদিন নিজেই গাইলেন। সে গান শুনে মনাই ফকির মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে উঠলেন, "বাচ্চা, এমন গান কখনও শুনিনি রে। তুই কি শোনালি আজ!" রাতের পর রাত মনাই ফকির বালকের সঙ্গে সঙ্গত করে চলেছেন। ঠাকুর গভীর তত্ত্বের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন। মাঝে মাঝে মনাই ফকির বলেন, 'বাচ্চা, আমার আজ্ঞাচক্রটা ফুটিয়ে দে তো।' ঠাকুর রগড় করে বলেন, "ওটা আবার কি?" ফকির বলেন, 'আমার কপালে এইখানটায় হাত দে, তবেই ফুটে যাবে। হ্যাঁ রে বাচ্চা, তুই হাত দিলেই ফুটবে। তুই একমাত্র পারবি।'

মনাই ফকির তাঁর সাধের বাচ্চা গোঁসাইকে যে ভাবে চিনেছিলেন, যে ভাবে পেয়েছিলেন, এমনি করে খুব কম লোকেই তাঁকে পেয়েছে। তাই ফকির কখনও রাত দুটোর আগে বালকের কাছে যেতেন না। যখন চারিদিক নিস্তব্ধ, তখনই যেতেন।

এই সময়ে সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিনের দাদা ওস্তাদ আফতাবুদ্দিন আর এক ল্যাংটা ফকিরও

প্রায়ই আসেন। আফতাবুদ্দিন ছিলেন বিরাট সুরশিল্পী। শোনা যায় তিনি যখন তন্ময় হয়ে যন্ত্র বাজাতেন, কখনও কখনও সাপ এসে যন্ত্রটা পেঁচিয়ে থাকতো সুতরাং তাঁকে যন্ত্র বাজিয়ে যেতে হ'ত। দিনের পর দিন ওঁরা বালক ঠাকুরের কাছে সঙ্গত করতেন, তাঁর উপদেশ-নির্দেশ মন দিয়ে শুনতেন।

ফকির গাঁজা খেতেন। নতুন কলকেতে গাঁজা ভরে বালক ঠাকুরকে বলেন, 'দে, প্রসাদ করে দে।' ঠাকুর বলেন, "আমি তো ও সব খাই না। ওখানে মাটির 'পর রাখ। আমি যা করবার করে দিচ্ছি।" পাঁচ ছয় হাত দূরে একটা জায়গা পরিষ্কার করে শুদ্ধভাবে ফকির কলকেটি রাখলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখছেন কলকেটি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, যেন কেউ টানছেন- মুহূর্তের মধ্যে কলকেটি ফেটে গেল। ফকির তো দেখে অবাক – এ কী করে হয়! বালক তখন বললেন, "দূরত্বে কিছু এসে যায় না। টানের মত টানতে পারলে কলকে তো ফাটবেই।"

গ্রামে ছেলেরা গ্রীষ্মের ছুটি বা পূজোর ছুটির সময় কখনো কখনো থিয়েটার করতো। সেবার তারা একটা সামাজিক নাটক অভিনয় করছে। প্রচার হয়ে গেল যে বালক অভিনয়ে রাখালের পার্ট নিচ্ছেন - বহুলোক বালকের অভিনয় দেখতে এসেছে। খড় দিয়ে তৈরী একটি গাভীকে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করতে হবে দেখে বালকের মেজাজ খারাপ হয়েছে। রাখাল সেজে একটা ছোট লাঠি হাতে নিয়ে বারবার তিনি বলছেন - "মরাটাকে কেন

এনেছিস?” প্রম্পটারকে বললেন, “তোমারটা তুমি বল, আমারটা আমি বলছি।” পরে বললেন, “একটু জল দাও তো।” একটু জল নিয়ে খড়ের গরুর গায়ে ছিটিয়ে দিলেন – সাথে সাথে গরু লেজ নাড়তে শুরু করলো। বালক তখন প্রম্পটারকে বললেন, “লেজের কোন পার্ট থাকলে বলো।” বালক আর একটু জল কানে ছিটালেন, তখন আবার কান নাড়তে শুরু করলো। কৌতূহলী দর্শকরা চিৎকার করে ‘বাকিটা, বাকিটা?’ বালক উত্তর দেন - “ওইটুকুতেই কাজ হবে।” তার পর লেজ নাড়া দিতেই সেই গরু ছুটে মঞ্চের থেকে বেরিয়ে গেল। বালক ঠাকুর অভিনয়ের নামে যা করলেন, দর্শকদের মনে গেঁথে রইল। যারা সেদিন দেখেছিলো, আজও তারা মনে করে ভক্তি-অশ্রু ফেলে।

সাধারণ সরল গ্রামবাসী, এমন কি দূর-দূরান্ত থেকেও তারা বালক ঠাকুরের কাছে আসছে। বাড়ী থেকে পাঠশালায় যেতে তাঁর বহু সময় লেগে যায় ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা মিটাতে মিটাতে। শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ অনেক শুনছে, দেখছে, তবুও দু’চার জন ছাড়া বালক ঠাকুরের কাছে যায় না - শিক্ষার অহমিকা তাদের দূরে সরিয়ে রাখে। বালকের কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। যেই আসুক না কেন, তিনি প্রাণ ঢেলে দেন। মান অপমানের বালাই নেই তাঁর। তাই কাছারী বাড়ীর পিওন, কর্মচারীরা যে যখন ডাকে, পাকাচুল বেছে দেন, মাথা টিপে দেন। তারাও বালকের হাতের সেবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা

করে। এই ভাবে তাঁর দু'চার পয়সা রোজগার হয় এবং নিজের টুকিটাকি খরচা চলে যায়। কারো কাছ থেকে তিনি দান গ্রহণ করেন না। এমনকি আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী গেলেও তাদের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যান। এই ভাবে শিশুবয়স থেকে স্বাবলম্বী জীবন যাপন করতে তিনি অভ্যস্ত।

কাছারীর এক কর্মচারী এবং বালকের পিতার সহকর্মী বরদা চক্রবর্তী একদিন ভোরে নদীর ঘাটে প্রাতঃকৃত্য সারতে গেছেন। এমন সময়ে দেখেন, কে যেন নদীর জলের ওপর দিয়ে সপাৎ সপাৎ করে হেঁটে আসছে। দৈত্য দানব মনে করে চোখ বুজে বরদাবাবু 'রাম' নাম করতে থাকেন। তখনিই শুনতে পান কে যেন বলছে, "বরদাবাবু, ভয় পাবেন না। আমি বীরু, সুরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে।" বরদাবাবু তাকিয়ে দেখেন, সত্যিই সুরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে বীরু জলের উপর দিয়ে সাবলীল গতিতে হেঁটে আসছে। এই অসম্ভব ব্যাপার দেখে তিনি ভাবলেন নিশ্চয়ই বীরু অপঘাতে মারা গিয়ে ব্রহ্মদৈত্য হয়েছে। তাই সে মনের কথাও বুঝতে পারছে। বরদাবাবু ভয়ে তটস্থ হয়ে আরও জোরে 'রাম' নাম করতে লাগলেন। বালক আশ্বাস দিলেন, "আমি মরে ব্রহ্মদৈত্য হইনি। আমি সেই রক্তমাংসের বীরু"। এবার বরদাবাবু ভয়ে কাঁপতে লাগলেন – ও তো মনের সব কথা বুঝতে পারছে, নিশ্চয়ই ও ব্রহ্মদৈত্য। তিনি এবার 'রাম নারায়ণ', 'রাম নারায়ণ' বলতে লাগলেন। কিছুতেই তিনি বিশ্বাস

করতে পারছেন না দেখে বালক খপ করে তাঁর হাত ধরলেন। সেই স্পর্শের সাথে সাথে বরদাবাবুর ভয়ভীতি কোথায় যেন চলে গেল। এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন তাঁর ভরে উঠল, সারা দেহের ভিতর দিয়ে এক অনাস্বাদিত অপূর্ব পুলকের তরঙ্গ খেলে যেতে লাগলো। সমস্ত চিন্তা ভাবনা দূর হয়ে গেল, মনে হতে লাগলো 'এই বিশ্বে সব কিছুই যেন আমি, - আকাশে আমি, বাতাসে আমি, জলে আমি, স্থলে আমি, বালুকণাতে আমি - আমি সর্বত্র বিরাজমান।' বালক তাঁর হাত ছেড়ে দিতেই তাঁর বাস্তব জ্ঞান ফিরে এল। বালকের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করে তিনি ধন্য হলেন।

এর কিছুদিন পরেই খাঁটি মুসলমান বলে খ্যাত নাসিরুদ্দীন হাজী সাহেব প্রায় একই রকম অনুভূতির সাড়া পেলেন। তবে তাঁর ঘটনা আরও চমকপ্রদ। খুব ভোরে তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে নে'ন। অন্যদিনের মত সেদিনও তিনি অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে নদীর দিকে রওনা হয়েছেন। হঠাৎ দেখেন কাছারী বাড়ীর দিক থেকে একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলা ছুটে আসছে। ভয়ে তিনি মাটিতে শুয়ে পড়লেন। তবু পিঠে উত্তাপ অনুভব করলেন। কিছুক্ষণ পরে নিরাপদ ভেবে নদীর দিকে রওনা হলেন। নদীর পাড়ে পৌঁছে দেখেন আগুনের গোলাটি ধীরে ধীরে জলের উপর নামছে। আগুনের গোলা জলস্পর্শ করার সাথে সাথে দেখেন আগুনের গোলার জায়গায় সুরেন্দ্রবাবুর ছেলে বীরু। তিনি জলের উপর দিয়ে

সহজভাবে হেঁটে আসছেন এবং জেলের নৌকাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। হাজীসাহেব একগলা জলে দাঁড়িয়ে বালক গোঁসাইয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখলেন বালক জেলেদের সব জীয়ন্ত মাছ ও কাছিম ছেড়ে দিতে বলছেন। ওদের কিন্তু লোকসান করাচ্ছেন না, ওগুলোর দাম নিজেই দিয়ে দিচ্ছেন। জেলেরা ওঁকে খুব ভালবাসে। গতকাল গোঁসাই আসেন নি বলে ওরা অনুযোগ দিচ্ছিল। গোঁসাইকে পেয়ে ওরা খুব খুশী। কিছুক্ষণ জেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি চলে গেলেন।

সারাদিন হাজী সাহেবের মনে আলোড়ন হতে লাগলো – রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে কি করে বালক জলের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে বেড়াতে পারেন? আগুনের গোলার উত্তাপ তখনও তিনি যেন অনুভব করতে পারছেন। রাত্রে শুয়েছেন কিন্তু ঘুম আসছে না। শেষে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় নেমে যন্ত্রচালিতের মত বালক গোঁসাইয়ের ছোট চৌচালা ঘরটির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তখন প্রায় রাত আড়াইটা-তিনটা হবে। গোঁসাইয়ের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। হাজী সাহেব কখন যে 'গোঁসাই, গোঁসাই' বলতে শুরু করেছেন, তিনি নিজেও জানেন না। ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে ধূপ-গুগগুলের গন্ধ পেলেন। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে যা দেখলেন, তাতে তো তাঁর চক্ষুস্থির! গোঁসাই যেন এক অজানা ভাষায় কি সব বোঝাচ্ছেন – তাঁর শ্রোতা হ'ল তিনটি শেয়াল আর একটি বিরাট কেউটে সাপ, ফণা

বিস্তার করে বিড়া পাকিয়ে বসে আছে। মনে হচ্ছে তাদের গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে, মুগ্ধ হয়ে শুনছে তারা গোঁসাইয়ের কথা। কতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে তিনি নিজেই জানেন না, হঠাৎ গোঁসাইয়ের কথায় তাঁর হুঁশ ফিরে এল, "এ কি হাজী সাহেব, এত ভোরে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছেন কেন - কি হয়েছে আপনার?" স্বপ্নোত্থিতের মত হাজী সাহেব এগিয়ে গেলেন, তাঁর দ্বন্দ্ব, সন্দেহ সব দূর হয়ে গেল, সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বালকের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে তিনি পারের কড়ি চাইলেন।

বালক ঠাকুর সেবার আশু সেনের সঙ্গে ঢাকায় গেলেন। আশু সেনের বাড়ী বেড়া-গ্রামে। এরকম মাঝে মাঝে তিনি আশু সেনের সঙ্গে যেতেন। গরমের দিন। আশু সেনের বাড়ীতে কয়েকটি ভাল ভাল জাতের আম গাছ আছে। বালক আম খেতে ভালবাসেন এবং ওঁরাও ঠাকুরকে খাওয়াতে ভালবাসেন। ... আশু সেনের জ্যেঠিমা, সবাই তাঁকে ক্ষ্যান্ত জ্যেঠিমা বলে ডাকে, বেশ কিছুদিন অসুস্থ – শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। অবস্থা ক্রমশ: খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং দুই একদিনের মধ্যেই তাঁর মহাশ্বাস উঠলো। ক্ষ্যান্ত জ্যেঠিমাকে ঘর থেকে বে'র করে রাখা হয়েছে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে ঘরের মধ্যে যেন মৃত্যুপথযাত্রী শেষ নিঃশ্বাস না ফেলে, তার জন্য যখন মহাশ্বাস উঠতে দেখা যায় রোগীকে ঘর থেকে বাইরে বে'র করা হয়, যাতে মুক্ত আকাশের তলে শেষনিঃশ্বাস

ত্যাগ করতে পারে। বালক ঠাকুর তখন গাছতলায় বসবেন বলে উপযুক্ত জায়গা বেছে নেওয়ার জন্য এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিলেন। হঠাৎ কান্নার রোল শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে, কাঁদছে কেন?" ক্ষ্যান্ত জ্যেঠিমাকে বে'র করা হয়েছে শুনে তিনি দেখতে গেলেন। কিছুক্ষণ মুমূর্ষু রোগিণীর দিকে তাকিয়ে তিনি একটু জল আনতে বললেন। জলে আঙ্গুল স্পর্শ করে রোগিণীকে খাইয়ে দিতে বললেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো যে, রোগিণীর জ্ঞান কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এলো। তাঁকে আবার ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বালক ঠাকুরের ঐশীশক্তির কথা এর আগে বেড়া গ্রামে কয়েকজন লোক মাত্র জানতো। সেদিন এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে দলে দলে লোক আসতে লাগলো।

এর আর কিছু দিন পরেই আশু সেনের দূর সম্পর্কের এক জ্যেঠিমারও অন্তিম অবস্থা। উদরী রোগে ভুগে ভুগে একেবারে কঙ্কাল-সার হয়ে গেছেন, কিন্তু পেটটি অস্বাভাবিক বড়- পেটে নাকি জল জমে গেছে। ডাক্তারেরা শেষ চেষ্টা করে জবাব দিয়েছে - আর কিছুক্ষণ পরেই প্রাণ-বায়ু নির্গত হয়ে যাবে, সুতরাং তাঁকে বাড়ীর উঠানে বে'র করা হয়েছে। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। কারণ আত্মীয়স্বজন শেষ পর্যন্ত আশা রাখে যদি দৈববলে কিছু হয়। এদিকে নাম কীর্তন শুরু হয়ে গেছে - প্রচুর লোক জমা হয়েছে, শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। কে একজন বলে উঠলো, 'একবার বালক ঠাকুরকে

দেখালে হয় না? বালক ঠাকুর তো এখানেই আছেন।' ঠাকুর গেলেন ওই বাড়ীতে। রোগিণীকে দেখে বললেন, "কি করতে হবে আমাকে"? সবাই বললো, 'ঠাকুর, একে এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিন।' ঠাকুর বললেন, "কেন! ডাক্তার কিছু করতে পারলো না?" 'না গোঁসাই, ডাক্তারী শাস্ত্রে আর কিছু করবার নেই। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন', বৃদ্ধার এক আত্মীয় উত্তর দিল। আশু সেন বললেন, 'দেখ না, যদি কিছু করতে পার।' ঠাকুর উত্তর দিলেন, "ঠিক আছে জ্যেঠামশায়, আমি চেষ্টা করে দেখছি। আমাকে শুধু একটা কিছু ধারালো জিনিস দিন।" হাতের কাছে একটা বস্তা সেলাই করা বড় সূঁচ ছিল, সেটাই ঠাকুরকে দেওয়া হ'ল। সময় নষ্ট না করে ঠাকুর সূঁচটি বৃদ্ধার পেটে ঢুকিয়ে দিলেন। পেট ফুটো করার সঙ্গে সঙ্গে পেট থেকে জল বে'র হতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুমূর্ষু রোগিণী সুস্থ বোধ করতে লাগলেন এবং উঠে বসলেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা। খবর শুনে ডাক্তারও ছুটে এসেছেন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে। আশ্চর্য হয়ে তিনি শুধু দেখলেনই, কিন্তু বুঝতে পারলেন না কি করে ওই ছোট ছিদ্র পথে, কোথা থেকে এই জল বে'র হচ্ছে অথচ কাজ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সে যাত্রা বৃদ্ধা সুস্থ হয়ে উঠলেন। বেড়া এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে বহুলোক এই মহানকে দেখতে আসতে লাগলো । বালক ঠাকুরের বয়স তখন মাত্র আট বছর। এর মধ্যেই চারিদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে – ধ্যানে, জ্ঞানে,

অলৌকিক শক্তিতে তিনি অতুলনীয়। এত বড় মহানের কাছে দীক্ষালাভ করা তো ভাগ্যের বিষয় - অথচ তাঁর কোন দাবী-দাওয়া নেই, সময় অসময়ের বিচার নেই, শুচিতা-অশুচিতার বাধানিষেধ নেই, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য নেই। সাধারণভাবে সাধারণ গৃহস্থ ছেলের মত সবার সুখে দুঃখে মিশে থাকেন। সাধারণ দৃষ্টিতে বোঝা যায় না বললেই হয়; আবার বোঝা যায়ও। এমন সুন্দর সোনালী গায়ের রং তো দেখা যায় না, সূর্যের আলো বা ডে-লাইটের আলোয় তো কথাই নেই! সমস্ত শরীর থেকে এক অদ্ভুত চোখ-ঝলসানো জৌলুস বে'র হতে থাকে। ভীড়ের মধ্যেও সেই অপূর্ব জ্যোতি দেখে তাঁকে চিনতে কষ্ট হয় না, বোঝা যায় যে সাধারণ ভাবে থাকলেও তিনি অসাধারণ – তাই কৌতূহলের বশে তাঁকে শুধু দেখতে এসেই তারা অভিভূত হয়ে পড়ে এবং দীক্ষাগ্রহণ করে বিদায় নেয়।

।। দশ ।।

পাঠশালার পড়া এখনও শেষ হয় নি। আনন্দ মাষ্টারের পাঠশালায় বালক ঠাকুর ও তাঁর সহপাঠীরা এখন উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্র। এই পরীক্ষায় পাশ করলেই হাইস্কুলের ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হতে পারবেন। অঙ্কে বালক এমন পারদর্শিতা অর্জন করেছেন যে মুখে মুখেই কঠিন অঙ্ক কষে দিতে পারেন – ফল তাঁর কখনও ভুল হয় না।

মাষ্টারমশাইরা বলেন - এ ছেলে ভবিষ্যতে অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জন করবে। আনন্দ মাষ্টার নিজে বালক ঠাকুরের বাস্তব রূপের বাইরেও আর একটা রূপ দেখেছেন, যেটা তিনি অন্তরের অন্তরতম স্থলে রেখে দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন বালককে সমাধিস্থ অবস্থায় দিনের পর দিন আত্মস্থ হয়ে বসে থাকতে, আবার বাস্তবের পটভূমিতে ঠাকুরকে দেখেছেন অতীব বাস্তববাদীরূপে, যা দেখে সাধারণ মানুষ ভুল করে বসবে, দ্বন্দ্ব আসবে - কোনটা তাঁর আসল রূপ! অজস্র বিভূতির খেলা, পরম তত্ত্বের অফুরন্ত প্রবাহ যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তেমনি তাঁকে অবাক করেছে যখন তিনি নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রেখে জড়বুদ্ধি বলে মানুষের অবজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাদের আরও বেশী তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সুযোগ করে দেন! মাঝে মাঝে আনন্দ মাষ্টারের মনে প্রশ্ন ওঠে, 'বালক কেন এমনটি করেন?' বালক ছোট্ট কয়েকটা কথায় তাঁর প্রশ্নের সমাধান করে দেন, – "ওরা যদি আমাকে হাবাগবা ভেবে আনন্দ পায়, আমি কেন সেই আনন্দ থেকে ওদের বঞ্চিত করবো? ওদের ধারণা নিয়ে ওরা থাক। ওদের প্রশংসাতেও আমার লাভ নেই, ওদের নিন্দাতেও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। সুতরাং এইসব নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? ওরা নিজেরাই একদিন ওদের ভুল বুঝতে পারবে।" বালকের উত্তর শুনে আনন্দ মাষ্টার ভাবেন, - 'ঐরকম মহৎ যাঁর চিন্তাধারা, তিনি কোন স্তরের? নিন্দাস্তুতি যাঁকে

স্পর্শ করে না, দেবতা আখ্যা দিলেই কি তাঁর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়?’

একবার কয়েকজন ভক্ত এবং পাঠশালার শিক্ষক আনন্দ মাষ্টারের সাথে একই নৌকায় বালক ঠাকুর গন্তব্যস্থলে যাচ্ছেন। ঠাকুরকে এরকম ভাবে পেয়ে ভক্তেরা নানা প্রশ্ন করছে – ‘মন কি করে বসানো যায়’, ‘বৃত্তিগুলো কি করে ছাড়া যায়’, ‘কাম ত্যাগ কি ভাবে করা যায়’ প্রভৃতি। ঠাকুরও উত্তর দিয়ে চলেছেন।

প্রঃ – গোঁসাই, মনটা কি করে বসানো যায়?

উঃ – বসা মনকে আবার কি করে বসাবে।

প্রঃ – আমাদের বৃত্তিগুলো কি করে ছাড়া যায়?

উঃ – যা কোন দিন ছাড়া যায় না তার কথা বলবে না।

প্রঃ – শাস্ত্র কি তবে মিথ্যা?

উঃ – বিশ্বের শাস্ত্র মিথ্যা নয়। সংস্কারের চোখে ওটা বিকৃত রূপ নিয়েছে।

প্রঃ – কামকে ধর্মের অন্তরায় বলে কেন? মহানরা ‘কাম ত্যাগ কর’ বলেন কেন?

উঃ – কাম হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, ধর্মের অন্তরায় নয়; বরং কাম সহযোগিতা করে। কাম এবং ধর্ম একটা নাম। যেখানে কাম নেই, সেখানে ধর্ম নেই।

চিৎকারটা আর ‘বোঝা ঠেলাটা’ একই কথা নয়। তবে চিৎকারটা বোঝা ঠেলবার সহায়তা করে। ‘হেঁই

ও' টা বোঝা নয়, এটা একটা তাল। ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা একটা তাল। 'ত্যাগ কর', 'এটা কর', 'ওটা কর' – এগুলো 'হেঁইও মারি'র কথা। অন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। যাঁরা চিৎকার করে গেছেন, চিৎকারের মধ্যেই যে রয়ে গেছেন। সকলে চিৎকার করছে আর অনুশোচনা করছে 'হায় হায় - হ'ল তো না', 'সব তো গেল', 'সব তো রইল', 'এগোচ্ছি তো না' - এই বলে। এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রতিক্ষণে বার বার স্মরণ করা, এটাই সাধনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর ঐ কথাগুলো প্রেরণা যোগাচ্ছে।

কাম ত্যাগ না করলে যদি ভগবানকে পাওয়া না যায়, তবে যাঁদের বাচ্চা হয়েছে তাঁদের বেলা কি হবে? তাঁরাও তো ভগবান নাম নিয়েছেন, তাঁদেরও তো কামের সম্পর্ক কিছুটা ছিল। যাঁদের বাচ্চা হয়নি তাঁরাও যে কামের সংস্পর্শে যাননি তা বলা যায় না। বুদ্ধের বাচ্চা না হলে হয়তো রেহাই পেতেন, ধরা পড়তেন না। শ্রীকৃষ্ণ, রাম – তাঁরাও তো গেছেন। তাঁরা যদি ভগবান হতে পারেন, তবে ঐ জাতীয় উপদেশগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া ভিত্তিহীন।.......

........কাম দিয়ে যদি মহাপুরুষ বিচার করতে হয়, মহাপুরুষ কোথায় পাবে? তাহলে কেউই ভগবান, মহান বা অবতার ন'ন। ওটা বাদ দিয়েই বিচার করতে হবে। দুঃখের বিষয়, যারা কামকে বিচারের বস্তু মনে করে, তাদের কার্যই সন্দেহজনক। আমার বাহ্যিক কার্যকলাপের উপর ভগবানত্ব রাখতে চাই না। যে স্বীকার

করবে - তারই ছুটে যাবে। আমার তত্ত্বে স্বীকার করছি, আমি কোথাও গেলে আমার দোষ হবে না। আমার কোথাও যাওয়া, না-যাওয়ার ওপর দাম দিতে পারবে না। সে জায়গায়ই তত্ত্ব। একটা কথা হ'ল - আমি পাঁঠার মাংস খাই, মাছ খাই, কিন্তু গরুর মাংস খাই না, ভাল লাগে না। ভাল লাগা না-লাগা একই কথা – মাংস জাতীয় জিনিস তো। হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীশ্চিয়ান – এই নিয়ে মারামারি করে লাভ নেই। তুমি এটা খাও, আর একজনে ওটা খায়। আমার কাছে তত্ত্ব বুঝতে হলে নগ্ন তত্ত্ব বুঝবে। উপরের চামড়া বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে কথা।.....

প্রঃ – গোঁসাই, যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর এত তাড়াতাড়ি কি করে দাও? তুমি তো শিশু, কাম সম্বন্ধে কিভাবে তুমি এত জান?

উঃ – ভাল কথা জিজ্ঞাসা করেছ। বটবৃক্ষের পক্ষে বীজকে জিজ্ঞাসা করা যেমন, তোমার প্রশ্নটাও সেইরকম। বীজের মধ্যে যে গাছ আছে, গাছ হয়ে আবার বীজকে জিজ্ঞাসা করছে। আমি না হয় বীজ, তুমি না হয় গাছ। যত সূক্ষ্ম হোক বা ছোট হোক - তেজ সবারই সমান। তেজের দিক দিয়ে কেউ কম নয়। ... তোমাদের মধ্যেও ধারালো জিনিস আছে – ব্যবহার হয় না তোমাদের, আর আমারটা সর্বদাই ব্যবহারে আছে, তাই একটু পারছি। ...

রূপবাবুর কাছারীর এবং গ্রামের অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও বেশ একটা আলোড়ন পড়ে গেছে।

তাঁরা বালক ঠাকুরের কথা অনেকদিন থেকেই শুনে আসছেন, কিন্তু ততটা গুরুত্ব দেননি। এখন বর্ষীয়ান বরদা চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতার কথা শুনে সকলে মিলে ঠিক করলেন বালকের কাছে যাবেন। নায়েব ত্রৈলোক্য সোম, আশু সেন এঁরা কিছু কিছু আগে থেকেই জানেন। আশু সেনই প্রথম কথাটা পাড়লেন। বালককে ডেকে বললেন, ‘আমাদের কিছু খাওয়াতে হবে।’ বালক জবাব দিলেন, “কি খাবেন বলুন জ্যেঠামশায়? ঠিক আছে, কাল সন্ধ্যেবেলায় আপনারা সবাই কাছারী ঘরে আসবেন – আপনাদের নেমন্তন্ন রইলো।”

পরদিন সন্ধ্যা বেলায় সবাই তৈরী হয়ে এসেছেন। কেউ কেউ আবার দুপুরে কম করে খেয়েছেন যাতে সন্ধ্যার ভোজটা উপভোগ করতে পারেন। বালক ঠাকুর তাঁর এক সাথী অমলকে নিয়ে এলেন কিছুক্ষণের মধ্যে। আশু সেনই প্রথমে কথা বললেন, ‘কই হে, আমরা তৈরী। খাবার আনবে না?’ সেদিনই জমিদারী সেরেস্তার কাজের জন্য বেশ কিছু পিসবোর্ড এসেছে। বালক ঠাকুর বললেন, “ঠিক আছে, জ্যেঠামশায়, আপনারা সকলে এক এক খানা পিসবোর্ড নিয়ে বসুন।” সবাই বড় বড় পিস পিসবোর্ড নিয়ে বসেছেন, ভাবছেন হয়ত থালার বদলে পিসবোর্ডের উপরই খাবার দেওয়া হবে। বালক একটু জল হাতে নিয়ে পিসবোর্ডগুলোয় ছিটিয়ে দিলেন। খাবার আসছে না দেখে আশু সেন একটু অধৈর্য হয়ে উঠলেন, ‘কই হে, খাবার দেবে কখন’? বালক একটু হেসে

বললেন, 'খাবার তো সামনেই রয়েছে, খেতে আরম্ভ করুন।' আশু সেন বললেন, 'শুধু তো সামনে পিসবোর্ড রয়েছে, এগুলিই খাবো নাকি?' বালক বললেন, "হ্যাঁ, খেতে আরম্ভ করুন।" এই বলে তাঁর সাথীকে নিয়ে বালক একটু বাইরে গেলেন। সবাই কি করবেন ইতস্তত: করছেন। জিন্নত আলি বললেন, 'বালক যখন বলছে, খেয়েই দেখা যাক না কেন।' ব'লে জিন্নত আলি পিসবোর্ডে কামড় দিলেন। দেখাদেখি আরও কয়েক জন পিসবোর্ড খেতে শুরু করলেন। প্রথম কামড় দিয়েই সকলে বলে উঠলেন, 'অতি উপাদেয়, অতি উপাদেয়। এ রকম স্বাদের জিনিস জীবনে খাইনি।' সকলে পেটভরে খেলেন। আশু সেন আর জিন্নত আলি আবার দুই একটা পিসবোর্ড বাড়ীতে নিয়ে গেলেন সকালে খাবেন বলে। ইতিমধ্যে বালক ঠাকুর ফিরে এসেছেন। তিনি অমলকে ডেকে কলাপাতা দিয়ে তৈরী পানগুলো দিতে বললেন। খেয়ে সবাই খুশী – এরকম পান নাকি তাঁরা কোনদিন খাননি। অনেকে বলাবলি করছেন যে খাওয়া বেশী হয়ে গেছে, হজম হলে হয়। বালক ঠাকুর বললেন, "হজম ভালভাবেই হয়ে যাবে। যার যা রোগ, ব্যথা-বিষ আছে তাও ভাল হয়ে যাবে।"

পরের দিন সকালে আশু সেন, জিন্নত আলি পিসবোর্ড নিয়ে বসেছেন, এক কামড় দিয়ে থু থু করে ফেলে দিলেন – বিশ্রী পিসবোর্ডের স্বাদ। আশু সেন ছাড়বার পাত্র ন'ন, তখনই বালক ঠাকুরের কাছে

পিসবোর্ডটা নিয়ে গেলেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের আবেদন তিনি রাখলেন – পিসবোর্ডগুলি স্পর্শ করে দিলেন। সুতরাং আশু সেন ও জিন্নত আলির দুপুরের ভোজটা ভালই হ'ল।

এর পর থেকে কাছারীর বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বালক ঠাকুরের কাছে সন্ধ্যার পর প্রায়ই এসে বসতেন। শিক্ষক প্রকাশ বল, আনন্দ মাষ্টার আগে থেকেই আসা-যাওয়া করতেন। সেদিন অনেকে এসেছেন। কথায় কথায় 'বিভূতি' সম্বন্ধে আলাপ করতে শুরু করলেন। বালক ঠাকুর বললেন, "এক জায়গাতে বসে বিশ্বের সমস্ত খবরাখবর পাওয়া যায়, এক জায়গায় বসে যার সাথে ইচ্ছা দেখা করে আসা যায়।" বসে বসে আলাপ করছেন এবং সবাইকে বোঝাচ্ছেন – এর মধ্যেই তিনি বললেন, "আমি যার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করে এলাম, তাকে তোমরা চেন। এখান থেকে আট নয় মাইল দূর – রামচন্দ্রপুর, নবদ্বীপ দাসের বাড়ী (ত্রিপুরা জেলা)। আমার হাতে কিছু দাও, আবার গিয়ে দিয়ে আসছি।" আসনের সামনেই কিছু ফল ছিল। তার থেকে একজন একটা আপেল তুলে ঠাকুরের হাতে দিলেন। ফলটাকে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ একটু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "আমি ওখানে গিয়েছিলাম, আপেল ওকে দিয়ে এসেছি।" দুই মিনিটের ভিতর সব হয়ে গেল। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে ঠাকুর সেই সময়ে সেই স্থানে গিয়ে ফলটি নবদ্বীপ দাসের হাতে দিয়ে এসেছেন।

অণিমা শক্তির বিকাশ তখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং যাঁরা প্রায় প্রতিদিনই বালক ঠাকুরের সঙ্গলাভ করতেন, তাঁদের কাছে ঠাকুরের আকস্মিক অন্তর্ধান আর বিস্ময়ের উদ্রেক করতো না, বরং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধারা বলেই মনে হ'ত।

পূজার ছুটিতে মামাবাড়ী দোগাছি গেছেন। বছরের অন্যান্য সময়ে মামার বাড়ীতে ঠাকুরের কমলা মাসীমা, দিদিমা এবং আরও দু'তিন জন ছাড়া বেশী কেউ থাকেন না। পূজার সময়ে আত্মীয়স্বজনে বাড়ী ভরে যায়। মামা মামিমারা, মাসীমা, মামাতো-মাসতুতো ভাই-বোন সকলেই তখন আসেন, সুতরাং বাড়ীতে তিলধারণের জায়গা পর্যন্ত থাকে না। পূজার ক'দিন ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেকেরই কিছু না-কিছু কাজের ভার পড়ে। সবাই খুশীমত কাজ বেছে নে'ন। বালক ঠাকুর আপনমনে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রেখে চলাফেরা করেন। সুতরাং যত রকম অপ্রিয় কাজ যা অন্যেরা করতে চায় না তা তাঁর ওপর এসে পড়ে। পূজার জন্য গো-চোনা প্রয়োজন। সেই গো-চোনা সংগ্রহের ভার পড়লো বালক ঠাকুরের ওপর। এখানেই আশ্চর্য! যে বালক ঠাকুরের নামে হাজার হাজার লোক ভক্তিতে মাথা নোয়ায়, বড় বড় সাধকেরা এসে শ্রীচরণে আশ্রয় খোঁজে, বুদ্ধিজীবী মহল বিস্ময়াপ্লুত হয়ে দিনের পর দিন যার উপদেশ-নির্দেশ শোনে, যার স্পর্শে কঠিন রোগাক্রান্ত মানুষ রোগমুক্ত হয়ে যায়, তাঁর সম্বন্ধে মামাবাড়ীর আত্মীয়স্বজনেরা এত উদাসীন

কেন? এমন কি তাঁকে হাবাগবা ভাবতেও তাঁদের বাধে না। বালক ঠাকুরও এই সব অহংসর্বস্ব মানুষের কাছে নিজেকে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখেন – শুধু তাঁর আসল রূপ চিনতে পারেন তাঁর মাসীমা কমলা দেবী আর দিদিমা।

যাই হোক, তাঁকে যখন একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি সুচারুরূপে তা' পালন করার চেষ্টা করেন। প্রথম দিনের জন্য অর্থাৎ সপ্তমী পূজার জন্য তিন-চার ঘণ্টা মশার কামড় সহ্য করে গো-চোনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। অষ্টমী পূজার জন্য গোয়াল ঘরে আর যান না, গো-চোনার পরিবর্তে নিজের মূত্র ঘটিতে ভর্তি করে পূজার জন্য দিয়ে আসেন; নবমীর দিন পুরোহিত ঠাকুরকে তাঁর প্রস্রাব দিতে বললেন। তাতেই কথাটা প্রকাশ পে'ল। পুরোহিত ঠাকুরের হৈ-চৈতে জানাজানি হয়ে গেল। হেরম্বনাথ শুনে বললেন 'এতে যে মনোবলের পরিচয় পাওয়া যায়, তার তুলনা হয় না।'

সেদিন বিরাট নির্বুদ্ধিতার ভান করে ছেলেমানুষীর অন্তরালে যে শিক্ষা দিয়ে গেলেন, তা সেদিন কেউ ধরতে পেরেছিল কিনা জানিনা, তবে এই সর্বসংস্কারমুক্ত মহানের পবিত্র দেহনিঃসৃত মূত্র যে মানুষের সর্বরোগহর মহৌষধ, তা বোধহয় অনেকেই সেদিন জানতেন না।

বালক ঠাকুরের বড় মাসীমা কমলা দেবী কিন্তু অনেক কথাই জানতেন, অনেক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। বহুদিন ধরেই তাঁর ইচ্ছা ছিল

জগজ্জননীর ভুবনমোহিনী রূপ দেখার। কিন্তু কোনদিন কারও কাছে সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। দোগাছির বাড়ীতে একদিন বালক ঠাকুর ধ্যানে বসে আছেন। তাঁর মাসীমা গিয়ে তাঁর কাছাকাছি বসলেন। সেখানে বসার পরই জগজ্জননীর রূপ দেখার বাসনা তাঁর প্রবল হয়ে উঠলো। বীরেন্দ্র অনেকেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন – যার যার ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। তাই মাসীমার মনে হ’তে লাগলো যে তিনিও দর্শন পাবেন। স্তিমিত আলোয় ধ্যানমগ্ন বালককে দেখা যাচ্ছে। মাসীমা একটু দৃষ্টি ফিরিয়েছেন, হঠাৎ দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শত শত চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী কালীমূর্তি। ক্ষুদ্র দীপ্ত রাঙাপদযুগল, কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতির্ময় ক্ষুদ্র হস্তদ্বয় সুস্পষ্টভাবে তিনি দেখলেন দুই নয়ন ভরে।

বালক ঠাকুর নিজে কিন্তু দেবালয়ে বিশেষ যেতে চাইতেন না। গুরুজনদের আদেশে দেবদেবীর মন্দিরে যেতেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে বলতে শোনা যে’ত, ‘কার পূজা কে করে?’ বেশীর ভাগ সময়েই তাঁর দেবালয়ে যাওয়ার কথা উঠলেই অভাবনীয় নানা প্রকার বাধা এসে উপস্থিত হ’ত। আত্মীয়-স্বজনেরা পরে বুঝেছেন বাধাগুলো তিনি সূক্ষ্মে সৃষ্টি করতেন। আবার লোকশিক্ষার জন্য মাঝে মাঝে যেতেনও।

অনেক মানুষই দীক্ষা গ্রহণ করতে আসে – কখনও কখনও কারোকে স্বপ্নে মন্ত্র দেন, কারোকে আবার স্বপ্নের মাধ্যমে আহ্বান করেন। কুমিল্লায় এক

গ্রামে এক কুলবধূ স্বপ্ন দেখছে – একটি ময়ূরপঙ্খী নৌকা একটি নদীর বক্ষ দিয়ে তরতর করে এগিয়ে চলেছে; নৌকার ছাদে দাঁড়িয়ে এক অনিন্দ্যকান্তি জ্যোতির্ময় বালক; তাঁর মাথার উপর ভেসে উঠেছে, 'তোর ঠাকুর, তোর গুরুদেব, তোর ভগবান,' এই কয়টি কথা। ঘুম থেকে উঠে স্পষ্ট মনে পড়ে রাতের স্বপ্নের কথা। আবার খটকা লাগে - বালকের বয়স তো তার ছেলের থেকে কম মনে হ'ল। যাই হোক কিছুদিন পরে কি একটা উপলক্ষে সেই কুলবধূটি এক জায়গায় বেড়াতে গেছে। সেখানে শুনলো যে সেই গাঁয়ে এক বালক ঠাকুর এসেছেন। স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ে গেল। মায়ের সঙ্গে সে বালক ঠাকুরকে দর্শন করতে গেল। প্রণাম করে তাকাতেই সেই স্বপ্নদৃষ্ট বালককে দেখলো - তিনি হাসছেন আর বলছেন, "সন্দেহ, অবিশ্বাস, এত অল্প বয়স – মহামুশকিল! কিন্তু স্বয়ং কর্তাই তোমার মুশকিল আসান করে দেবেন; কাল সকালে স্নান করে ফুল নিয়ে এস।" পরের দিন মহিলাটি দীক্ষা নিল।

মাতঙ্গিনী দেবীর ঘটনা আরও আশ্চর্যের। বিক্রমপুরের পালপাড়া গ্রামে কৃষ্ণপক্ষের এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখছেন, - তিনি বৃন্দাবনে রাধামাধবের মন্দিরে বসে আরতি দেখছেন। আরতি শেষে সবাই ঠাকুর প্রণাম করছে। তিনিও প্রণাম শেষ করে উঠেছেন, দেখলেন রাধামাধব যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছেন; ধীরে ধীরে বলছেন 'এই নে তোর মন্ত্র। আমি নররূপে এসেছি।

বাংলাদেশেই আমার সাক্ষাৎ পাবি। তখন মানবদেহে এই মূল আবার দিয়ে দেব, অর্থ-পদ্ধতি বলে দেব।' যখন মাতঙ্গিনীর এই স্বপ্নের কথা মনে হ'ত, সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো অপূর্ব পুলকে। কিন্তু কোথায় তিনি খোঁজ করবেন? এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। মাঝে মাঝে স্বপ্নের কথা মনে হয়। কিছুদিন পরে এক আত্মীয়-বাড়ী বেড়াতে গেছেন, খবর পেলেন যে অসাধারণ শক্তিধর এক বালকঠাকুর এসেছেন। কৌতূহলী হয়ে তিনি দেখতে গেলেন। প্রণাম করে উঠতেই ঠাকুর বললেন, "এত দেরী করলে কেন? একবার খোঁজও তো করনি। শেষ পর্যন্ত আমাকেই তো টানতে হ'ল; যাও বাড়ী গিয়ে স্নান করে এস। হ্যাঁ, সেই বৃন্দাবন মন্দিরে পাওয়া মন্ত্রই দেব। যাও, দেরী ক'র না।" যথাসময়ে তাঁর দীক্ষা হয়ে গেল।

।। এগারো ।।

এইভাবে বাস্তব ও আধ্যাত্মিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে বালক ঠাকুরের জীবনের ধারা চলতে থাকে। পাঠশালার পড়া শেষ করতে করতেই জীবনের দশটা বছর কেটে গেল। পাঠশালার শিক্ষার সঙ্গে অবশ্য হাইস্কুলের শিক্ষার একটু পার্থক্য আছে। পাঠশালার শিক্ষায় বাংলা মতে শুভঙ্করী, কড়াগণ্ডা অনেক কিছু শেখানো হয়, যা হাইস্কুলে প্রয়োজন হয় না। সুতরাং পাঠশালায় যারা পড়ে, তাদের হাইস্কুলের গন্ডী পার হ'তে

একটু দেরী হয়। যাই হোক, পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে বালক ঠাকুর কংসনারায়ণ হাই ইংলিশ স্কুলের ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হলেন। তখন হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন মহেন্দ্রনাথ দাস – অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নামডাক। বালক ঠাকুরকে ভর্তি করার সময় তিনি একটিই শুধু প্রশ্ন করেছিলেন, “বলতো, ‘নীতিসুধা’ বানান কি?” উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে বালককে ভর্তি করে নিলেন, ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে। আনুষ্ঠানিকভাবে নামকরণ হওয়ার তেমন সুযোগ হয় নি। পিতৃপিতামহের দেওয়া নাম বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী - কে ছোট করে বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়স্বজন, সহপাঠী, গুরুজনস্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠরা বালককে ডাকতেন ‘বীরু’ নামে।

নিজে জীবনসংগ্রামে সফলতা অর্জন করতে না পারলে কি হবে, প্রত্যেক পিতারই অন্তরের অভিলাষ তার সন্তান মানুষের মত মানুষ হোক। কাঞ্চন মিঞার বাবা ছিলেন নামকরা এক দলীয় নেতা এবং ব্যবসায়ী, তাই প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন। শেষবয়সে সম্পত্তি দেখাশোনা, চাষ-আবাদ আর গো-পালন করে সময় কাটাতেন। তাঁর গোয়ালে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি গরু ছিল - নিজেরা খেয়েও প্রচুর দুধ উদ্বৃত্ত থাকতো। সুতরাং দুধ নিয়ে তিনি রোজই বাজারে বিক্রী করতে আসতেন। কাঞ্চন মিঞা ছিল উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া স্বভাবের। লেখাপড়ায় তার মন ছিল না, বেপরোয়াভাবে জীবন যাপন করাতেই ছিল তার আনন্দ। কিন্তু তার মধ্যে মাঝে মাঝে

একটা সদ্ বুদ্ধি উঁকিঝুঁকি মারতো। হয়তো সেইজন্যই তার সহপাঠী বালক ঠাকুরের প্রতি ছিল তার অদ্ভুত আকর্ষণ। সে প্রাণ দিয়ে বালক ঠাকুরকে ভালবাসতো, বন্ধু হলেও তাঁকে সমীহ করে চলতো। আর এইজন্যই বোধহয় তার জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পালটে গেল। বালকের সংস্পর্শে এসে কাঞ্চন মিঞার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এল – তাঁর নির্দেশ ছাড়া সে এক পাও চলে না। কাঞ্চনের বাবা বালক ঠাকুরের এই বিরাট অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেন, কারণ তিনি জানেন যে তাঁর ছেলের এই বিরাট পরিবর্তন আনা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। বালককে তিনি নিজের ছেলের থেকেও বেশী ভালবাসতেন। তাই যখন তিনি দেখলেন ঘটি হাতে নিয়ে বালক ঠাকুর দুধ কিনতে যাচ্ছেন, তিনি কাছে ডাকলেন। বালকের হাত থেকে ঘটিটি নিয়ে দুধ ভরে দেন আর বলেন, 'রোজ তুমি ঘটি ভরে দুধ নিয়ে যাবে।' ঠাকুর পয়সা দিতে চান - কাঞ্চনের বাবা কিছুতেই পয়সা নেবেন না। শেষে বললেন "ঠিক আছে, আমি কাঞ্চনের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নেব।" ঠাকুরকে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে স্নেহের সুরে বললেন, "কাঞ্চনের কাছ থেকে যেমন দুধের দাম নিতে পারিনা, তোমার কাছ থেকেও তেমনি নিতে পারিনা। তুমি কাঞ্চনের বন্ধু, তুমিতো আমারও ছেলে। ছেলের কাছ থেকে বাপ কখনও কি জিনিস দিয়ে দাম নেয়?" বাজারে তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই তিনি ঠাকুরের ঘটিতে দুধ ঢেলে

দেন আর বলেন, ‘তোমার যখনই দুধের দরকার হবে, আমার কাছে চলে আসবে।’ সেই মধুর সম্পর্ক ঠাকুর অগ্রাহ্য করতে পারতেন না, পাছে এই প্রৌঢ়ের মনে ব্যথা লাগে। প্রতি জনে জনে এইরকম মধুর সম্পর্ক ছিল।

স্কুলে স্পোর্টস হচ্ছে। ছেলেরা সবাই স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় নামছে। বালক ঠাকুরও সহপাঠীদের মত প্রতিযোগিতায় নামবেন। অন্যান্য দৌড়ঝাঁপের মধ্যে তিনি দু’টি প্রতিযোগিতা বেছে নিয়েছেন। প্রথমটা হচ্ছে ‘ব্লাইণ্ড রেস’ – এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের চোখে কাপড় বেঁধে দেওয়া হয় যাতে তারা কেউ দেখতে না পায়। তারপর দৌড় যেখান থেকে শুরু, সেখানে সবাইকে দাঁড় করিয়ে দুই এক পাক ঘুরিয়ে দিয়ে দৌড় শুরু হয়। শুরু হওয়ার সাথে সাথে ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে মাঠে রাখা একটি করে হাঁড়ি লাঠির ঘায়ে ফাটিয়ে ফেলবে। এই জন্য ছেলেদের হাতে একটি করে লাঠি দেওয়া হয়েছে। আয়োজন সব প্রস্তুত - বাঁশী বেজে উঠলো, প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু হয়ে গেল। স্কুলের ছেলেরা, দর্শকেরা সবাই এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করছে। - বেশীর ভাগ ছেলেদেরই দিকজ্ঞান নেই, কেউ মাঠ ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চলেছে, কেউ বাজারের দিকে রওনা হয়েছে, কেউ বা দর্শকের আসনের দিকে চলেছে। বালক ঠাকুর প্রথম থেকেই ঠিক পথে দৌড়তে শুরু করেছেন এবং যত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তত ছেলেরা হাততালি দিচ্ছে। বুঝতে পারছেন কাছাকাছি এসে

গেছেন। প্রথম বার লাঠিটা দিয়ে মাটিতে ঠুকলেন – সুবিধা হ'ল না। আর একটু এগিয়ে লাঠি মারতেই হাঁড়িটা ফেটে গেল। ছেলেরা উল্লাসে ফেটে পড়লো। সবাই ধরলো, 'কি করে তুমি একবারেই পেরে গেলে - আর সবাই তো অনেক পিছনে পড়ে আছে?' বালক বললেন যে, শুরুতে দাঁড়িয়ে মনে মনে দৌড়ের রাস্তাটা কতটা হতে পারে একটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। মাঠে কোথায় কি বিশেষত্ব আছে, নজর করলেন। তারপর মাষ্টারমশাই যখন তাঁকে পাক দিলেন, কয় পাক দিয়েছেন হিসাব করে দৌড়ানোর আগে উল্টো দিকে পাক খেয়ে দৌড়ের মাঠের দিকে মুখ করে নিলেন। তারপর আর বিশেষ অসুবিধা হয় নি। ছেলেদের হাততালিতে, ওদের উল্লাসে বুঝতে পারলেন, তিনি ঠিক পথে চলেছেন। হাঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে হিসেবে একটু গোলমাল লাগছিল - একটু এগোতেই তিনি হাঁড়িটা পেয়ে গেলেন। স্কুল জীবনের প্রথম স্পোর্টসেই সকলে তাঁর দক্ষতা উপলব্ধি করতে পারলো।

বালক ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে আসে - কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। যারা নিজেরা দেখেনি বলে বিশ্বাস করতে পারে না, তাদের মধ্যেও আবার দ্বন্দ্ব আছে। ঠাকুরের পিতার সহকর্মী কাছারীর নগেন্দ্র নাথ দেবকে [পাণ্ডুয়ার শৈলেন দেবের কাকা] ঠাকুর নগেন কাকা বলে ডাকতেন। ঠাকুরের অণিমা শক্তির কথা তিনি শুনেছেন অনেক, তাই সাহস করে একটি কঠিন পরীক্ষার কথা চিন্তা করলেন।

তাঁর ভরসা ছিল যে, ঠাকুর ঠিকই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। তাই একদিন কাছারী বাড়ীর একটি লোহার সিন্দুকের মধ্যে বালককে ভরে তালাচাবি বন্ধ করে দিলেন। তারপর কাছারীর লোকদের সাহায্যে সিন্দুকটি তিতাস নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নদীর জলে ফেলে দিলেন। সিন্দুকটি জলে ডুবে গেল। বালক গোঁসাইয়ের আর দেখা নেই। নদীর পাড়ে লোকে লোকারণ্য - সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে কি হয় দেখতে। বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেছে, কিন্তু বালকের কোন চিহ্ন নেই। নগেন বাবুর মুখ কালো হয়ে গেছে – দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে নদীর পাড়ে পায়চারী করছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি কি গোঁসাইকে হত্যা করলেন নাকি? প্রায় মিনিট কুড়ি পার হয়ে গেছে; কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এতক্ষণ জলের নীচে সিন্দুকের মধ্যে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সবাই দুঃখ করছেন, কারণ বালক ঠাকুরকে সবাই ভালবাসেন। ঘরের ছেলের মত শিশুবয়স থেকে তাঁদের চোখের সামনে কলায় কলায় বেড়ে উঠেছেন, সুতরাং দুঃখ হওয়া তো স্বাভাবিক! সবাই মুষড়ে পড়েছে, এমন সময়ে কে যেন বলে উঠলো, ‘ওই তো গোঁসাই, কাছারীর ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন।’ সবার দৃষ্টি ওদিকে গিয়ে পড়লো। এতক্ষণের বিমর্ষ ভাব কেটে গিয়ে সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। কেউ বললে ‘মানুষের পক্ষে এ ভাবে বাঁচা অসম্ভব।’ মুসলমানেরা কেউ বলে ‘খোদাতাল্লা নিজেই’। আবার কেউ বলে ‘খোদার পয়গম্বর’। সবাই ছুটলো কাছারী বাড়ীর দিকে। সেদিন

বহুলোক ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করলো । এই ঘটনা চারিদিকে এমন রটে গেল যে, দলে দলে মানুষ দীক্ষা নিতে আসতে শুরু করলো।

উপনয়ন তখনও হয়নি, ঠাকুরের বয়স সবে মাত্র এগারো বছর। একজন বললো, 'গায়ত্রী মন্ত্র কেমন, জপ করে দেখ না?' ঠাকুর বললেন, 'বেশ তো, দে না, দেখি কি এর তত্ত্ব।' গায়ত্রী মন্ত্র কাছেই ছিল, তাই নিয়েই বসে গেলেন। একুশ ঘণ্টা করে জপ করে যেতে শুরু করলেন। একদিন ভাবলেন যে, জপ তো করে চলেছেন, কিন্তু গায়ত্রী দেখতে কেমন তা তো জানেন না! পরদিন সবে ভোর হয়েছে, এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত, হাতে একখানি গায়ত্রীর ছবি [এই ছবির কপি অনেকের কাছেই আজ আছে]। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে গতরাত্রে সে স্বপ্ন দেখেছে, তাই ছবিখানি নিয়ে এসেছে। ছবিটায় গায়ত্রী বসে আছেন, তাঁর চার হাত, এক হাতে ত্রিশূল।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি করে আঁকলো?' লোকটি উত্তর দিল, 'কল্পনা থেকে আঁকা ছবি।' 'ঠিক আছে রেখে দাও', বলে লোকটিকে বিদায় দিলেন। এদিকে জপ করার জন্য ঠাকুরকে আর চেষ্টা করতে হয় না, আপনিই আপনমনে চলতে থাকে। ... একদিন ঠাকুর ঘরে বসে কথা বলছেন, এমন সময় বিনয় সোমের মা এসে উপস্থিত। 'গোঁসাই, কার সঙ্গে কথা কও', বলতে বলতে ঘরে ঢুকে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ঠাকুর রগড় করে বললেন, ‘এই একটু কথা বলছি, প্রেম করছি না জ্যেঠিমা।’ বিনয় সোমের মায়ের মুখে আর কথা ফোটে না, আর ফুটবেই বা কি করে?

অপূর্ব স্নিগ্ধ এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভরা ঘরটিতে ঢুকেই তিনি নির্বাক হয়ে গিয়েছেন! ঘরের এক কোণে তাকাতেই দেখেন পরমাসুন্দরী এক জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি; ঠাকুর অর্ধনিমীলিত নেত্রে বসে আছেন। কোনো কথা না বলে দূর থেকে হাত জোড় করে দেবীমূর্তিকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেলেন বিনয় সোমের মা। স্তম্ভিত ভাব কেটে যেতেই বিনয় সোমের মায়ের মনে নানা প্রশ্ন আসতে লাগলো, - পটে আঁকা ছবি, মাটির মূর্তি অনেক দেখেছেন, কিন্তু এইরকম জ্যোতির্ময় জীবন্ত দেবী মূর্তি তো তিনি কোনদিন দেখেন নি! তবে কি তাঁর দর্শন হয়ে গেল? ঠাকুর কেমন সহজভাবে কথা বলে চলেছেন, দেবীমূর্তির সামনে রগড়ও করছেন। তাঁর যে কত কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল! দর্শন পেয়েছেন এই যথেষ্ট! তাঁর মুক্তি তো হয়েই গেল! তাই ঠাকুরকে আর এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করেন নি।

আর একদিন আশু সেন এসে ঐ ঘরে ঢুকেছেন। ঢুকেই সেই জ্যোতির্ময় জীবন্ত গায়ত্রী মূর্তি দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন! কি যে করবেন ভেবে পান না! ঘরের কোণে একটা পাকা পেঁপে ছিল। সেটাকেই ভাল করে ধুয়ে কেটে এনে গায়ত্রীর সামনে দিলেন। ঠাকুর মৃদু

হাসছেন, গায়ত্রীও আশু সেনের পেঁপে দেওয়া দেখে হাসছেন। আশু সেন প্রণাম করে চলে গেলেন।

শিশুবয়সে এসব ঘটনা এত অফুরন্ত হ'ত যে, সব লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কখনও বা খেলাচ্ছলে অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পে'ত।

ঠাকুরের পিতা এই ছবিটা ঠাকুরের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন এবং নিয়মিত পূজা করে যেতেন। তিনি নিশ্চয়ই কারও কাছ থেকে এই ছবির সম্বন্ধে শুনেছিলেন।

আশু সেন রোজ ভোর চারটেয় উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন। বালক ঠাকুর তাঁকে ভোর চারটেয় ডেকে দেন, বলেন 'জ্যেঠামশায়, উঠবেন না? চারটে তো বাজে।' আশু সেন রূপবাবুর কাছারীতে কাজ করেন, বয়সে ঠাকুরের পিতার থেকে বড়। ঠাকুরকে তিনি খুব ভালবাসেন, 'গোঁসাই', 'গোঁসাই' বলে ডাকেন। ঠাকুরও তাঁকে খুব ভালবাসেন। আড়াই বছর বয়স থেকেই আশু সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। জ্যেঠামশায়ের কাছে প্রায় সময়ই যান। আশু সেনের স্ত্রী তাঁকে স্নান করিয়ে দেন, খাইয়ে দেন। ক্রমে ঠাকুরের বয়স প্রায় দশ-এগারো বছর হ'ল; একদিন আশু সেনকে কাছারীর সামনের মাঠে ঘুরে ঘুরে জপ করতে দেখে ঠাকুর বললেন, "জ্যেঠামশায়, আপনি কি জপ করছেন আমি বলতে পারি।" আশু সেন ধমক দিয়ে বলেন, 'এইটুকু বাচ্চা! তুমি জপের কি বোঝ?' ঠাকুর

জবাব দেন, ‘আপনি যার জপ করেন, তাঁকে দেখাতে পারি।’ আশু সেন ঠাকুরের কথা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তিনি বললেন, ‘ঠিক আছে দেখাও।’ ঠাকুর বললেন, ‘জ্যেঠামশায়, আজ না, আর একদিন দেখাবো।’ এর পর একদিন ঠাকুর বললেন, ‘জ্যেঠামশায়, ঘরটা ভাল করে লেপে-পুঁছে একটি জলচৌকির ওপর আসন পেতে রাখবেন।’ ঠাকুর বাচ্চা হলে কি হবে! আশু সেন ঠাকুরের কথা অনুসারে ঘর লেপে পরিষ্কার করে একটি জলচৌকির ওপর আসন পেতে দিলেন। ঘরে তখন আশু সেন, নায়েব ত্রৈলোক্য সোম আর একজন – ঠাকুরের পিতার নামে তাঁর নাম। ঠাকুর বললেন, ‘জ্যেঠামশায়, আপনারা চোখ বুজে বসে জপ করুন। আমি বললে চোখ খুলবেন। যার জপ করছেন তাঁকে দেখতে পাবেন, কিন্তু আপনারা যেন কোন কথা বলতে বা ছুঁতে চেষ্টা না করেন।’ তিনজনে চোখ বুজে জপ করছেন। ঠাকুর বললেন, ‘এবার আপনারা চোখ খুলে দেখুন।’ তাঁরা চোখ খুলে দেখলেন, আসনের উপর সমাসীন এক জ্যোতির্ময়ী পরমাসুন্দরী দেবীমূর্তি – আলুলায়িত কেশ, হাতে ত্রিশূল, স্নিগ্ধ মনোরম জ্যোতিতে ঘর আলোকিত হয়ে উঠেছে। কতক্ষণ ধরে তাঁরা এই দেবীমূর্তি দেখছেন খেয়াল নেই, হঠাৎ বালকের স্বর ভেসে এল, ‘জ্যেঠামশাই, এবার চোখ বুজে জপ করুন।’ কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে তাঁরা দেখেন দেবীমূর্তি অন্তর্হিত হয়েছেন। আসন খালি।

এর কিছুদিন পরে, একদিন ভোরবেলা আশু সেন [আশু সেন বালক ঠাকুরকে খুবই স্নেহ করতেন। ঠাকুরও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। শিশুবয়সে প্রায় সময়ই জ্যেঠামশায়ের কাছে থাকতেন, তাঁর সঙ্গে জ্যেঠামশায়ের ঢাকার বাড়ীতেও যেতেন। আশু সেনই প্রথম বালককে সিল্ক টুইলের একটা শার্ট কিনে দিলেন - সিল্ক টুইল তখন বেশ দামী – ছয় আনা থেকে আট আনা গজ। ইনিও তাঁর সন্তানসম বালকের কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র নিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, 'আপনি সামান্য জিনিসের জন্য মায়া করবেন না, তাতে আপনার বিপদ আসতে পারে। আর বিপদ যে আসছে তারও ইঙ্গিত পাবেন।' বহু বছর পরে ঢাকার গেণ্ডারিয়া থেকে দাঙ্গার জন্য পালিয়ে আশু সেন পুলের এপারে এসে গেছেন, তাঁর নাতিরা নিষেধ করছে, 'দাদু ওদিকে আর যাবেন না - মুসলমানরা এগিয়ে এসেছে দেখা যাচ্ছে।' তবু তিনি সামান্য জিনিসের জন্য ওপারে গেলেন এবং মুসলমানদের আঘাতে প্রাণ হারালেন]। কাছারীর মাঠে বেড়াচ্ছেন আর গায়ত্রী জপ করছেন। বালকও জ্যেঠামশাইয়ের সাথে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কয়েক সেকেন্ড আশু সেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন – চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন বালক কোথাও নেই। একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, 'এত তাড়াতাড়ি গোঁসাই গেল কোথায়!' যাই হোক, ধীরে ধীরে নদীর দিকে রওনা হলেন – ওপারের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হ'ল যে, একটি বাচ্চা শিশু নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে। কিছুদূর এগোতেই বুঝতে পারলেন যে, নদীর ওপর দিয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে যে বাচ্চা শিশুটি হেঁটে আসছেন, তিনি

গোঁসাই ছাড়া আর কেউ ন’ন। আশু সেন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন আর ভাবছেন যে, ‘মানুষের পক্ষে নদীর জলের ওপর দিয়ে হেঁটে আসা কি করে সম্ভব? গোঁসাই ভগবান ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না!’ গ্রন্থের পাতায় পড়েছেন যে, ভগবান পর্যায়ে যাঁরা, তাঁরাই শুধু পারেন জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে। আজ এই পরম বিভূতি প্রত্যক্ষ করে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঠাকুর আশু সেনের কাছে পৌঁছে গেলেন। ওপার থেকে দ্রুতগামী লঞ্চে আসতেও এর থেকে অনেক বেশী সময় লাগে – কি করে বালক এত দ্রুত পৌঁছে গেলেন! আশু সেন নিজের অজ্ঞাতেই হাতজোড় করে প্রণাম করলেন গোঁসাইকে। মিষ্টি হেসে ঠাকুর বললেন, ‘জ্যেঠামশায়, এত আকাশ-পাতাল কি ভাবছেন? সুরের সাধনায় তন্ময় হয়ে যান – নিজেকে সুরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে সুরের মাধুর্যে মিশে যান। কারণ সুরই একমাত্র সম্পদ, যা আহরণ করলে আপনার মধ্যেই সব শক্তি জেগে উঠবে।’

অভিভূত হয়ে আশু সেন বললেন, ‘কি করে তা সম্ভব হবে বলে দাও বাবা। তুমি আমাকে পথ দেখাও।’

‘স্নান করে আসুন, জ্যেঠামশাই’, ঠাকুর জবাব দেন, ‘আর অপেক্ষা না করে আজই সেই সুরের সন্ধান আপনাকে দিয়ে দিই।’ আশু সেন দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং ঠাকুরের নির্দেশিত পথে সাধনায় মগ্ন হলেন।

এদিকে বালক ঠাকুরের নাম চারিদিকে এমন ছড়িয়ে গেছে যে দূরদূরান্ত থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আসে তাঁর কৃপার আশায়। একদিন এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের এক রোগী নিয়ে কয়েকজন ভদ্রলোক একেবারে স্কুলবাড়ীতে এসে উপস্থিত। হেডমাস্টারমশায়ের অনুমতি নিয়ে তাঁরা বালক ঠাকুরের কৃপা প্রার্থনা করেন। রোগী উদরী ব্যারামে ভুগছে, - একেবারে চলচ্ছক্তিহীন। স্কুল প্রাঙ্গণে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। বালক ঠাকুর হেডমাস্টারমশাইকে প্রথমে বললেন, "স্যার, একটা লাঠি নিয়ে জোরে জোরে রোগীর পেটে মারুন।" শোনা গেল ডাক্তারি চিকিৎসার কোন ফল হয়নি। হেডমাস্টারমশাই এগোচ্ছেন না দেখে বালক এক সহপাঠীকে বললেন। সেই সহপাঠী কোন দ্বিধা না করে একটা মোটা লাঠি নিয়ে রোগীর পেটে জোরে জোরে আঘাত করলো – রোগী যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে আশ্চর্যভাবে রোগীর পেট থেকে জল বে'র হতে শুরু করলো। কয়েক বালতি জল বেরিয়ে গেল। রোগী একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলো। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে সবাই তো আশ্চর্য!

দিন দশেক পরে ভদ্রলোক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে এসেছেন বড় একটি লিলি বিস্কুটের টিন নিয়ে। বালক ঠাকুর কিছু নেবেন না জানেন, তাই হেডমাস্টারমশাইকে একটি স্পোর্টসের আয়োজন করতে অনুরোধ করেছেন। স্পোর্টসে বালক ঠাকুর প্রথম স্থান অধিকার করে লিলি বিস্কুটের বড় টিন পুরস্কার পেলেন। টিনটি খোলা হ'ল।

সবাইকে বিস্কুট বিতরণ করে খালি টিনটি বালক বাড়ী নিয়ে গেলেন।

স্কুলে তিন চার দিন যেতে পারেন নি। উজানচর স্কুলের নিয়ম, স্কুল কামাই করলে রোজ এক আনা করে ফাইন দিতে হয়। যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে পারলে অবশ্য সেই ফাইন মকুব হ'ত। এইভাবে স্কুলে একটি ডিসিপ্লিন রাখা হ'ত এবং ছেলেরাও অযথা কামাই করতে সাহস করতো না। বিশেষ করে নিচু ক্লাসে এই নিয়মটি সম্বন্ধে কড়াকড়ি ছিল। ঠাকুর দরখাস্ত দিলেন- লিখলেন, "মা ছুঁতে পারেন না, সুতরাং এ কয়দিন আমাকে রান্না করতে হয়েছে, পরিবেশন করতে হয়েছে। এই সব করে স্কুলে যাওয়ার সময় করে উঠতে পারিনি। অতএব আমার ফাইন মকুব করে দেবেন।" মাস্টারমশাই চিঠিটি পড়ে তখনই হেডমাস্টারমশাই-এর কাছে নিয়ে গেলেন। হেডমাস্টারমশাই মহেন্দ্রবাবু বালককে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "কী করে তুমি একথা লিখলে! সত্যিই তুমি সহজ, সরল, সত্যের পূজারী।" সেই চিঠিখানা বাঁধিয়ে স্কুলে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল।

ঠাকুরের এক সহপাঠী দেখলো যে, এটা তো বেশ একটা সহজ উপায়। মাস্টারমশাই কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। কত আর মাথাধরা, পেটব্যথা লেখা যায়! সে লিখলো – ঠাকুমা ছুঁতে পারে না, তাই স্কুলে আসতে পারে নি। মাস্টারমশাই ছেলেটিকে ডাকলেন, 'তোর ঠাকুমার বয়স কত?' ছেলে বলে, 'আশি বছর।'

ফাইন মকুব তো হ'লই না, উপরন্তু মিথ্যা কথা বলার জন্য কয়েক ঘা বেত ওকে খেতে হ'ল। ছেলেটি তখন বুঝতে পারে নি, পরে বুঝেছিল কী করে ওর মিথ্যা কথা ধরা পড়লো।

মামাবাড়ী দোগাছিতে বণিক্যদের [কুঞ্জ বণিক্য, নিবারণ বণিক্য] বাড়ী ঘটা করে মনসাপূজা হয়, আর সেই পূজায় কুমুদী ঠাকুরের রয়ানি গান দেওয়া হয়। বালক ঠাকুর যাত্রা, রয়ানি গান প্রভৃতি খুব ভালবাসেন। সেবার বণিক্যদের বাড়ী গেছেন রয়ানি গান শুনতে। মাঝখানে দশ মিনিটের জন্য বিরতি। অনেকেই আসন ছেড়ে বাইরে গেছে। বালক ঠাকুর আপনমনে বসে একটা মরা ফড়িং-এর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কুড়িয়ে জোড়া দিতে লাগলেন। থামের আড়ালে আরও কয়েকটি ছেলে বসেছিল, তারা লক্ষ্য করছিল বালক ঠাকুরের কার্যকলাপ। তাদের মধ্যে বড়াব্বা [বড়াব্বা - শচীন দাস, দাড়িয়াবান্ধার নামকরা খেলোয়াড় ছিল, সঙ্গে প্রফুল্ল হোড়, মনা এবং আরো কয়েকজন ছিল] একজন নামকরা খেলোয়াড়। বালক ঠাকুরকে তারা দেখেছে, কিন্তু পরিচয় হয়নি। ফড়িং-এর দেহটি প্রায় সম্পূর্ণ জোড়া দিয়েছেন, শুধু একটি ঠ্যাং খুঁজে পাননি। বালক ঠাকুরকে বণিক্যরা চিনতেন, সুতরাং তাঁকে মণ্ডপে বসিয়েছিলেন। সেখানে কোশাকুশি থেকে একটু জল নিয়ে ফড়িংটার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন, তার পর ফুঁ দিয়ে বললেন– 'যা'। ফড়িংটা উড়ে চলে গেল। বালক ঠাকুর খেয়াল করেন নি যে, কেউ তাঁর

কার্যকলাপ দেখছে। তাই বড়াব্বা আর তার সাথীরা যখন 'কি দেখলাম,' 'কি দেখলাম' বলে এসে তাঁর পায়ে পড়লো, বালক ঠাকুর বললেন, 'তোমরা বুঝি দেখে ফেলেছ?' বড়াব্বার সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে - মৃত পতঙ্গের মধ্যে যে প্রাণ-সঞ্চার করতে পারে - সে ভগবান ছাড়া আর কে হতে পারে!

দিদিমা এবং বড় মাসীমা (কমলা দেবী) বালক ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা বলতেন প্রায়ই, "আমরা বুঝলাম, হারিয়ে বুঝলাম।" মাসীমা একদিন দিদিমার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন কি একটা কথা নিয়ে, তাতে দিদিমার মনে খুব লেগেছে। বালক দিদিমার মুখ ভারী দেখলে ব্যথা পেতেন। দিদিমাও বালককে অস্বাভাবিক ভালবাসতেন। দিদিমাকে ঐ অবস্থায় দেখে বালক বুঝে নিলেন, কে এই গোলমাল করেছেন। তিনি মাসীমাকে ডেকে বললেন, "আসুন ঠাকুর ঘরে, আমি মজা দেখাবো। দিদিমার সঙ্গে কেন ঝগড়া করলেন? শিবের মত আপনাকেও একটা সাপ গলা জড়িয়ে ধরবে। আসুন আমার সঙ্গে।" মাসীমা দেখলেন, বালক সোজা ঠাকুর ঘরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে তিনি উঁকি মেরে দেখেন, একটা বিরাট সাপ বালকের পায়ের কাছে পড়ে আছে। ভয়ে তাঁর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। তিনি পালিয়ে গেলেন। বেশ বুঝলেন যে, বালকের ইচ্ছা আর সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাই বলার সাথে সাথে ওঁর কথা এত সহজ ভাবে ফলে যায়।

কয়েকদিনের জন্য ঢাকা এসেছেন। সেখান থেকে মুন্সীগঞ্জে যাবেন - সঙ্গে যাবে কয়েকজন ভক্তশিষ্য। সময়মত তাঁর নৌকা ছেড়ে দিল, কিন্তু পথে ঝড় উঠল। নৌকার গতি দিল পালটে। এদিকে অন্ধকার নেমে আসছে, দিক্‌নির্ণয় করা কঠিন। সুতরাং সেরাত্রি ওই চরেই নৌকা লাগানো ঠিক হ'ল। রাতে খাবার জন্য এক ভক্তকে পাঠালেন কিছু চিঁড়ে-গুড় কিনে আনতে। কিছু দূরেই একটা কুটিরে টিমটিম করে আলো জ্বলছিল। সেইখানে গিয়ে কড়া নাড়তেই এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। কে এক বালক মহাপুরুষ এসেছেন শুনে তিনি নিজেই ঘাটের দিকে গেলেন। তাঁকে দেখেই বালক ঠাকুর বলে উঠলেন, "কে, অশ্বিনী না! তোমার অর্ধমন্ত্র পূর্ণ করে নেবে না?" এতটুকু বালকের মুখে নিজের নাম শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তবে নিশ্চয়ই এই সেই পূর্ণব্রহ্ম অবতার, যার আগমনের অপেক্ষায় তিনি বসে আছেন! অশ্বিনী চ্যাটার্জী যখন যুবক, লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সেবাযত্ন করে তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। শেষে লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁকে অর্ধমন্ত্র দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর প্রকৃত গুরু হচ্ছেন এক পূর্ণব্রহ্ম অবতার – অর্ধশতাব্দী পরে তাঁর সাক্ষাৎ মিলবে। প্রভুর আদিষ্ট সময় প্রায় হয়ে এল। অবসর গ্রহণ করার পর এই কাটাখালি চরে ওই কুটিরে বসে সাধন ভজন করেন – সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত সমাজ-সেবক গুরু–ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক চিন্তাহরণ দে। বালক ঠাকুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, "এস এখানে, এই নদীর পাড়েই

তোমার মন্ত্র পূর্ণ করে দিই।” চিন্তাহরণও অশ্বিনীদার পথ অনুসরণ করে দীক্ষা নিলেন।

বালক ঠাকুরের সংস্কারমুক্ত বাণী মানুষের মনে যত প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, প্রচলিত ধর্মের ওপর, অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ততই মানুষের আস্থা কমতে থাকে। কিছু কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তাতে স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং তারা শত্রুতা করতে ছাড়ে না। প্রচলিত ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশটা যতই তিনি খুলে দেন, কুসংস্কারগুলোকে যতই সবার সামনে তুলে ধরেন, ততই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পূজা-পার্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, শনি-রাহুর দোহাই দিয়ে নিরীহ দুর্বলচিত্ত মানুষকে দোহন করার বিরুদ্ধে, ঘর ছেড়ে গেরুয়া পরে ফটকা বেঁধে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করার বিরুদ্ধে, ‘কাম-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে ভগবদ্‌দর্শন হয় না।’ – এই সব মামুলী কথার বিরুদ্ধে যতই তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন, ততই কতকগুলি ধর্মীয় সম্প্রদায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কারণ যে হারে বালক ঠাকুরের ভক্ত অনুগতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তাতে তাদের স্বার্থহানি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সুতরাং তারা বালক ঠাকুরের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে, কিন্তু তাতে বিশেষ সুফল পায়না। ক্রমশঃই মানুষ বালক ঠাকুরের সংস্কারমুক্ত বাণী শুনে আকৃষ্ট হয়। তাই বালক ঠাকুরের প্রাণ নাশের জন্য শত্রুপক্ষ একদিন সাত হাত লম্বা - এক বিরাট জাতির সাপ জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর ছেড়ে দেয়। বালক ঠাকুর তখন তত্ত্বালাপ

করছিলেন – ভক্তেরা অনেকেই কিছু কিছু লিখে নিচ্ছিলো। ক্ষিপ্রগতিতে বালক ঠাকুর ঘরের দরজাটা খুলে দিলেন। সাপটা কোন ক্ষতি না করে বেরিয়ে গেল। পরে শোনা গেল, ওরা বেদেদের কাছ থেকে সাপটা টিনে করে কিনে এনেছিল।

অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তির প্রকাশ শিশুবয়স থেকেই এত অফুরন্ত যে, এই অল্প পরিসরের মধ্যে সেই সব ঘটনার বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। স্বতঃস্ফূর্ত অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তির প্রকাশ তাঁর জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, এমন কি এক একদিন তিন-চার বারও এইরকম প্রকাশ হতে দেখা গেছে।

একদিন বালক ঠাকুর নৌকাযোগে যাচ্ছিলেন। একটা বাজারের কাছে [তালতলার হাট - ধলেশ্বরী নদী - বরিশালের স্টীমার আসছিল, তাকে থামানো হল] নৌকা লাগাতেই বালক নামলেন কাঁঠাল কেনার জন্য। ভাল কাঁঠাল পাওয়া যায় সেখানে, দু'আনাতেই বেশ বড় কাঁঠাল পাবেন, রাস্তায় খেতে খেতে যাওয়া যাবে। সবে কাঁঠালের দোকানে দর করছেন, কে একজন পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো, 'গোঁসাই বাঁচান'। কাঁঠাল আর কেনা হ'ল না। লোকটির ছেলে নৌকা থেকে নদীর জলে পড়ে গেছে, বাচ্চা শিশু - হয়তো স্রোতের টানে তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! বালক ঠাকুর নদীর ঘাটে গিয়ে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন, তারপর নিজেই জাহাজের চেন ধরে নীচে নেমে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি

শিশুটিকে ধরে নিয়ে ওপরে উঠে এলেন। বালক ঠাকুরের কার্যকলাপ দেখে উপস্থিত সকলেই হতবাক হয়ে গেল! মানুষ ভীড় করে তাঁকে দর্শন করতে এল। পরে এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রল, "ঠাকুর, কি করে এই অসাধ্যসাধন করলে?" বালক জবাব দিলেন, "মনের X-RAY (এক্সরে) যন্ত্রটা দিয়ে দেখে নিলাম যে বাচ্চাটা জাহাজের চেন আঁকড়ে ধরে আছে, সুতরাং আমার কাজ সহজ হয়ে গেল।"

এই ঘটনার পর ফেগনসা, গোবরদি, ইছাপুরা, মালখানগর প্রভৃতি সব জায়গা থেকে মানুষ দীক্ষা নিতে ভীড় করে এল। ঠাকুর নেবেন না, তবু জোর করে আট-দশটা কাঁঠাল এনে তারা নৌকায় তুলে দিল। ঠাকুর বললেন, "আমি যদি দশহাজার টাকা চাইতুম, তোমাদের দিতে তো আপত্তি হ'ত না?" তারা স্বীকার করলো যে, তাদের যথাসর্বস্ব বাচ্চাটির জীবনের বিনিময়ে দিতে তারা রাজী ছিল।

চট্টগ্রামে মাসীমার বাড়ী গেছেন কয়েকদিনের জন্য। চট্টগ্রামে বেশ কিছু ভক্তশিষ্য হয়েছে। একদিন এক ভক্ত মাস্টারদাকে (সূর্য সেন) বালক ঠাকুরের কথা বলেছে। মাষ্টারদা সব শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "একদিন নিয়ে এস না।" ভক্তটির সঙ্গে ঠাকুর গেলেন সূর্য সেনের বাড়ীতে। অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের আলাপ হ'ল। সূর্য সেনের দেশপ্রেম দেখে ঠাকুর তাঁকে বললেন, "এরকম সবাই যদি হ'ত, তবে আর দেশের এই দুর্দিন থাকতো

না।” অল্পসময়ের মধ্যে সূর্য সেন ঠাকুরকে ভালবেসে ফেললেন। বললেন, “বালক ঠাকুর, তুমি একটু চেষ্টা করলেই পারবে। দেশের মানুষকে এই ক্লেদ-পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করতে পারবে। তোমার ওপর আমি ভরসা রাখি – তুমি একদিন মানুষকে পথ দেখাবে।”

।। বারো ।।

ক্লাস থ্রির ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেল। বালক প্রমোশন পেয়ে ওপরের ক্লাসে উঠবেন, মাষ্টারমশায়ের যেমন আনন্দ হয়, তেমনি আবার চোখে জল আসে - আর তো তিনি ছাত্রকে তাঁর কাছে পাবেন না! তিনি তো এই ক্লাস পর্যন্তই পড়ান। বালক মাস্টারমশাইয়ের কান্নায় অভিভূত হয়ে বলেন, “তাতে কি হয়েছে মাস্টারমশাই? আপনার কাছেই থেকে যাব এ বছর।” সবাই পাশ করে উপরের ক্লাসে উঠল, কিন্তু বালক সেই ক্লাসেই রয়ে গেলেন। পিতাকে গিয়ে বললেন, “মাস্টারমশাই কাঁদছিলেন খুব, তাই এবারও এই ক্লাসেই রয়ে গেলাম। ভালই হ’ল, এবছর আর নতুন বই কিনতে হবে না।” বালকের কার্যকলাপ দেখে কেউ আশ্চর্য হলেন, আবার কেউ বিদ্রূপ করলেন, কিন্তু বালকের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

মেদিনীমণ্ডলে বৈদিক বাড়ীর পাশেই দুর্গাচরণ দাসেদের বাড়ী। দুর্গাচরণ বালক ঠাকুরের থেকে পাঁচ-ছয় বছরের বড়। গ্রাম সম্পর্কে ঠাকুর তাকে ‘দাদা’ বলে

ডাকতেন। সে ঠাকুরকে দিয়ে তামাক সাজাতো, ফুট-ফরমাস খাটাতো। একদিন বিপাকে পড়ে সে বালককে ডেকে পাঠালো। একটি মেয়ের সঙ্গে সে প্রেম করতো - গ্রামদেশে এসব চল ছিল না, তাই পাড়ার লোক জানতে পেরে ওকে মারবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। বাড়ী থেকে বেরোলেই মারবে। বালক ওকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার, তোমাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে, দুর্গাদা?" দুর্গাচরণ তাঁকে সবকথা খুলে বলে একটা উপায় বে'র করতে অনুরোধ ক'রল। তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা সে শুনেছে, কাজেই সেদিন বিপদে পড়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে। ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, তুমি বে'র হও। কেউ কিছু তোমায় বলবে না।" দুর্গাচরণ বিশ্বাস করতে পারে না। বালক ঠাকুর একটা ফুল হাতে দিয়ে বললেন, "যাও, ঘুরে এস।" দুর্গাচরণ ভয়ে ভয়ে বের হ'ল, দেখে লাঠি-সোটা নিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলছে না।

দিনে স্কুলে যেতেন আর রাত্রে বালক খেলতেন তাঁর বিরাট খেলা, সঙ্গে কোন না কোন সাথী থাকতো। কখনও তাদের জপ-ধ্যানে বসাতেন আর বলতেন, "যখন কোন শব্দ শুনবি, তাকিয়ে দেখবি।" বিনয় পাল এসেছে কৃষ্ণনগরে। বালক ঠাকুর একদিন ঘুম থেকে ডেকে তুললেন তাকে, "ওঠ, ভোর হয়ে গেছে।" বিনয় পাল উঠে দেখে, - সূর্য উঠেছে লাল হয়ে, কাক ডাকতে শুরু করেছে। বিনয় পাল দেখে বলে, "আজ সূর্য বেশ বড় হয়ে উঠেছে!" এদিকে কাছারীর দুজন পিওনের

ভোর পাঁচটায় বে’র হবার কথা। ওরা তাড়াতাড়ি ধড়ফড় করে উঠে তৈরী হয়ে নিল বে’র হবার জন্য। কিছু দূর গিয়ে দেখে সূর্যের আলো কোথায়? এখনও তো রাতই রয়ে গেছে! আশ্চর্য হয়ে বাড়ীতে ফেরে। বালক ঠাকুর ইতিমধ্যে বিনয় পালকে বললেন, “চল, সূর্যদা! অনেক পরিশ্রম করেছো। এবার একটু ঘুমোও।” বলার সাথে সাথে আবার অন্ধকার নেমে এল। বিনয় পাল কাছারীঘরে ঘড়ি দেখতে গেল, দেখে মাত্র সাড়ে তিনটা বেজেছে। “আমাকে তুমি দেড়টার সময় তুলে দিয়েছিলে?” –বিনয় পাল বলে। ঠাকুর জবাব দিলেন, “ওটা সহস্রারের সূর্য-বাইরে প্রকাশিত হয়েছে এবং বেশ খানিকটা আলোয় আলোময় করে তুলেছিল। এই সহস্রারের সূর্য সদাসর্বদা ভিতরে জ্বলছে। এইটেই বাইরে প্রকাশিত হ’ল।”

কৃষ্ণনগরে একদিন ঠাকুর বিভূতি সম্পর্কে আলাপ করছেন। বললেন, “সব দরজা-জানলা বন্ধ করে ব’স।” ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ করে দেওয়া হ’ল। বালকের স্কুলের কয়েকজন মাষ্টারমশাই, বালকের পিতার দুই একজন সহকর্মী এসেছেন। ঘরে আলো জ্বলছে। ঠাকুর বলছেন, “এই আলাপ করতে করতে তোমরা শুধু আলাপই শুনবে, অথচ দেখবে কি ভাবে বাষ্পের মত মিশে যাচ্ছি। তোমরা নদীর পাড়ে গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে।” বালক ঠাকুর এই বুঝিয়ে যাচ্ছেন আর ক্রমশ: ক্রমশ: হাল্কা হয়ে যাচ্ছেন। এরপর আস্তে আস্তে বাষ্পের মত হয়ে যেতে লাগলেন। পরে শুধু শব্দ আছে, তিনি

নেই। - তারপর শব্দও নেই, তিনিও নেই। কিছুক্ষণ বসে থেকে, সকলে নদীর পাড়ে গিয়ে দেখেন, ঠাকুর ওখানে বসে আছেন। ওঁরা ঠাকুরকে দেখেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, "তোমাকে এতদিন পুত্র বাৎসল্যে দেখেছি, আমাদের এখন উদ্ধার করার ব্যবস্থা কর।"

স্কুলের টিফিনের সময় সকলেই কিছু টিফিন খায়, খেলা করে বা গল্প-গুজব করে। কিন্তু বালকের চিন্তাধারা অন্যরকম। চৈত্র মাসের রোদে মাঠে বেঁধে-রাখা গাভীগুলোর কষ্টে বালকের মনে কষ্ট লাগে। গাভীর মালিকেরা সকালবেলা ওদের মাঠে বেঁধে রেখে চলে যায় আর সন্ধ্যার সময়ে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। প্রখর রৌদ্রে পিপাসা-কাতর গাভীগুলোর কষ্টের সীমা থাকে না, অথচ বাঁধা রয়েছে, তাই কোন জলাশয়ের কাছেও যেতে পারে না। ওদের কষ্টে ব্যথিত হয়ে বালক বালতি-বালতি জল টেনে নিয়ে গিয়ে গাভীদের খাওয়ান। ওদের গায়ে-মাথায় জল দিয়ে দেন। এটা তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যে একটা প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোজ প্রায় দুশো বালতি জল টানতে হয় তাঁকে। বালককে দেখলেই গাভীগুলো আনন্দে ছুটাছুটি করে। কেউ হয়তো কোনদিন বালকের এই প্রেম-ভালবাসার কথা জানতে পারতো না, যদি না বালক গ্রামান্তরে যাবার পথে তাঁর সহপাঠী সামাদের বাড়ী না যেতেন।

সামাদের বন্ধু এসেছে - সামাদের বাবা তাঁকে দুধ খাওয়াবেন, তাই দুধ দোহাতে গেলেন। সাথে সাথে

ঠাকুর এবং আর সকলে গোয়াল ঘরের দিকে গেলেন। গাভীটা ঠাকুরকে কাছে পেয়ে আদর করতে শুরু করেছে – ঠাকুরও ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সামাদের বাবা দেখে তো অবাক! দুধ দোহা বন্ধ করে বললেন, “এর আগে সমাধান হোক! আমি ছাড়া আর কেউ ওর কাছে এগোতে পারে না, ও শিং খাড়া করে ছুটে আসে। তোমার সঙ্গে এত ভাব কি করে হ’ল?” ঠাকুর বললেন, “তা তো জানি না।” সামাদ এবং আরও দুই একজন এগিয়ে গেল - গাভীটা ওদের দেখে তেড়ে আসে। ঠাকুর বললেন, “আচ্ছা, এই গাভীটা কি কাছারীর মাঠে চরতে যায়?” সামাদের বাবা বলেন, “হ্যাঁ, রোজ ওকে আমি কাছারীর মাঠে বেঁধে রেখে আসি।”

ঠাকুর – রোদে ওদের কষ্ট হয়, পিপাসা পায় ভেবে রোজ আমি নদী থেকে বালতি বালতি জল এনে ওদের খাওয়াই। রোদে থাকলে, বিশেষ করে গরমের দিনে আমাদের তৃষ্ণা পায়। আমরা তো জল চাইতে পারি, ওরা তো পারে না! তাই ওরা তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছে ভেবে আমার প্রাণে ব্যথা লাগে, সেইজন্য রোজ আমি ওদের জল খাওয়াই।

সামাদের বাবা – সত্যি জন্তুরও কৃতজ্ঞতা আছে। আমার থেকে তোমায় ও বেশী ভালবাসে। তুমি ওর তৃষ্ণা মেটাও, তাই ও তোমাকে চিনে রেখেছে। – সামাদের বাবা এবার কাঁদতে শুরু করেন।

ঠাকুর – ভালবাসা বুঝি না। কারও ক্ষতির চিন্তা আমি করি না। আমি জল খাইয়েই খালাস। ওদের মুখের দিকে তাকাই না বা চিনে রাখারও চেষ্টা করি না।

সামাদের বাবা – আজ আমার জীবনে একটা বিরাট শিক্ষা হয়ে গেল। ওরাও উপকারের মূল্য দেয়, ওদেরও কৃতজ্ঞতা আছে। তুমি ওকে চেন না, কিন্তু ও তোমায় চিনে রেখেছে। আমি এত মারধোর করি গরুকে, আজ আমার শিক্ষা হয়ে গেল। কৃতজ্ঞতার একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ পেয়ে গেলাম। জীবনে আমি আর গো-হত্যা করবো না, কারণ তোমার সেবার কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি আমার সন্তানের মত, সামাদ আর তুমি তো আলাদা নও। তুমি আজ আমাকে এক অতুলনীয় শিক্ষা দিয়ে গেলে। মুখে বললে কাজ হ'ত না, প্রত্যক্ষ অনুভব ক'রলাম, কানে শুনলাম।

ঠাকুর একটু সরে দাঁড়িয়েছেন। গাভীটা ঘুরে আবার ঠাকুরের দিকে এগিয়ে গেল, আদর করতে শুরু করলো। ঠাকুরও ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

সামাদের বাবা অভিভূত হয়ে বললেন, 'তোমার প্রেম ও ভালবাসায় ও মুগ্ধ হয়ে গেছে। ওর কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই ও তোমাকে চিনে ফেলেছে। গাভীও দেখছি ভালবাসার কাঙাল। সত্যি আমরাই পশু, আমরা নিষ্ঠুর, এদের আমরা হত্যা করি। ওরা যখন তোমার ভালবাসা বুঝতে পারে, আমাদের নিষ্ঠুরতাও তখন বুঝে নেয়। আমরা তো অভিশাপ কুড়াচ্ছি। আমাদের দিকে

তাকিয়ে তো ওরা বোঝে যে, অযথা আমরা ওদের খুন করছি। খোদার কাছে আর্জি - তুমি তো পয়গম্বর, তোমার কাছে জোড় হাতে জানাচ্ছি যে, আমি আর কোনদিন হতাহতের মধ্যে যাব না। আমার ঈদ, আমার রোজা নিরামিষ করবো, আমিষের মধ্যে যাবো না।'

ঠাকুর মুখে কিছুই বললেন না, কিন্তু তাঁর স্নেহ-বিগলিত দৃষ্টি অনেক কথাই জানিয়ে দিল।

ছুটিতে বালক মামাবাড়ী দোগাছি গেছেন। পৈত্রিক ভিটা মেদিনীমণ্ডলে তাঁকে একবার যেতে হবে – মাত্র দেড় মাইল পথ। কিন্তু এমন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে যে সম্পূর্ণ ভিজে যেতে হবে। দিদিমা একটা ছাতা বে'র করে দিয়ে বললেন, "এই ছাতিটা নিয়ে যা।" কাজ সেরে মেদিনীমণ্ডল থেকে ফিরে এলেন, বৃষ্টি আর নেই। ছাতাটা কিন্তু ওখানেই ফেলে এসেছেন বালক। এদিকে দিদিমা জিজ্ঞাসা করছেন, "ছাতিটা কই? দে ছাতিটা।" বালক বললেন যে, ছাতাটা তিনি ফেলে এসেছেন। শুনেই দিদিমার মেজাজ খারাপ। 'নতুন ছাতা, এখনই না আনলে ও আর পাওয়া যাবে না।' – দিদিমা গজগজ করতে লাগলেন। বালক দিদিমাকে বললেন, "ডাক না ছাতাটাকে, ও ঠিক এসে পড়বে।" দিদিমা দুঃখ পাচ্ছেন দেখে, বালক দিদিমাকে ডাকলেন, "উঠানে এস, তুমি যখন ছাতাকে ডাকলে না, আমিই ডাকি, দেখ।" একটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার ঘটবে ভেবে উঠানে বেশ কয়েকজন এসে দাঁড়ালেন। সুন্দর ঠাকুরও কি একটা কাজে তখনই

এলেন। বালক ঠাকুর ডাকলেন, "এই ছাতা আয়, এই ছাতা আয়।" কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেলুনের মত ছাতাটাকে আকাশ পথে ভেসে আসতে দেখা গেল। সবাই তো দেখে অবাক! তাঁকে ধরলো, 'কি করে এটা করলে?' বালক জবাব দিলেন, "মানুষকে ডাকলে যদি মানুষ জবাব দেয়, ছাতাই বা কথা শুনবে না কেন? শুধু মন আর মুখ এক হওয়া চাই।"

দেখাবার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু করতেন না, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর অলৌকিক শক্তি কাজ করে যে'ত। চেষ্টা করে তাঁকে কিছু করতে হ'ত না, চিন্তার সাথে সাথেই অলৌকিক ঘটনা ঘটে যে'ত।

বালক ঠাকুরের চরিত্রের আর একটা দিক ফুটে উঠেছিল শিশুবয়স থেকেই। সমাজের কাঠামো নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন। শ্রমিকেরা তাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না, অথচ শ্রমিকেরাই সমাজের স্তম্ভ। শ্রমিককে কাজ করিয়ে নিয়ে মালিকেরা মুনাফা করে নিচ্ছে, শ্রমিকদের উপযুক্ত মূল্য দিচ্ছে না। উপযুক্ত মূল্য দিচ্ছে না বলেই সমাজের আজ এই অবস্থা। তাই শোষণ-নীতি ভেঙ্গে দিয়ে এক নতুন সমাজ-কাঠামো তৈরী করার পরিকল্পনা তিনি শিশুবয়স থেকেই করে আসছেন। প্রত্যেকটি শ্রমিকের সমান অধিকার, সমান মূল্য থাকবে, কেউ কাউকে শোষণ করবে না, কেউ কাউকে বঞ্চিত করবে না। প্রচলিত ধর্মনীতিকেও তিনি এই তুলাদণ্ডের মান থেকে বাদ দেন না। তাই তাঁর আন্দোলন, তাঁর

বিপ্লবের ধারা চিরাচরিত রাজনৈতিক পর্যায়ে নয়, বিবেক-নীতির পর্যায়ে। রাজনীতি যখন জন্মেনি, বিবেক-নীতিই সমাজের সর্বস্তরে পথ দেখাতো।

একটি বটগাছের তলায় শত শত মানুষ, জীবজন্তু আশ্রয় নেয়, কোন বাধা নেই। সবারই সেই ছায়ার ওপর সমান অধিকার। অতীত যুগে ফলগাছগুলো রক্ষা করার ভার ছিল জনসাধারণের ওপর। কয়েক গ্রাম মিলে সবাই একত্রে চাষ করতো, ফসল এক জায়গায় এনে রাখতো। সেখান থেকে যার যার প্রয়োজনমত খাবার দ্রব্য নিয়ে যেত। ঠাকুর চিন্তা করতেন, - লোক বেড়েছে সত্যি, তেমনি জমিও আবার বেড়েছে, উৎপাদনও বেড়েছে, সুতরাং এই নীতি চালু করতে কোন অসুবিধা না হওয়ারই সম্ভাবনা। যে অসুবিধাটা আজ হচ্ছে, তার মূল কারণ হচ্ছে দুর্নীতি, শোষণ আর সঞ্চয়বুদ্ধি। এর অবসানের কথাই তিনি চিন্তা করতেন।

মানুষকে তিনি ভালবাসেন কিন্তু তার রোগকে নয়। তাই ইংরাজের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না – ছিল তাদের শোষণ, বঞ্চনা এবং অন্য জাতিকে দাবিয়ে রেখে আধিপত্য করার প্রবণতার ওপর। এইগুলিই হচ্ছে অসুর-বৃত্তি – অসুর-বৃত্তি ও অসুরের নিধন করাই তিনি শ্রেয় মনে করতেন।

তাই যখন বাজার থেকে ফেরার পথে কাকা এবং তাঁর আশিজন সহকর্মীকে চিত হয়ে শুয়ে সত্যাগ্রহ করতে দেখলেন, তিনি বললেন, “কাকা, তোমাদের দেশ,

তোমাদের মাটি, তোমরা চিত হয়ে শুয়ে ইংরেজের কাছে ভিক্ষা ক'রছ! তার থেকে ওই বাঁশঝাড় থেকে আশিটা বাঁশ কেটে এনে আশিটা ইংরেজের মাথায় বাড়ি দাও, তাতে বেশী কাজ হবে। আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত! তেত্রিশ কোটি মানুষকে মাত্র ষাট হাজার ইংরেজ বুটের তলায় রেখে দিয়েছে, আর আমরা এত অপদার্থ হয়ে গেছি যে, তার বিরুদ্ধে একজোটে প্রতিবাদ করতেও পারছি না।"

কাকা বলেন, "উপায় কি! ওই ভাবে প্রতিবাদ করতে গেলে তো চাকরী যাবে, জেল-হাজত ভোগ করতে হবে। হয়তো আরও বেশী শাস্তি হয়ে যাবে।"

ঠাকুরের কাকা এবং তাঁর সহকর্মীরা সত্যাগ্রহ করছেন আর একজন চামচে করে তাঁদের কি খাওয়াচ্ছে। বালক ঠাকুরের এ দৃশ্য মোটেই ভাল লাগে না।

তিনি বললেন, "জানিনা, কে এই দুর্বল নীতি তোমাদের শিখিয়েছে। তবে এটা বলতে পারি, এই নীতিতে কোন শুভ ফল আসতে পারে না। দাবী আদায় করতে হলে লাঠি ধরতে হবে, তা ছাড়া কোন উপায় নেই। যারা শোষণ করে মুনাফা লুটছে, তাদের বিবেকের ওপর নির্ভর করার কোন অর্থ-ই হয় না। কারণ আমাদের দুর্বলতার সুযোগ ওরা বেশী করে নেবে – সেই সুযোগই নিচ্ছে। শুধু শক্তির কাছে ওরা মাথা নোওয়াবে। সুতরাং লাঠি ধর এবং শোষক-শ্রেণী নির্মূল কর।"

আত্মীয়স্বজনের পক্ষে ঘরের ছেলের অলৌকিকত্ব দেখেও সেই দেখাটাকে ধরে রাখা শক্ত।

কারণ প্রতিমুহূর্তে যাঁকে দেখছে বাস্তবের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে, সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করে, গুরুজনকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে চলতে, তাঁর অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখেও আবার অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। এই ভুল হয় বলেই ঠাকুরের পক্ষে সংসারের একজন হয়ে সাধারণ ভাবে আত্মীয়স্বজনের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখে চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। সবাই তাঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে, তবুও তাঁরা দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই সেটা ভুলে থাকতেন আর ঠাকুরও এমন ব্যবহার করতেন যাতে তাঁরা ভুলে থাকেন। অবশ্য ঠাকুমা শশীমুখী দেবী আর জ্যেঠামশায় চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী বালককে অপত্যস্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখলেও সর্বদাই বালকের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ঠাকুমা যেমন ঠাকুরকে গোপাল ঠাকুরের মত দেখতেন, স্নেহ-প্রেম দিয়ে সেই শিশুবয়স থেকেই তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন, ঠাকুরও তেমনি ঠাকুমাকে ভালবাসতেন। কিন্তু বাস্তবের সম্পর্ক বেশীদিন টিকলো না – ঠাকুমা দেহ রাখলেন ঠাকুরের যখন এগারো বছর বয়স।

মাতা চারুশীলা গেছেন পিত্রালয় দোগাছিতে, পিতা সুরেন্দ্র চন্দ্র বেরিয়েছেন তহশীলে। সুতরাং কাউকে কিছু জানাবার প্রয়োজন নেই - ভক্তদের বলে গেলেন সব গুছিয়ে রাখতে। তারা জানে, বালক ঠাকুর যখন বাইরে যান কি করতে হয়। ত্রিপুরার এক লামা সন্ন্যাসী, সাধক

হিসাবে তাঁকে অনেকে জানে। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন বালক ঠাকুর কালিম্পং হয়ে দার্জিলিং-এ। দার্জিলিং-এ গিয়ে যে লামা পরিবারের বাড়ীতে উঠলেন তারা অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাকুরকে ভালবেসে ফেললো। তাঁকে ছাড়তে তাদের প্রাণ কাঁদে। কথা দিলেন, ফেরার পথে দু’ একদিন থাকবেন। এগারো-বার বছরের ছোট ফুটফুটে ছেলে, লামা পরিবার তাই ঠাকুরকে আপন সন্তানের মত দেখে। আবার তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির জন্য তাঁর ওপর তাদের অগাধ শ্রদ্ধা। কিন্তু সেখানে বসে থাকলে তো চলবে না, যে কাজের জন্য এসেছেন, সেকাজ তো শেষ করতে হবে। - তাই লামা সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি বেরিয়ে পড়লেন গ্যাংটক হয়ে তিব্বত অভিমুখে। কোথাও হেঁটে, কোথাও চমরী গাই বা রাম ছাগলের পিঠে চড়ে পৌঁছলেন তিব্বতের লং পাহাড়ে। পথে অনেক সাধকের সঙ্গে দেখা হ’ল – কেউ গুহাবাসী, কেউ বা শিষ্য-পরিবৃত হয়ে আছেন – অনেক আলাপ আলোচনা হ’ল – কেউ কেউ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণও করলেন। লং পাহাড়ে এসে যখন পৌঁছলেন, সঙ্গে বেশ কয়েকজন এলেন।

লং পাহাড়ের এক জায়গায় একটি আশ্চর্য ত্রিশূল পোঁতা রয়েছে। কিংবদন্তী আছে ওই ত্রিশূল নাকি স্বয়ং শিব ওইখানে পুঁতে রেখেছেন এবং যিনি ঐ ত্রিশূল তুলে ফেলতে পারবেন, তিনিই জগত শাসন করবেন, তাঁর শক্তি শিবের সমতুল্য। লামা সন্ন্যাসী ঘুরতে ঘুরতে বালক ঠাকুরকে সেখানে নিয়ে গেলেন। ঠাকুর কিংবদন্তীর কথা

শুনে ত্রিশূলটি আস্তে করে টেনে তুলে ফেললেন। বালক ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ শুনে বহু লোক, বহু সাধক এসে জড় হয়েছিল। এবার তারা এই আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারীকে দেখে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে প্রণাম করলো। বালক ঠাকুর যে অনায়াসে শিবের ত্রিশূল উৎপাটিত করেছেন, এই খবর পাহাড়ে পাহাড়ে বায়ুর বেগে রটে গেল। পাহাড়ে নির্জন গুহাতে অনেক বড় বড় সাধক বসে কাজ করে চলেছেন। তাঁরাও জানেন যে, যিনি শিবের প্রোথিত ত্রিশূল উত্তোলন করবেন, তিনি অসীম শক্তিশালী, শিবের সমতুল্য শক্তির অধিকারী এবং সারা দুনিয়াকে তিনি বেদের পথে ও মতে নিয়ে যাবেন। আর এখানেই সংঘাতের সৃষ্টি। অনেক বড় বড় সাধক আছেন ঠিকই, যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করে চলেছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বেদবিরোধী কাজ করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সচেষ্ট। তাই তাঁরা যখন শুনলেন শিবের ত্রিশূল উত্তোলনের কথা, তাঁরা বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। এদিকে বালক ঠাকুরের উপস্থিতিতে চারিদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে সাড়া পড়ে গেল - বহু মানুষ ছুটে এল এই বিরাট পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করতে, দলে দলে লোক দীক্ষা নিতে শুরু করলো। ভক্তেরা ঠাকুরকে গ্রামে গ্রামে নিয়ে গেল চমরী গাইয়ের পিঠে চড়িয়ে। বহু জায়গায় আদি বেদের তত্ত্ব শুনে পাহাড়ের মানুষ মুগ্ধ হয়ে গেল। এই জায়গায় ভক্তদের আগ্রহে ক্রমাগত সাতদিন ধরে

বেদের তত্ত্ব দিয়ে গেলেন ঠাকুর – দূর দূর পাহাড় থেকে মানুষ এসে মুগ্ধচিত্তে শুনলো সেই তত্ত্ব।

পাহাড়ে পাহাড়ে উৎসব লেগে গেছে। বালক ঠাকুরকে পেয়ে মানুষ অভিভূত হয়ে পড়েছে। বেদবিরোধী সাধকেরা কিন্তু ঠাকুরের প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারছে না। তারা চায় পৃথিবী থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং তার জন্য তাদের অর্জিত শক্তির অপব্যয় করতেও তারা পিছপা দেয় না। একদিন ঠাকুর কয়েকজনকে সাথে করে চলেছেন। হঠাৎ এক তিব্বতী ভক্ত বলে উঠলো, "প্রভু! তোমার একদিকের গাল কালো হয়ে যাচ্ছে কেন?" ঠাকুর আপন মনে চলছিলেন, খেয়াল করেন নি এতক্ষণ। ভক্তের কথায় তাঁর খেয়াল হ'ল। বুঝতে পারলেন যে, কোন শক্তিধর সাধক তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করছে। চড়াই পার হয়ে গিয়ে তিনি পৌঁছলেন একটি গুহার কাছে যেখানে সেই সাধক সাধনা করে। সাধকের মনোভাব অনমনীয়, সে তার সমকক্ষ কাউকে এই পৃথিবীতে থাকতে দেবে না। তাই সে ঠাকুরের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঠাকুরের শক্তি সম্বন্ধে তার কোন ধারনাই নেই। ঠাকুর ওকে প্রথমে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, বেদের পথে আসতে বললেন, কিন্তু ওর সব চিন্তাধারাই বিপরীত। - তাই শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, "সাধক, তোমার শক্তি অমঙ্গল ডেকে আনবার জন্য নয়। শক্তি যদি ব্যবহার করতেই হয়, তবে সৃষ্টি-রক্ষার্থে, জীবের মঙ্গলের জন্য তা' ব্যবহার করা উচিত। তুমি বিপথগামী, তাই তোমার শক্তি কেড়ে নিতে

আমি বাধ্য হচ্ছি।" সাধক এতক্ষণে বুঝতে পারলো যে, বিরাট সূর্যের কাছে সে জোনাকি মাত্র - কিন্তু তখন আর উপায় নেই। শক্তি হারিয়ে সে বালক ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

।। তেরো ।।

ক্রমে বালক বার বছর উত্তীর্ণ হয়ে তেরোর কোঠায় পা দিলেন। স্কুলেও এবার প্রমোশন নিয়ে ক্লাস ফোর-এ উঠলেন, কিন্তু পড়বার তাঁর সময় কোথায়? ভক্ত-শিষ্যের সংখ্যা ক্রমশ: বেড়েই চলেছে। বাড়ী থেকে স্কুল মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ, কিন্তু এইটুকু যেতেই তাঁর আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে যায়। ভক্ত-শিষ্যদের চাহিদা মেটাতে মেটাতে সময় পেরিয়ে যায়, মাঝে মাঝে স্কুলে যাওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

শিষ্যভক্তদের অনুরোধে বালককে মাঝে মাঝে শিষ্য ভক্তদের বাড়ী যেতে হয়। এমনি এক জায়গায় [ষাটনল স্টেশনের কাছে বাগবাড়ীর জমিদার চৌধুরীদের বাড়ী] তাঁকে নিয়ে গেছে। বিরাট জমিদার বাড়ীর অন্দরমহল। বিরাট বিরাট ঘর - কয়েকটি লণ্ঠনের আলোকে আলোকিত। তার একটি ঘরে বালক ঠাকুরের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে - সঙ্গে তাঁর সাথী অমল। জমিদার বাড়ীর লোকেরা বালক ঠাকুর আর তাঁর সাথীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। ঘরটি পুরোনো আমলের

সজ্জায় সজ্জিত। দেওয়ালে হরিণের শিং টাঙানো - দেখে মনে হয় এককালে এই জমিদারেরা বেশ ঐশ্বর্যশালী ছিল। অমল ঠাকুরের বিশ্রামের ব্যবস্থা করছে – হঠাৎ খট খট আওয়াজে সে চমকে উঠল। এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু হদিশ করতে পারে না, ভাবলো হয়তো বাড়ীর লোকেরা আশেপাশের দেওয়ালে কিছু পুঁতছে। ঠাকুর ধ্যানে বসে আছেন চোখ বুজে। আবার সেই খটখট শব্দ - অমলের আওয়াজটা একটু অস্বাভাবিক লাগে, লণ্ঠনটা তুলে দেখে যে, হরিণের শিংগুলো খটখট করে নড়ছে। ঠাকুরকে ওই অবস্থায় বিরক্ত করা উচিত নয়। তবু অমল ডাকলো, ‘গোঁসাই, হরিণের শিংগুলো যে খটখট করে নড়ছে!’ ঠাকুর জবাব দিলেন, ‘বোধ হয় বাতাসে নড়ছে, তুই শুয়ে পড়।’ অমলের ভয় লাগে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না - ঠাকুরের আদেশ মত শোবার চেষ্টা করে। আবার সেই খটখট আওয়াজ। অমল বলে, “গোঁসাই, বাতাস তো নেই, দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছি, শিংগুলো তবু খটখট শব্দ করছে।” ঠাকুর এবার ধমক দিয়ে বললেন, ‘চুপ করে শুয়ে থাক।’ অমল চুপ করে আছে, বুকের মধ্যে তার ঢিপ ঢিপ করছে। কিছুক্ষণ পরে অমল আবার বলে ওঠে, ‘ও গোঁসাই, একটা বাচ্চা পিঠে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।’ ঠাকুর এবার বললেন, ‘দেখতো পাশের ঘরে কে আছে?’ অমল পাশের ঘরে মিটিমিটি আলো জ্বলছে দেখে এগিয়ে গেল। সেখানে যা দেখলো, ওর তো চক্ষুস্থির! দু’চার বার হাঁক দিল – কেউ কোথাও নেই মনে হ’ল। ভয় পেয়ে ঘরে এসে

ঠাকুরের কাছে বসেছে - দেখছে, কে যেন ফুঁ দিয়ে লণ্ঠনটা নেভাবার চেষ্টা করছে। এবার সে ঠাকুরের পা চেপে ধরে বললো, ‘গোঁসাই, আমি তোমার পা ছাড়ছি না, এটা তো একটা ভুতুড়ে বাড়ী!’ ঠাকুর বললেন, “ভয় পাচ্ছিস কেন? একটু জল দে, সব ঠিক করে দিচ্ছি।” ঠাকুর জল ছিটিয়ে দিলেন। মনে হ’ল যেন একটা বিরাট ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তারপর সব ঠাণ্ডা।

সকাল বেলা বাড়ীর লোকেরা এসেছে। ঠাকুর তাদের দেখে বললেন, ‘তোমরা জান এটা পোড়ো বাড়ী। তোমরা কি করে আমাদের মত দুটি বাচ্চাকে এখানে একা ফেলে চলে গেলে? তোমাদের একটু বিবেচনা থাকা উচিত ছিল।’ ...... সেই থেকে ঐ বাড়ী দোষমুক্ত হয়ে গেল।

দোগাছি গ্রাম – বালক ঠাকুরের উপনয়নের দিন শেষ পর্যন্ত ধার্য হ’ল। আগে দুই - একটা দিন ঠিক করা হয়েছিল, কিন্তু কোনও না কোন কারণে দিন পিছিয়ে দিতে হয়েছে। বেশ সমারোহ করেই উপনয়ন হ’ল। পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন – নিমন্ত্রিতও ছিলেন অনেকে। উপনয়নের পর নিয়ম পালন করে বারোদিনের দিন যখন নিয়মভঙ্গ করেন, তখন চারজন নাগা সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত।

বালক ঠাকুরের দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনারা যে এলেন, কোথা থেকে এলেন?”

নাগাসন্ন্যাসী – আমরা খবর পেয়ে এসেছি।

দিদিমা – কী খবর পেয়ে এসেছেন?

নাগাসন্ন্যাসী – একজন মহাযোগীর পৈতা - সে উপলক্ষে আমরা এখানে এসেছি। আমরা শুধু তাঁকে দর্শন করতে এসেছি, অন্য কিছু নয়।

বালক ঠাকুর বেরিয়ে এলেন। ‘নম: ব্রহ্মণ্যে নম:’ বলে বালক ঠাকুরকে ওঁরা প্রণাম করলেন। ঠাকুর আশীর্বাদ করলেন, বললেন, “আপনারা এসেছেন, একটু সেবা করে যাবেন।”

নাগাসন্ন্যাসী – ঠিক আছে। আপনার কথা ফেলতে পারব না। তাই ক’রব।

বালক ঠাকুরের মাসীমা, দিদিমা এবং আরো সবাই মিলে চারজন নাগা সন্ন্যাসীকে আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন।

ওঁরা বললেন, “আমরা সন্ন্যাস নিয়েছি ঠিকই, মনের দিক থেকে এখনও সন্ন্যাস নিতে পারিনি। আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি কোথায় আছে সেই ধন, যার কাছে গেলে সত্যিকারের কিছু পাব। আমরা এমনি পয়সার কাঙাল নই, কিন্তু পয়সার দরকার আছে। যতক্ষণ পারি, হাঁটাপথে চলি, না পারলে বলি – ‘যদি কয়েকটা পয়সা দেন, যাতায়াতের পথে সুবিধা হয়।’ তবে বেশী কিছু আমাদের চাওয়া নেই। ওঁর কথা শুনেছি। শোনা কথাটা অন্তর থেকে আমাদের চারজনের ভিতরেই জেগে উঠেছে। ওঁর দর্শনে, স্পর্শনে মনে হয় কিছু পেয়ে গেছি।” ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “এই সুরটা নিয়ে যেন থাকতে পারি। আপনি আশীর্বাদ করবেন যাতে যাত্রা শুভ হয়, আমরা

এগিয়ে যেতে পারি। কারণ ভড়ংই বেশী, আমরাও ভড়ং নিয়েছি - ভড়ং নিয়েছি এই জন্য যে সবসময়ে আমাদের আলাদা মনে করে দেখি এবং তার ইজ্জত রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি। - তাও পারি না। মনের দিক থেকে আমরা চারজন একত্রিত হয়ে মন-প্রাণ দিয়ে পণ করেছি যে, সহজে আমরা স্খলিত হয়ে না যাই। সেইভাবেই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি যৌগিকমতে এবং শাস্ত্রমতে। আমরা উপার্জনক্ষম। আমরা বাপ-মার অনুমতি নিয়েই বেরিয়েছি। যে অভাবের তাড়নায় বেরিয়েছি - সেই অভাব থেকে যাতে মুক্ত হতে পারি, সেই আশীর্বাদ করবেন।”

সেবা করার পর প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে এক টাকা করে দক্ষিণা দেওয়া হ'ল। তাঁরা বললেন, "দক্ষিণার রীতি আছে, ভালই হয়েছে। আমাদের একটু টানাটানি ছিল। এক টাকা হ'ল - বেশ কিছুদিন চলে যাবে।"

তারপর ওঁরা বালক ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন, “হে মহান যোগী, অনুমতি করুন। আমরা পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়েছি যাতে সেই একটা ঠিকানাই খুঁজে পাই। আমাদের আর এখানে অন্য কোন ঠিকানা নেওয়ার ইচ্ছা নেই। ক্ষুধা পেলে খাই - চারজন একত্রে এক বাড়ীতে গেলে অসুবিধা মনে করতে পারে - তাই এক একজন এক এক বাড়ীতে যাই। আমাদের চাওয়া নেই - যদি ডেকে কিছু দেয় তো ভাল। ক্ষুধা তো রয়েছে, সেটা পূরণ করা দরকার - কখনও জল পান করি, কখনও

এমনিই থাকি। আপনার আশীর্বাদ নিয়ে যাচ্ছি। আপনি তো জন্মগত - জন্ম থেকেই আপনি পেয়েছেন বিরাটের সাড়া। এটা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা বুঝিও না - বুঝবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। সেটুকুনু আশীর্বাদ করবেন।” ঠাকুর আশীর্বাদ করলেন – কিছু বললেন না।

সকলেরই এই বৃদ্ধ নাগা সন্ন্যাসীদের ভাল লাগল। দিদিমার তো খুব ভাল লেগেছে, কারণ ওঁরা সাধারণের মত নন। ওঁদের সবারই বাড়ীর অবস্থা সচ্ছল, তবুও পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়েছেন। দিদিমাকে বললেন নাগা সন্ন্যাসীরা, “মা, আসিগে? আপনি ভাগ্যবতী। আমরা অনেক জায়গায় ঘুরেছি। খুঁজে দেখেছি - তল পাওয়া যায়। ওঁর কাছে এসে তল আর পাচ্ছি না – এটাই ভাল লাগলো। আমরা চালডালের ভিক্ষুক নই। যেখানে গিয়েছি - পায়ের তলে মাটি পেয়েছি। এখানেই বলে গেলাম, পায়ের তলায় মাটি পাইনি – আমরা ডুবে যাচ্ছি। আর এটাই আমাদের ভাল লাগছে ।” নাগা সন্ন্যাসীরা বিদায় নিলেন।

বাইরের লোক এসে মধু আহরণ করে নিয়ে যায়, আর দেশের তথাকথিত মুক্ত-পথের পথিকেরা ষড়যন্ত্র করে, কি করে বালক ঠাকুরের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় - যাতে ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে তারা তাদের পার্থিব ভাণ্ডার ভরতে পারে। কোন এক সম্প্রদায়ের লোক তাই এক সরল মাঝিকে মন্ত্রণা দেয়, ‘নৌকা ফুটো করে পদ্মার জলে বালক ঠাকুরকে ভাসিয়ে দে। যদি তিনি

ভগবান হ'ন, অক্ষত শরীরে ঠিকই ফিরে আসবেন।' ষ্টীমারের অপেক্ষায় ঠাকুর নৌকাতে একটু বিশ্রাম করছেন, তাঁরই গ্রামের মাঝি ওই শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় নৌকা ফুটো করে ভাসিয়ে দেয় উত্তাল তরঙ্গময়ী পদ্মার বুকে। সেখান থেকে বেঁচে আসা অসম্ভব - দেখতে দেখতে পদ্মার ঢেউয়ে নৌকা মিলিয়ে গেল। পরদিন সকালে বালক ঠাকুরের বাড়ী গিয়ে দেখে, তিনি আসনে বসা। হতভম্ব মাঝি নিজের অপরাধ স্বীকার করে দীক্ষা গ্রহণ করে [এই মাঝি সর্বানন্দ কর্মকারের ছবি 'পরিচিতি - চিত্রকথা' ও পরিচিতি বইয়ে আছে]।

উজানচর কাছারী বাড়ীতে মাঝে মাঝে সাথীদের নিয়ে বসেন। নিজেও ধ্যানে বসেন, তাদেরও জপ করতে বলেন। সেদিন সাথীদের বলেছেন, "কোন আওয়াজ পেলেই চোখ মেলবি।" কিছুক্ষণ জপ করবার পর ওরা ধুপধাপ আওয়াজ শুনতে পেল। তাকিয়ে দেখে গোঁসাই আসনে নেই, ঘরের জানলা দরজা যেরকম ভিতর থেকে বন্ধ ছিল সেইরকমই আছে। এরকম ঘটনা দেখে ওরা অভ্যস্ত। কী করতে হবে তাও জানে। দরজা খুলে সোজা নদীর ধারে যায়, দেখে নদীর ধারে ঠাকুর বসে আছেন। ঠাকুরকে ধরতে যায় - ধরতে পারে না – তিনি অন্তর্হিত হয়ে যান। ঘরে ফিরে এসে দেখে সেখানেও নেই - আবার ছুটে নদীর ধারে যায়, দেখে খেলার মাঠে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। এবার সকলে জাপটে ধরতে যায়। দেখে ঠাকুর নেই, নিজেরাই জাপটা-জাপটি করছে। এইভাবে

সারারাত ঘুরছে - একবার নদীর ধার, ফুটবল মাঠ আর একবার কাছারী ঘর। শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, “গোঁসাই, আর আমরা ছুটাছুটি করতে পারছি না। তুমি এবার নিজে নিজেই ফিরে এস।” এইবার কাছারী ঘরে গিয়ে দেখে গোঁসাই যে আসনে বসেছিলেন, সেখানেই ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন। ঠাকুর সাথীদের দেখে চোখ মেললেন, “তোদের খুব ছুটাছুটি করিয়েছি, তাই না?” গোঁসাইকে পেয়ে ওরা নিজেদের কষ্টের কথা ভুলে গেছে। সাথীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এইভাবে সাথীদের খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেন, তারাও প্রবল আগ্রহে জপধ্যান করে।

একবার মীরকাদিমে যাবার কথা ছিল। ঠাকুর হঠাৎ ঠিক করলেন মুন্সীগঞ্জের কাছে এই গ্রামটিতে যাবেন। ষ্টীমারে গেলেন, কিন্তু ষ্টীমার কমলাঘাটে ভিড়ছে না - একটু দূরে দাঁড়াচ্ছে। ওখান থেকে নৌকা করে কমলাঘাটে যেতে হচ্ছে। কারণ ওখানে বসন্ত প্রচণ্ড মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে, শ’য়ে শ’য়ে লোক মারা যাচ্ছে - চারিদিকে চিতার আগুন জ্বলছে। অনেকে আবার সৎকার করতে না পেরে নদীর ধারে মরাগুলো ফেলে দিয়ে গেছে। হঠাৎ না জেনে এসে পড়েছেন – ভাবছেন, কি করবেন! এদিকে ভীষণ গরম, নৌকাতে উঠে পিপাসা পেয়ে গেছে। হঠাৎ দেখেন একটি লোক ডাব নিয়ে আসছে। সবাই দেখছে যে, লালপেড়ে শাড়ী পরা একটি সুন্দরী মহিলা ঝাড়ু হাতে করে গ্রামে আপনমনে ঝাঁট দিয়ে

চলেছেন আর যেদিকে ঝাঁট দিচ্ছেন - মড়ক লেগে যাচ্ছে। মহিলাটিকে দেখছে, কিন্তু কেউ সাহস করে এগোচ্ছে না তাঁর দিকে। ঠাকুর দেখলেন সাংঘাতিক ব্যাপার - সর্বনাশ হয়ে যাবে। এদিকে ঠাকুরের সাথী অমলের গা ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। ঠাকুর ডাবের জল একটু খেয়ে অমলকে দিলেন, তাতেই ওর গা ব্যথা সেরে গেল। ডাবের মধ্যে জল ভরে ঠাকুর লোকটিকে দিয়ে বললেন চারদিকে ছিটিয়ে দিতে। জল ছেটানোর সঙ্গে সঙ্গে মড়ক থেমে গেল – কে বলবে ওখানে বসন্তের মড়ক লেগেছে। কমলাঘাটের মানুষ সেবার রক্ষা পেল। সে যাত্রা ঠাকুরের আর মীরকাদিম যাওয়া হ'ল না। ওখান থেকেই ফিরে গেলেন।

তিতাস নদীর পাড়ে ঠাকুর আর তাঁর কয়েকজন সাথী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন [শ্রীবীরেন্দ্র বাণী]। ঠাকুর বেশ মজার কথা বলছেন, আর সবাই হাসছে। একটি বড় 'গয়না'র নৌকা এল নদীর ঘাটে, তখন প্রায় ভোর পাঁচটা। 'গয়না' থেকে চারজন লোক নামল তাদের হাতে কপি, বেগুন। শীতকাল, সুতরাং কপি ও বেগুনগুলো দেখতে বেশ পুষ্ট। ঠাকুর নদীতে স্নান করতে নেমেছেন, সাথীরা কাপড় জামা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন লোক এগিয়ে এসে ডাকলো, 'এই খোকা, শোন তো।' ঠাকুর ইশারায় ওদের সরিয়ে দিলেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, 'এই খোকা, এখানে একজন বাচ্চা ঠাকুর আছেন। কোথায় থাকেন বলতে পার?' ঠাকুর জবাব দিলেন, 'আপনারা কি ক'রে বাচ্চা ঠাকুরের কথা

শুনলেন?’ ওদের মধ্যে একজন বললো, ‘আমার এক বন্ধুর ছেলে [সারদাবাবুর ছেলে] মরণাপন্ন হয়েছিল, তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর ঠিকানা নিয়ে আমরা এসেছি।’ ঠাকুর তাঁর সাথীদের দেখিয়ে বললেন, ‘ওদের কাছে বলুন। ওরা তাঁকে ভালভাবেই চেনে - ওরাই নিয়ে যাবে।’ ইতিমধ্যে ঠাকুর স্নান সেরে চাদর গায়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ওরা [নগেন ঘোষ, বঙ্কিম দে, মরণ রায়চৌধুরী, অহীন্দ্র ঘোষ] আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল। সাথীরা পরিচয় করিয়ে দিল, ‘ইনিই বাচ্চা ঠাকুর।’ ঠাকুর বললেন, ‘অনেকেই ভুল করে, সুতরাং কিছু মনে না করাই ভাল।’ তারা সবাই ক্ষমা চাইলো। ঠাকুর বললেন, ‘ও ব্যাপার তো চুকে গেছে। ও রকম ভুল অনেকেই করে।’ কপি, বেগুন ঠাকুরের জন্যই এনেছে ওরা - সেখানেই প্রসাদ নেবে। আর একটা পোঁটলা খুলছে দেখে ঠাকুর বললেন, ‘কি, ফুল এনেছ?’ ওরা বললো, ‘না, ফল এনেছি।’ ঠাকুর বললেন, ‘আমি দেখছি ফুল, বলা হচ্ছে ফল। আমি ভেবেছিলাম দীক্ষা নেওয়া হবে তাই ফুল আনা হয়েছে।’ তর্কাতর্কি না করে পোঁটলাটা খুলে ফেলতে বললেন ঠাকুর। খুলে দেখা গেল বেশ কতকগুলি গোলাপ ফুল। ওরা তো হতবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে! একজন জিজ্ঞাসা করলো, ‘আজ আমরা দীক্ষা নিতে পারবো কি?’ ঠাকুর বললেন, ‘নতুবা এতগুলো ফুল নিয়ে এসেছ কি করতে? আমি তো সেইজন্যই অপেক্ষা করছি।’ ওরা স্নান করে এসে দীক্ষা নিল। তারপর ঠাকুরকে বললো, ‘বাবা, তুমিই সব, তুমিই

সব কিছু।’ তিনি বললেন, ‘অবাক হবার কি আছে? প্রথম বীজ, তারপর গাছ, তারপর ফুল, তারপর ফল। এও ঠিক তাই, ক্ষণে ফুল, ক্ষণে ফল – অবাক হওয়ার কী আছে?’

গতবছর পাহাড় থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে কথা দিয়ে এসেছিলেন, “আবার আসবো”, তাই আবার পাহাড়ে গেলেন এক ভক্তের সঙ্গে। মাতা চারুশীলা যখন পিত্রালয়ে যান, এবং পিতা খাজনা আদায়ের জন্য যখন মফস্বলে যান, সেই সময়টিই বালক ঠাকুর বেছে নে’ন দূর দেশে যাবার জন্য। বাধা দেবার বা দুশ্চিন্তা করার কেউ তখন থাকে না। সুতরাং ভক্তদের কাউকে কৃষ্ণনগরের বাড়ীর ভার দিয়ে বালক ঠাকুর বেরিয়ে পড়েন। ভক্তরাও ঠাকুরের সঙ্গে থেকে থেকে জেনে নিয়েছে, কখন কি বলতে হবে। তাই মাতাপিতার কাছে তাঁর দূর দেশে যাত্রা অজ্ঞাত থেকে যায়। সেবার ত্রিপুরাবাসী সেই নবীন লামা সাধকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন কালিম্পং হয়ে দার্জিলিং-এর পথে। দার্জিলিং-এর লামা পরিবারের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে যে, তারা কিছুতেই বালক ঠাকুরকে ছাড়তে চায় না। অবস্থাপন্ন এই লামা পরিবারের স্বামী, স্ত্রী, মেয়েরা সবাই বালক ঠাকুরকে এত ভালবাসে যে, তাঁকে নিজেদের ঘরের ছেলের মত দেখে। লামার বাড়ীতে প্রায়ই সেই লামা সন্ন্যাসী আসেন। তিনি বড় বড় সাধকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বালককে তিব্বতের কাছাকাছি পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। ওখানকার সাধকরা বৌদ্ধ হলেও

তন্ত্রের সাধনা করেন। কখনও কখনও এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাধকেরা তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করে দেখতেন, সত্যিই বালক ঠাকুর মহাপুরুষ কিনা। এক জায়গায় এক বিরাট সাধক বালক ঠাকুরের উপর তাঁর দৈবশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। গায়ে জল ঢেলে দিলে বা সামান্য তাপ দিলে যেমন অনুভব করা যায়, ঠাকুরও তেমনি ভাবে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে তাঁর উপর শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তি তিনি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন দ্বিগুণ উৎসাহে। ফেরত পাঠানো মাত্র সাধকের সব শক্তি অন্তর্হিত হ'ল। সাধক প্রমাদ গুনলো; বলে উঠলো, 'ওরে বাপরে বাপ, সাংঘাতিক! তুমি তো সব নষ্ট করে দিয়েছ!'

বালক বললেন, 'তুমি সংগ্রহ করেছ। তুমি এখানে পরিশ্রম করে সেটা অর্জন করেছ। আমি তো এখানে অর্জন কিছু করিনি। পরিশ্রম করার আমার প্রয়োজন হয়নি। যেটা নিয়ে এসেছি, সেটা আমি মালিকানা স্বত্বে পেয়েছি -এমনি মালিক হিসাবে। আমার তো ছাড়াছাড়ির বালাই নেই। দূর থেকে দেখলাম, - ফোর্সের জবাবটা দিয়ে দিলাম।'

সাধক – তুমি সাংঘাতিক তো! তোমার মধ্যে কতটা আছে, কোন সীমানায় আছে, তুমি বোঝ? তুমি কি উপলব্ধি করো যে তোমার এইরকম শক্তি আছে?

ঠাকুর – উপলব্ধি করার চিন্তা আমার নেই। যে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছি, আমি সেটার এতটুকুনু ব্যবহার করি; কিন্তু যে মাটি দিয়ে হাঁটছি - সেই মাটিটা

তো বিরাট! যে বাতাসটুকু নিই, কতটুকু আর যায়, বাতাস তো বিরাট। যে ক্ষমতা নিয়ে আমি চলি – সেই ক্ষমতাটার সাধারণ একটুমাত্র নিয়ে চলি। যে ক্ষমতার উপর দিয়ে চলি, সেই ক্ষমতার ভাণ্ডারটা তো বড় – সেটা একটা ব্যাঙ্ক-একাউন্টের মত সীমাবদ্ধ নয়। সীমাবদ্ধ থাকলে সীমায় বোঝা যায় যে, এত সংখ্যায় রয়েছে। কত সংখ্যা আছে, সেটা আমি দেখিও নি, দেখার চেষ্টাও করিনি – বুঝিও নি, বোঝার প্রয়োজনও বোধ করিনি।

সাধক – তোমার যদি চেক কাটতে হয়, কতবড় চেক কাটতে পার? যদি একটা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হও, তুমি কি করে চেক কাটতে পারবে? জানা থাকলে তবে তো চেক সেইভাবে কাটবে?

ঠাকুর – সেটা আমি যখন বুঝবো যে জমির দাম এত লক্ষ টাকা – আমার তো জানাই আছে – ভাণ্ডার আছে বলেই আমি সেইমত কাটতে পারবো। চলছি – আমার গতিবিধি দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সেটা আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার, বিরাট ভাণ্ডার। ভাণ্ডার আছে বলেই, চেক আমি সেইমত কাটতে পারবো। সেটা কত সংখ্যা হবে বলতে পারবো না। সেটা যতই আমি কাটবো, আমার সংখ্যা কমবে না, আমার বরাদ্দ থেকে নড়বে না। তোমরা যেভাবে কাটতে চাও বা কাটো, সেটা তোমাদের বরাদ্দ থেকে যেমন নড়ে যাবে, আমার বরাদ্দ থেকে তেমন নড়বে না, সেটা আমি জানি।

সাধক – না, তোমার অনেক আছে। এক জীবনে উপার্জন করা সম্ভবপর নয়।

ঠাকুর – এক জীবনে, দুই জীবনে বুঝি না। জীবন মানুষের একটাই, শুধু ধাপে ধাপে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। একটাই জীবন – এর আর দুটো হয় না - একটা জীবনই বহুযুগ ধরে চলে।

সাধক – আমাদের পক্ষে কি করে সম্ভব ঐ অফুরন্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগে থাকা? তুমি কি করে এত পেলে! কি করে হ'ল?

ঠাকুর – আমার সবসময়ে নিজস্ব ধরনের চিন্তা থাকতো যে, - আমি যখন এসেছি, আমি যখন জন্ম নিয়েছি, আমি যখন ছিলাম বা যখন এলাম বা যখন যাব, আমি যে একটা ধারাতে আছি, যে গতি ধরে আছি, গতি হয়ে আছি, যে গতি নিয়েছি – একটা অফুরন্ত ভাণ্ডারের মধ্যে আছি। তার মালিক, উত্তরাধিকারী হিসাবে আমরাই হব, আমরাই আছি এবং সেটা যেন আমাদের 'উইল' করে দেওয়া আছে। কে করছে, না - করছে সে বিষয়ে আমি বলছি না। তবে আমাদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের দিক থেকে এমন 'উইল' করে দিয়েছে যে, আমরা সবটারই মালিকই বল সেবাইতই বল, বা যাই বল – আমাদের অধিকার রয়েছে প্রতি বস্তুতে, প্রতি কাজে।

ক্ষমতার বেলাতেও তাই। ক্ষমতার দিক দিয়েও ঠিক তাই। সুতরাং আমার মনের দিক থেকে আমি জানি যে, আমাতেই সব আছে এবং সবটাতেই আমি

আছি। এটা আমার জানা, গাঁথা। সেখানে প্রয়োজনবোধে কোথায় কতটা কি করতে পারবো না-পারবো, করবো না-করবো, সেটা আমি যখন কাজে নামবো, তখনই সেটা বুঝে নিতে পারবো – কতটা কি আছে, কতটা দেওয়া যাবে।

সাধক – তাহলে সূর্য পর্যন্ত তুমি অনায়াসে শক্তি প্রয়োগ করতে পার?

ঠাকুর – সূর্যটা তো আমার কাছে জোনাকি পোকা। আমার শক্তির কাছে সূর্য একটা জোনাকি।

সাধক – কি করে সম্ভব?

ঠাকুর – কেন সম্ভব হবে না? শক্তিটা তো যে গাছের বীজ, সেই গাছের চেহারা নেবে, সেই গাছেরই ফলফুল হবে, সেই অনুযায়ী ক্ষমতাশালী হবে। সুতরাং আমরা যে গাছের বীজ, তার কাছে তো চন্দ্র সূর্য শিশু, শিশু বললেও বড় বলা হয়।

সাধক – তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই সেটা আছে?

ঠাকুর – হ্যাঁ, সেটা প্রত্যেকেরই রয়েছে। দুঃখের বিষয় হ'ল, সাগরে যে মাছ ডুবে থাকে সে বোঝে না সাগরের পরিধিটা কত বড়। সে তো ডুবে ডুবেই চলেছে, সেটা যে বিরাট, তা তার বুঝতে সময় নেয়। কিন্তু সময় লাগলেও সে জানে 'ঐ গতির পথ আমাদের, ঐ সহজ গতির পথ আমাদের। যতই আমি চলি না কেন, সেই হিসাবে আমার গতির পথও সহজ। যতদূরেই যাই,

যতদূরেই চলি সবটাই যেন আমাদের জন্য রয়েছে।' - সেখান থেকে যদি নদীর মধ্যে ঢুকে পড়ে, যখন নদীর মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন ধাক্কা খাচ্ছে। নদীর থেকে যখন খালে ঢুকে পড়ে, তখন আরও ধাক্কা খাচ্ছে। তখন তার মধ্যে একটা সমস্যা জাগে, 'ধাক্কা খাচ্ছি কেন? এ তো আগে খাইনি!' তোমাদের চলার পথে সেই রকম এত সংস্কার, বাধা-বাঁধুনির বাঁধ রয়েছে, বাঁধে ধাক্কা খাচ্ছ, বাঁধ পেরিয়ে যেতে পারছো না। যেতে পারনি বলে তোমাদের চিন্তাধারা সীমিত, 'এইটুকুই বুঝি ক্ষমতার শেষ পর্যায়!' তোমরা শেষ পর্যায় বললেও নিজেদের ক্ষমতায় নিজেরাই বুঝতে পারছো যে, আরো ক্ষমতা অর্জন হয়, যদি আমরা সেই মতে চলি। - এখন আমরা এই মতে চলছি।

লামা সন্ন্যাসী অভিভূত হয়ে বললো – আমরা তো ওই ধরনের কথা শুনি নি! যে ভাবে বলছ, সে ভাবে তো তৈরী হই নি! সে রকম তৈরী নই।

ঠাকুর – তোমরা কি করে তৈরী হবে? তুমি পরিশ্রম করে উপার্জন ক'রছ, উপার্জন করে তুমি সঞ্চয় ক'রছ। আমি খনিতে আছি, সুতরাং বস্তু আমার হাতে। আমি বস্তু খনন করছি, বস্তু আমি ঢেলে দিচ্ছি। সেই বস্তু তোমরা উপার্জনের মাধ্যমে নিয়ে নিচ্ছ। সুতরাং দুটোর মধ্যে পার্থক্য তো থাকবেই। তুমিও সেই অধিকারে রয়েছ, নইলে বস্তু তোমরা কেন পেলে? – বস্তু তুমিও নিয়েছ। এক একজন ছোট ছোট জমিদার, তালুকদার, রাজা – ওগুলো নিয়ে নিয়েই হয়েছে। আমাদের দেশের রাজা মানে

হচ্ছে, বহুজনের থেকে উপার্জন করে করে সংগ্রহ করে এক একজন রাজা হয়েছে।.....

তারপর ঠাকুর বললেন, “এরকম ধাক্কাধাক্কি করতে গেলে কেন? তোমার তো এরকম ‘শক্তি’ ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি।”

সাধক - আমি তো দেখতে চেয়েছিলাম! (বালক ঠাকুর সত্যিই মহাপুরুষ কিনা, বিরাট শক্তির অধিকারী কিনা দেখতে চেয়েছিল, দেখতে গিয়েই আটকে পড়েছে।)

ঠাকুর – আমি হলে তো এরকম মারতাম না। শক্তি ছেড়েছো বলে একটু উত্তর না দিলে অভদ্রতা হয়, সেইজন্য উত্তরটা দিলাম। ... ...

অনেকেই সেখানে আত্মনিবেদন করে বালক ঠাকুরের কাছ থেকে উপদেশ-নির্দেশ নিলেন। বালক ঠাকুরও মুক্তহস্তে ওই সরল মানুষদের ঢেলে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই দার্জিলিং ফিরে এলেন। লামা পরিবার কিছুতেই ঠাকুরকে ছাড়তে চায় না। প্রায় একমাস হতে চললো বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, স্কুল কামাই হবে। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন সেবার, কথা দিয়ে এলেন, ‘আবার আমি আসব।’ লামাদের আলখাল্লা আর টুপীর মত পোষাক ওরা ঠাকুরের জন্য করে দিয়েছিলো; ওই পোষাক আর কেডস জুতো পরে পাহাড় অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। পার্বতীপুর ষ্টেশনে পৌঁছে টিকিট ক'রবার মত পয়সা আর হাতে নেই। ট্রেনের কামরায় ঠাকুর আর তাঁর সাথী উঠে বসলেন। কিন্তু টিকিট-চেকার এসে নামিয়ে দিল। কি করবেন, মনের দুঃখে দু-জনে প্লাটফর্মের গাছতলায় একটি বেঞ্চে বসে রইলেন। এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে, গার্ড সিগন্যাল দিয়েছে হুইসিল বাজিয়ে, ট্রেন ছাড়তে চেষ্টা করে। কিন্তু ট্রেন এক ইঞ্চিও নড়ে না। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও ট্রেন কিছুতেই নাড়ানো গেল না। আর একটা ইঞ্জিন আনা হ'ল, দুটো ইঞ্জিনে চেষ্টা করলো - কিন্তু একই অবস্থা। বেশ হট্টগোল চলছে - গার্ড, ষ্টেশনমাষ্টার, অন্যান্য রেলকর্মীরা শলাপরামর্শ করছে। এমন সময় একজন যাত্রী বললো, "ওই যে সুন্দর ছেলেটি বেঞ্চে বসে আছে, ও-ই নিশ্চয় কিছু করেছে। ট্রেনের কামরায় হাত দিয়ে ওকে বলতে শুনেছি, আমাদের ফেলে যাস না।" সকলেই তখন বালক ঠাকুরের কাছে ছুটলো - গার্ড, স্টেশনমাস্টার সকলেই অনুরোধ করলো ট্রেনটা ছেড়ে দিতে। বালক সরলভাবে বললেন, 'বা রে! ট্রেন চলে গেলে আমরা যাব কি করে?' তারা তখন তাঁকে সসম্মানে নিয়ে ট্রেনের একটি ফার্স্টক্লাস কামরায় তুলে দিল। এবার একবারের চেষ্টাই ট্রেন চলতে শুরু করলো। পরের ষ্টেশনে বালক ঠাকুরকে দেখার জন্য তাঁর কামরায় লোক ভেঙে পড়লো। অনেকেই দীক্ষালাভ করে জীবন সার্থক করলো

[এই ঘটনা 'পার্বতীপুর টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল]।

।। চোদ্দ ।।

বছর ঘুরে এল। ক্লাস ফোর থেকে প্রমোশন পেয়ে ক্লাস ফাইভে উঠেছেন। অভাবের সংসার - পিতা যা যৎসামান্য আয় করেন তাতে সংসার চালানো-ই কষ্ট। নিয়মিত স্কুলের মাইনে দিতে পারে না, নাম কাটা যায় - তবু পিতাকে কিছু বলেন না, বন্ধু-বান্ধবেরা জানে না, মাস্টার মশাইদেরও বালকের দারিদ্র্য সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। নাম কাটা গেলে স্কুলে যান না, স্কুলে যাওয়ার পথে কুল গাছের নীচে বসে থাকেন, ছেলেদের কাছ থেকে পড়া জেনে নে'ন আর ওদের বই থেকে ওখানেই পড়া তৈরী করে নে'ন। একখানা কাপড়, একটা জামা - তাই রোজ ধুয়ে ধুয়ে পরেন; ঘটিতে গরম কয়লা দিয়ে ইস্ত্রি করে নে'ন। সবাই দেখে তাঁর জামা-কাপড় ধোপদুরস্ত। কী করে বুঝবে কি নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্য দিয়ে তিনি চলেছেন? ঘনিষ্ঠ সহপাঠী মান্না মিঞা – সেও জানে না। তার বাবা বিরাট ধনী, বালক ঠাকুরকে ছেলের থেকেও বেশী ভালবাসেন, বলেন, 'নিজেকে যতটা না বিশ্বাস করতে পারি, তার চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি বালককে – ও Angel, খোদার পয়গম্বর।' সিন্দুকের চাবি বালকের হাতে দিয়ে দেন, বলেন, 'খুলে যত খুশী নিয়ে নেও'। হাজার হাজার টাকা থাকে-থাকে সাজানো। মান্না মিঞা

এসে ধরে, বালক ওকে দু'এক টাকা দেন, কিন্তু নিজে চার আনার বেশী নে'ন না। না নিলে পিতৃতুল্য ওই মুসলমান ভদ্রলোকের মনে আঘাত লাগবে, তাই তিনি চার আনা পয়সা নে'ন। এদিকে যখন ঢাকায় যান, এক ভক্ত তাঁকে ঢাকেশ্বরী মিলস্ থেকে কাপড় এনে দেন, তিনি ছেলে-মেয়েদের হোস্টেলে গিয়ে গিয়ে বিক্রী করে আসেন। দাম জিজ্ঞেস করলে তিনি কেনা দাম বলে দেন - তারপর যে যা লাভ দেয় তাই সাদরে গ্রহণ করেন। ছেলেদের হোস্টেলে একদিন ছেলেরা ধরলো – কেন তিনি এভাবে কাপড় বিক্রী করেন। বালক বলেন যে তিনি খেটে খেতে ভালবাসেন। কাপড়ের বোঝা নিয়ে দুই তিন মাইল পথ হেঁটে যান - কখনও বা আরও দূরে যান যেখানে তাঁকে কেউ চেনে না। মাঝে মাঝে জানাজানি হয়ে গেলে তিনি বলতে নিষেধ করে দেন, কারণ চেনা লোক বেশী পয়সা দিয়ে দেবে। এইভাবে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কাটে।

এদিকে ভক্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে- অনেক দূর দেশ থেকে ভক্ত-শিষ্যরা আসছে। তাদের খাবার ব্যবস্থা তো করতে হবে। ঠাকুরের মা রান্না করেন। উঠানে পাতা পেতে তাদের ডাল-ভাত যা জোটে খাওয়ানো হয়। ভক্তেরা খেয়ে পাতা রেখে দিয়েই উঠে যায়, ভাবে পাতা পরিষ্কার করার জন্য ঠাকুরবাড়ীতে নিশ্চয়ই লোক আছে। মাতা চারুশীলা খুবই নিষ্ঠাবতী। বাইরের কাজ করার মত লোক নেই, অগত্যা বালক ঠাকুরকেই পাতা ফেলে দিয়ে

উঠানে গোবর ছিটা দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। নিজে গামছা পরে এই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করেন। তারপর স্নান করে তিনি হাসিমুখে ভক্তদের দর্শন দেন। এটা প্রায় তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কাজে দাঁড়িয়েছিল। কেউ হয়তো এই কথা কোনোদিন জানতেও পারতো না, যদি না একদিন এক ভক্ত কি একটা ফেলে গেছে দেখে সেটা খুঁজতে ভিতরে না যে'ত। বালক ঠাকুরকে গামছা পরে তাদের পাত পরিষ্কার করতে দেখে জিভে কামড় দিয়ে অলক্ষ্যে বেরিয়ে এল। নিজেদের অপরাধের কথা চিন্তা করে অশ্রু তার বাধা মানে না। কি দেখে এল - সবাইকে জানিয়ে দিল। তারপর থেকে আর কেউ পাত পরিষ্কার না করে যায় না। ঠাকুর কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেননি যে, এতদিন তিনি ভক্তের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে এসেছেন। তিনি নির্বিকার, সদাহাস্যময়। কোন বিরক্তির ছাপ নেই, মান-অপমানের বালাই নেই।

শ্রীকৃষ্ণ একবার অতিথি আপ্যায়নে মন দিলেন। যে আসছে অভ্যাগত হয়ে, তারই পা ধুয়ে দিচ্ছেন। অভ্যাগতদের বিরাট লাইন পড়ে গেছে। একে একে সবাই কৃষ্ণের সেবা গ্রহণ করছে! মহর্ষি নারদ ব্যাপারটা না বুঝেই লাইনে দাঁড়িয়ে গেছেন। পরে যখন জানতে পারলেন শ্রীকৃষ্ণ সকলের পা ধুয়ে দিচ্ছেন, নারদ জিভে কামড় দিয়ে বেরিয়ে এলেন লাইন থেকে। শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, কয়জনকে রসাতলে পাঠালে?" শ্রীকৃষ্ণ জবাব দিলেন, "ছিঃ নারদ, ও

কথা বলতে নেই। একমাত্র মা-ই পারেন সন্তানের সেবা করতে।” ঠাকুরও সেইভাবেই ভক্তদের সেবা করে যাচ্ছেন - কিন্তু ন্যায়ের দণ্ড নিয়ে যিনি বসে আছেন, সেই বিবেক কিন্তু কাউকে রেহাই দেন না।

একবার কৃষ্ণনগরের কাছারীর সবাই আলোচনা করলেন যে, তাঁরা বালকের কথা চারিদিকে এত শুনছেন, কিন্তু নিজেরা তেমন কিছু বলতে পারেন না। যা বলেন, সবই শোনা কথা। ঠাকুরের শিক্ষক প্রকাশ বল বললেন, ‘হ্যাঁ ঠিকই। ত্রৈলোক্য সোম আছেন, আশু সেন আছেন, ভুবনবাবু আছেন। আমরা সবাই কিছু জানতে চাই।’ কাছারী ঘর ভরে গেল - বেলা পাঁচটা বাজে। হাজি মিঞা, জিন্নত আলি, হরিচরণ, অনুকূল, নিবারণ দত্ত আরও অনেকে উপস্থিত।

ওঁরা কি চান বুঝতে পেরে ঠাকুর বললেন, “আপনারা যা চান তাই পাবেন।” ওঁরা কেউ কিছু ঠিক করতে পারছেন না বলে ঠাকুর ত্রৈলোক্য সোমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “আচ্ছা জ্যেঠামশাই, আপনার জামাই তো থাকেন নারায়ণগঞ্জ, চাষাড়াতে। আমি এখানে বসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আসি গিয়ে। নারায়ণগঞ্জ তো এখান থেকে ৩০ মাইল প্রায়, হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়, মাঝে তিতাস, মেঘনা, শীতলাক্ষ্যা – তিনটে নদী পড়ে। ‘গয়না’তে গেলেও আজ রাতে গেলে কাল ভোরে গিয়ে পৌঁছবেন। আমি যদি এখনই সেখান থেকে ঘুরে আসি – কি বলেন?” সবাই সমর্থন করে বললেন, “অতি উত্তম

প্রস্তাব।” ঠাকুর বললেন, “ঠিক আছে, আমি বসি। আপনারাও বসুন। কথা বলতে বলতে আমি যাব। আমার কথা শুনে আপনারা বুঝতে পারবেন ওঁরা কি বলছেন। পাঁচটা মিনিট আমি চোখ বুজে থাকব - এই এখনই আমি যাব - গিয়ে আপনার মেয়ে ‘টুলিদি’র সঙ্গে কথা ব’লব, আর বাড়ীতে যে যে থাকে তাদের সঙ্গে কথা ব’লব। আমি এক গ্লাস জল খেয়ে আসব, কিন্তু ওখানে থাকব না। আমি যা যা ক’রব, আপনাদের আগেই জানিয়ে দিলাম।” কয়েক মিনিট চুপ করে থেকেই ঠাকুর বলছেন, “টুলিদি, কেমন আছ? এই যে জামাইবাবু, কেমন আছেন?” ঠাকুর টুলিদির কাছে এক গ্লাস জল চাইলেন। মিষ্টি খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ঠাকুর একটা বাতাসা খেলেন, তারপর জল খেলেন। জল যে খাচ্ছেন, সেই শব্দ সকলেই শুনতে পাচ্ছেন। ঠাকুর একটা কাগজ চাইলেন। তাতে নাম লিখে সই করে এলেন ‘শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী - ১১ই আশ্বিন, ১৩৪০ (১৯৩৩)।’ কাগজটা ‘টুলিদি’র হাতে দিয়ে রেখে দিতে বললেন। টুলিদি তাঁকে খেয়ে যেতে বললেন। ঠাকুর বললেন যে, বিশেষ একটা কাজে তিনি এসেছেন, তাড়াতাড়ি তাঁকে ফিরে যেতে হবে। ঠাকুরের কথা শুনে উজানচর কাছারীতে উপস্থিত সকলেই বুঝলেন যে ঠাকুর ঠিকই নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলেন। নায়েবমশাই ত্রৈলোক্য সোম তখনই একটা চিঠি লিখে হরিচরণকে নারায়ণগঞ্জে পাঠালেন। হরিচরণ গিয়ে শুনলো যে, গতকাল সাড়ে পাঁচটায় ঠাকুর এসেছিলেন। তাঁর

বিশেষ তাড়া ছিল, সুতরাং কিছু খেলেন না, শুধু একটা বাতাসা আর এক গ্লাস জল খেলেন আর কাগজে কি যেন লিখে গেলেন। হরিচরণ তো সব শুনে মূৰ্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম। তারপর টুলিদিকে জানালো যে, ওই সময়ে ঠাকুর কাছারী ঘরে বসেছিলেন এবং যে সমস্ত কথা নারায়ণগঞ্জে ঠাকুর বলেছেন তা তারা সবাই শুনেছে, শুধু টুলিদিদের উত্তর শুনতে পায়নি।

সকলেই হতবাক – এ কি করে সম্ভব! প্রকাশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বললেন, ‘আপনারা জানতে চাইলেন, তাই অণিমাই দেখালাম। খুব দ্রুতগতিতে মনন করে আমি গর্ভে, খাদ্যে, বাতাসে, আলোতে, বিদ্যুতে চলে গেলাম। তখন আমার সাংঘাতিক মনের গতি – এক সেকেন্ডের মধ্যে চলে গেলাম নারায়ণগঞ্জে। কথাবার্তা বলে, জল খেয়ে ফিরে এলাম। ওখানে গিয়ে একই পদ্ধতিতে দেহধারণ করে ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এলাম।’

সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন, ‘উনি মানুষ না, উনি ভগবান!’

শিশুবয়স থেকেই স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায় বালক ঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে, কারণ তাঁর সংস্কারমুক্ত বাণী এবং তথাকথিত গুরু-মহানদের শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ অনেকেরই অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। ঠাকুর ঢাকায় এসেছেন কয়েকদিনের জন্য। খবর পেয়ে বহু লোক সাক্ষাৎ করতে আসছে -

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কেউ বাদ নেই। রাস্তায় কয়েকটি যুবকের সঙ্গে এক ভক্তের দেখা। যুবকেরা ভক্তকে জিজ্ঞেস করলো, 'শুনলাম এখানে কে এক ঠাকুর এসেছে, বহু মেয়ে নিয়ে থাকে। আশেপাশের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।' কথায় কথায় ভক্তটির সঙ্গে তর্ক বেধে গেল। একজন বলে উঠলো, 'বহু মেয়ে যায়, এই তো ব্যবসা।' ভক্তটি দেখলো ওদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ হবে না, ওরা না জেনে নানারকম মন্তব্য করছে। তাই বললো, 'আপনারা একদিন যাবেন, গিয়ে দেখে আসবেন।' তারা বললো, 'আজই আমরা যাব, গিয়ে দেখবো - এসব অনাচার সহ্য করবো না।' কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন যুবক ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত। দূর থেকে ঠাকুরকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, 'আরে! এ যে দেখছি একেবারে বাচ্চা, জানতাম না তো এত অল্প বয়স!' তখন এক ভক্ত বলে উঠলেন, 'বদনাম তো আগেই রটিয়েছেন।' ওরা বলে, 'বয়সটা তো জানতাম না, - লোকের মুখে শোনা কথা।' ঠাকুর ওদের ডাকলেন এবং ওদের ঘরবাড়ী সম্বন্ধে আলাপ করলেন। এক ভক্ত বললো, 'ঠাকুর, ওরা খুব বদনাম শুনেছিল, তাই তোমাকে দেখতে এসেছে।'

ঠাকুর ওদের বললেন, 'বদনামই তোমাদের বহন করে নিয়ে এল, সুতরাং এরও প্রয়োজন আছে। একটা বোঝা তো সাথে আছে। যে সমস্যা নিয়ে এসেছিলে, সেটাকে কি বাড়িয়ে নিয়ে গেলে, না সমাধানে এলে?'

- 'আমরা একটা ভুল শুনেছিলাম, এসে দেখি একেবারে উল্টো। মনের সন্দেহ মেটাবার জন্যই এসেছিলাম', তারা উত্তর দেয়।

- "শুনে কিংবা জেনে, প্রকৃত ব্যাপারটি জানতে ইচ্ছুক হয়ে যে এসেছ, তাতেই আমি খুশী হ'লাম এবং প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে এটাই নিয়ম। হঠাৎ শুনেই মন্তব্য না করে, এসে জেনে যা হয় মন্তব্য করুক, সেটাই ভাল। এই যে বদনাম শুনে তোমরা এসেছ, তোমরা তো এসে বুঝে গেলে, কিন্তু যাদের যাদের বলে আসা হয়েছে, ওরা তো ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। বদনাম দেওয়ার জন্য আগ্রহ যতটা থাকে, পরে সংশোধন করিয়ে দেওয়ার জন্য তেমন আগ্রহ থাকে না" - ঠাকুর বললেন [শ্রীবীরেন্দ্র বাণীতে এই ঘটনাটি কৃষ্ণনগরে ঘটেছে বলে ভুল করে বলা হয়েছে। কৃষ্ণনগরে ঠাকুর শিশু অবস্থা থেকে ছিলেন এবং সেখানকার পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। এই ঘটনাটি ঢাকায় ঘটেছিল - ঠাকুর তখন কিছুদিনের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন] ।

এর মধ্যে একজন এক কলসী দুধ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। ঠাকুর ওকে ডাকলেন। সে দুধ সামনে রেখে প্রণাম করে বসলো। ঠাকুর বললেন, "একটা গ্লাস নিয়ে এস, সবাইকে এক এক গ্লাস করে দুধ খাইয়ে দাও।" সবাইকে এক এক গ্লাস করে দুধ দেওয়ার মত অত দুধ ছিল না। ঠাকুর বললেন, "তোমরা গরম দুধ খেতে ভালবাস, না ঠাণ্ডা বরফের মত দুধ খেতে

ভালবাস?” উত্তরে কেউ বললো গরম, কেউ বললো ঠাণ্ডা। ঠাকুর বললেন, “বেশ, গ্লাস নেওয়ার সময় বলবে কে গরম আর কে ঠাণ্ডা খাবে। আমার কাছে উনুনও আছে, ঠাণ্ডা করার পাত্রও আছে, সুতরাং দুইই দেওয়া যাবে।” আগন্তুক যুবকদের মধ্যে একজনকে ডেকে বললেন, “তুমি না হয় দুধ বিতরণ কর। এবার তোমায় দেখবো তোমার দেওয়ার মত ক্ষমতা আছে কিনা, প্রত্যেকের আনন্দে তুমি আনন্দিত হও কিনা। যে খেতে জানে সে খাওয়াতেও জানে। নিজের খাওয়ার চেয়েও অনেকে আছে অন্যকে খাইয়ে তৃপ্তি বেশী পায়। তোমাকে দেখবো, তুমি খাইয়ে তৃপ্তি পাও কিনা?” যে যার ইচ্ছামত ‘গরম খাবো’, ‘ঠাণ্ডা খাবো’ বলে যেতে লাগলো, আর যুবকটি পরিবেশন ক’রতে লাগলো। যখন গরম দুধ চাইছে, গ্লাস এত গরম হয়ে যাচ্ছে যে হাতে রাখা যাচ্ছে না, আবার যখন ঠাণ্ডা দুধ চাইছে, গ্লাস এত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে ধরতে পারছে না।

ঠাকুর মুচকি মুচকি হাসছেন আর বলছেন, “তোমরা চাইতে পারছো, আর সহ্য করতে পারছো না? চাওয়াকে পাকা কর। তখন উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত মতে সব আসবে, তখন সহ্য-ক্ষমতা ও ধৈর্য্য-ক্ষমতা স্বাভাবিক মতে পাবে। গুণকে যদি বিরক্ততায় ধরে নেও, সে তোমার নির্গুণতার জন্য তো? গরম সহ্য করতে পারছো না, গরমের উপর বিরক্ত। ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছো না, তার উপর বিরক্ত হয়ে গেলে। মন যদি সে-ভাবে তৈরী না

থাকে, তখন যে কোন সুন্দর বস্তুকেও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ তখনই আসে। একটুতেই অসহ্য, হতাশ, চিত্ত-চাঞ্চল্য, না বুঝে অপবাদ দেওয়া, অপমান করা, বুঝবার জন্য অনিচ্ছা - এই জাতীয় অবস্থাগুলো পাত্র তৈরী নয় বলে। এই পাত্র যখন তৈরী হয়, শক্তিশালী হয়, শক্তিতে আসে, তখন সবকিছু সহ্য করতে পারে, জেনে নিতে পারে, জানবার ইচ্ছা জাগে, হঠাৎ কোন মত প্রকাশ করে না, গুণের আদর তখনই হয়। .... তাই একটা জিনিস দেখলেই খুঁজতে চেষ্টা করবে, তখনই বুঝবে তার প্রকৃত রূপটি – তার জন্য নিজেকেও তৈরী হতে হবে।”

তারা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল, দীক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে সার্থক করলো।

দোগাছিতে মামার বাড়ী গেছেন। বাড়ীর পাশেই পুকুর। একজন আধার দিয়ে বড়শী ফেলে গেছে। রাত্রে একটা বেশ বড় বোয়াল মাছ আধার গিলে ছটফট করছে। তার দাপানি জলের মধ্যে বেশ শোনা যাচ্ছে। তখন প্রায় রাত তিনটে হবে। ঠাকুর সন্তোষ এবং আরও তিন চারজনকে নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেখলেন মাছটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগলো। বিরাট মাছ, চার পাঁচ জনে মাছটাকে তুলে ধরে বড়শীটা ধীরে ধীরে খুলে মাছটাকে ছেড়ে দেওয়া হ’ল। সকাল বেলা সে এসে শুনলো গোঁসাই মাছটাকে ছেড়ে দিয়েছেন। ঠাকুর তাকে ডেকে দেড় টাকা দিয়ে বললেন, ‘দেখ, মাছটার কষ্ট

সহ্য করতে পারছিলাম না, তাই ছেড়ে দিয়েছি। তোমার জন্য কষ্ট হচ্ছে – মাছটা তিন চার টাকায় বিক্রী করতে পারতে। আমার খারাপ লাগছে, তাই তোমাকে এই দেড় টাকা দিচ্ছি - এতে কিছুটা তোমার হবে।' লোকটি সন্ধ্যেবেলায় এসে হাজির। সারাদিন সে গোঁসাইয়ের কথা ভেবেছে; মাছটা খুবই কষ্ট পাচ্ছিল তাই গোঁসাই ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। সে নিজেও তো দেখেছে, গোঁসাই বাজারে গিয়ে জীয়ন্ত মাছ কিনে নদীতে ছেড়ে দেন। কাছিমগুলোকে নদীর জলে মুক্ত করে দেন। এতেই গোঁসাই তৃপ্তি পান। মানুষই হোক, জীবজন্তুই হোক, সবার ব্যথায় তিনি ব্যথিত এবং যথাসম্ভব প্রতিকার করতে এগিয়ে যান – পুণ্যলাভের আশায় নয়, অন্যের দুঃখ-কষ্টে তিনি ব্যথিত হন তাই। লোকটি বললো, 'এই নাও তোমার টাকা। এ টাকা আমি নিতে পারবো না। তুমি জোর করে দিয়ে দিয়েছিলে। আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আমি যে রকম ব্যথা পাই, ওরাও তেমনি ব্যথা পায়। শুধু আমার মত ওরা বলতে পারে না, মৃত্যু যন্ত্রণায় শুধু দাপাদাপি করে। মাছটার ব্যথায় অন্তরে তুমি আঘাত পেয়েছ তাই ছেড়ে দিয়েছ, সুতরাং এ টাকা আমি নিতে পারবো না।'

ভক্তেরা রোজ আসে দলে দলে। তাদের কীর্তনসভায় ঠাকুর যান। একদিন এইরকম কীর্তন চলছে। শচীন দাস প্রাণভরে কীর্তন করে চলেছে। হঠাৎ বালক ঠাকুর তাকে ডেকে বললেন, 'তুই শীগগীর দোকানে যা।' দ্বিরুক্তি না করে শচীন দাস দোকানে চলে গেল। গিয়ে

দেখে দোকানে চোর ঢুকেছে। হঠাৎ অসময়ে এসে পড়ায় চোর পালাবার সুযোগ পেল না, ধরা পড়ে গেল।

আরেক দিন রাঢ়িরখাল অনুকূল পালের বাড়ী যাবেন, কিন্তু বাড়ী তার চেনেন না ঠাকুর। শচীন দাস সঙ্গে আছে - সেও চেনে না। ইতিমধ্যে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামলো। শচীন ভাবছে, দুই আড়াই মাইল পথ একেবারে ভিজে যাবে। শুধু বৃষ্টি নয়, সাথে প্রচণ্ড ঝড়ও হচ্ছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি চলছে, তাদের পথটুকু শুধু শুকনো। বৃষ্টির কোন চিহ্ন নেই, গায়ে এক ফোঁটা জলও লাগছে না। রাঢ়িরখাল যখন তাঁরা পৌঁছলেন, রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে, - জল ভেঙে চলেছেন দুজনে - রাস্তা চেনেন না। কাউকে যে জিজ্ঞাসা করবেন তারও উপায় নেই। ঝড় জলে কেউ বেরোয় নি, দোকান-পাটও বন্ধ। আন্দাজেই রাস্তা দিয়ে চলেছেন। শেষে একটা বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন ভেবে তাঁরা ঢুকেছেন – দেখা গেল, সেইটেই অনুকূল পালের বাড়ী! সবাই আশ্চর্য হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলো, ‘কি করে চিনে এলে?’ ঠাকুর বললেন, ‘মনের টানেই টেনে এনেছে।’

মামা হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ পূজার সময়ে দেশের বাড়ীতে এসেছেন। আরও অনেক মামা, মাসি, তাঁদের ছেলেমেয়েরা এসেছেন। বালক ঠাকুরও পূজার ছুটিতে মামাবাড়ী গেছেন। মামাবাড়ীতেই ঠাকুরের যাতায়াতটা বেশী ছিল। যখন প্রয়োজন হ’ত দোগাছি থেকেই

মেদিনীমণ্ডলে যেতেন। মামা বালক ঠাকুরের ঐশী শক্তি সম্বন্ধে যে একেবারে জানতেন না তা নয়। পূজার সময় একবার নারায়ণের সোনার চূড়া পাওয়া যাচ্ছিলো না, তিনি বালককে বললেন। বালক সোজা গিয়ে পূজার ঘর থেকে চূড়াটি এনে মামার হাতে দিলেন। পূজার ঘরে এবং অন্যান্য জায়গায় ইতিপূর্বে পুরো একদিন ধরে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি। যাই হোক, লোকের মুখে আরও অদ্ভুত অদ্ভুত বিভূতির কথা শুনে তিনি বালককে একদিন পরখ করতে চাইলেন। নিজের ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে বসলেন, বালককে বললেন, ‘ঠাকুরঘরে লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তিকে শয়ান দিয়ে এসেছি। তুমি এনে আমার হাতে দেও।’ মামা বালককে স্পর্শ করে বসে আছেন। বালক ক্ষণিকের জন্য আলো নিভিয়ে দিতে বললেন। পর মুহূর্তে আবার আলো জ্বালতে বললেন। মামা অবাক হয়ে দেখলেন, বালকের হাতে লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি। দরজা খুলে হেরম্বনাথ ঠাকুরঘর পরীক্ষা করে গেলেন। তালা যেভাবে লাগিয়েছিলেন, সেই ভাবেই ঝুলছে। দরজা খুলে দেখেন লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি নেই। ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ভাগ্নেকে, ‘দরজা তো বন্ধ ছিল, কি করে ঢুকলে’?

অণিমা সিদ্ধি যাঁর স্বভাব-জাত, তাঁর পক্ষে দেওয়াল ভেদ করে যাওয়া কিছুই না। ঢাকায় মামার বাড়ীতে এসে যখন থাকতেন, তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল চিলেকোঠার ঘরটি। বাইরের লোক যখন বালকের ঐশী

শক্তি আর পরম তত্ত্বে অভিভূত হয়ে দলে দলে দীক্ষা নিচ্ছেন, ঋষিতুল্য সাধকেরা যখন তাঁর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে কৃতার্থ হচ্ছেন, তখনও আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে মায়ের দিকের অনেক আত্মীয়স্বজন বালক ঠাকুরকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে ইতস্ততঃ করেছেন।

একবার দোগাছি মামাবাড়ী থেকে কৃষ্ণনগর ফিরছেন। মাসীমা সঙ্গে ডালের বড়ি আর পকেটে একটা ছোট প্যাকেট দিয়ে দিয়েছেন। লঞ্চে করে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঠাকুর রওনা হয়েছেন, সঙ্গে আরও কয়েকজন সাথী। তিন নদীর মোহনায় পৌঁছে লঞ্চটি এক ভীষণ ঝড়ের মুখে পড়লো। অসহায় অবস্থা! যে যার ইষ্টনাম স্মরণ করতে লাগল। সারেঙ্গ বিপদ-ঘণ্টি বাজিয়ে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে যে, অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়, যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে, সুতরাং ‘লাইফ বয়া’ গুলোর কাছাকাছি যেন সবাই থাকেন। ঝড়ের ঝাপটায় সবাইকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। সারেঙ্গ সতর্ক করে দিচ্ছে - ‘আপনারা একদিকে যাবেন না, যে যেদিকে আছেন থাকুন।’ কে কার কথা শোনে। মৃত্যুর আসন্ন ছায়া এসে পড়েছে, কোন জিনিসের ‘পরে কারও আসক্তি নেই নিজেদের পোঁটলাগুলো জলে ফেলে দিতেও তারা রাজী, তবু যদি প্রাণে বাঁচে। - ভগবানের নাম শুরু হয়ে গেছে। চিৎকার করে কেউ ‘আল্লা’, কেউ ‘হরি’, কেউ ‘কালী’, কেউ ‘দুর্গা’ নাম করে চলেছে – কেউ নামাজ পড়ছে। - সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য! ঠাকুর চুপ করে বসে আছেন,

জলের ঝাপটায় জামা কাপড় ভিজে গেছে আর জামাটা নীল রঙে ভরে গেছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখেন, একটা নীলের প্যাকেট মাসীমা পকেটে দিয়ে দিয়েছেন। প্যাকেটটা ফেলে দিলেন। সাথীদের মাঝে মাঝে বলছেন, ‘দেখিস, আমার ডালের বড়িগুলো যেন ভিজে না যায়।’ ঠাকুরকে যারা চেনে না, ঠাকুরের কথায় তারা বিরক্ত হয়ে উঠছে – সবাই যেখানে মরতে চলেছে, ভগবানের নাম করছে, এই বালকটি শুধু ‘ডালের বড়ি’, ‘ডালের বড়ি’ করে চলেছে! ঠাকুর ওদের বিরক্তি দেখে একটু মুচকি হেসে বললেন, ‘আমি আবার কার নাম ক’রব? এখানে তো দেখছি মৃত্যুর ভয়ে সব সমজ্ঞানী হয়ে গেছে, কোন কিছুর ‘পর আর আসক্তি নেই দেখছি। মল, মূত্র - কোনটারই ভেদাভেদের প্রয়োজন আর নেই দেখছি। কাপড়ের ঠিক নেই – একটা ভয়েতেই সবাইকে নিঃস্বার্থ, ত্যাগী করে তুলেছে - সর্ব অবস্থায় এরকমটি হলে তো আর কথাই ছিল না।’ ঠাকুরের ভাল কথাও ওদের কানে তখন পৌঁছচ্ছে না। তারই মধ্যে ঠাকুরের কথা শুনে কয়েকজন এগিয়ে এল – তারা বালক ঠাকুরকে চিনতে পেরেছে। তারা এসে বালক ঠাকুরকে ধরলো – এই বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে; তিনিই একমাত্র বাঁচাতে পারেন। ঠাকুর একটু জল আনতে বললেন, তারপর একটু জল ছিটিয়ে দিলেন - সঙ্গে সঙ্গে আচমকা ঝড় থেমে গেল। এইভাবে আকস্মিকভাবে ঝড় থামিয়ে দিতে দেখে সবাই এসে ঠাকুরের পায়ে পড়তে লাগলো। ঠাকুর বললেন,

‘তোমরা সবাই মিলে নাম করছিলে, তার তো ফল একটু হবেই, আর আমিও একটু করেছি।’ আর কোন কথা বললেন না। লঞ্চ এসে ঘাটে ভীড়লো। সাথীদের নিয়ে ঠাকুর নেমে গেলেন।

বালক ঠাকুরের পিতা-মাতা দুজনেই রওনা হলেন ঢাকা অভিমুখে। ঢাকায় পৌঁছে দেখেন বাড়ীতে চিতা জ্বলছে। ‘মা’ ‘মা’ বলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন চারুশীলা দেবী। শুনেছিলেন মা অসুস্থ, বাড়ীতে পৌঁছে জানলেন, পিতা দেহত্যাগ করেছেন। অম্বিকানাথ স্নান করে, পূজায় বসেছিলেন। পূজা সমাপ্ত করে শেষ প্রণাম করলেন। এদিকে ছেলের বৌ ভাত বেড়ে বসে আছে, কিন্তু শেষ প্রণাম থেকে আর তিনি উঠলেন না। এইভাবে নিষ্ঠাবান এক মহান দেহরক্ষা করলেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর মামা বিষ্ণুদাস ঠাকুরের একাদশ উত্তর পুরুষ, অম্বিকানাথ বিদ্যাভূষণ। বালক ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বে তিনি, প্রতিবার যখনই কোন কন্যার গর্ভে পুত্র-সন্তান জন্ম নিত, ঐশী শক্তির সন্ধানে কন্যাদের জিজ্ঞাসা করতেন। কিন্তু যখন ঐশী শক্তির মূর্ত প্রতীক বালক ঠাকুর এ ধরায় অবতীর্ণ হলেন, তখন আর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হ’ল না। জন্মের অলৌকিকত্ব সবার মনে গিয়ে ধাক্কা দিল।

যাক সে কথা, নদীগর্ভ দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। ঘটনার পর ঘটনা ঘটে চলেছে বালক ঠাকুরের জীবনে। এত বেশী ঘটনা প্রতিদিন ঘটে চলেছে যে, একনিষ্ঠ ঐতিহাসিক, যিনি প্রতিটি রোজ-নামচা রাখতে

অভ্যস্ত এবং সেটাকেই যিনি তাঁর পরম কর্তব্য বলে চিন্তা করেন, তাঁর পক্ষেও সব ধরে রাখা সম্ভব নয়। বালক ঠাকুরের ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনী তাই সব ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

কথা প্রসঙ্গে বালক ঠাকুরের ত্রয়োদশ জন্মোৎসবের একটি অপূর্ব কাহিনী বলা হচ্ছে। বাস্তবে ঘটনার মাধ্যমে কী ভাবে তিনি শিক্ষা দিয়ে চলেছেন, এটা তারই এক বিস্ময়কর কাহিনী। বিক্রমপুরের এক গ্রামে তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিরাট আয়োজন হয়েছে – বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। উঠানে পাত পেতে সবাইকে খাওয়ানো হচ্ছে। আর একটি সাজানো মণ্ডপে বালক ঠাকুরের ছবি বসিয়ে যথারীতি পূজা করা হয়েছে।

এদিকে বালক ঠাকুর মাথায় পাগড়ি বেঁধে কয়েকটি সাথীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে উপস্থিত। এমনভাবে পাগড়ি বেঁধেছেন যে কারোরই তাঁকে চিনবার উপায় নেই। সাথীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছেই একজন কর্মীকে বললেন, 'আমাদের একটু তাড়াতাড়ি আছে। আমাদের বসিয়ে দিন।' কর্মীটি বললেন, 'যে যেখানে পারে বসে যান।' দ্বিরুক্তি না করে ঠাকুর তাঁর সাথীদের নিয়ে উঠানেই বসে পড়লেন। জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সবাইকে খিচুড়ি, লাবড়া আর বেগুনভাজা খাওয়ানো হচ্ছে। খেতে বসে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের ঠাকুর কোথায়?' ছেলেটি উত্তর দিল, 'ওখানে যাওয়া যাবে না – ভীষণ ভীড় হয়েছে।' ঠাকুর পরিবেশনকারীকে বললেন, 'আর একটা

বেগুন ভাজা দিন না!' উত্তর এল, 'আর দেওয়া যাবে না, প্রত্যেকের জন্য একটা করে ধরা হয়েছে, সুতরাং আর দেওয়া সম্ভব নয়।'

পাঁচ ছয়বার অনুরোধ করেও কোন ফল হ'ল না। একজন শিষ্যও অনুরোধ করলো, 'বাচ্চা ছেলে চাইছে, দিন না একটা বেগুনভাজা – বড়দের একজনকে বরং নাই দিলেন।' পরিবেশনকারী কিন্তু অটল। কারোর কথায় সে কর্ণপাত করলো না। ঠাকুরের সাথের ছেলেরা তো অবাক - যার উপলক্ষ্যে উৎসব, তিনিই একটা বেগুন ভাজা চেয়ে পাচ্ছেন না!

ঠাকুর আবার সেই পরিবেশনকারীকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, আপনাদের ঠাকুরের বয়স কত হবে?" উত্তর এল, 'তেরো-চোদ্দ বছর হবে।'

ঠাকুর বললেন, 'আমার বয়সও তো তেরো-চোদ্দ বছর। সেই হিসাবেও তো আমাকে একটা বেগুনভাজা দেওয়া উচিত।' কিন্তু কে কার কথা শোনে! খিচুড়ি লাবড়া দিয়ে শেষ করে সবাই উঠে পড়লেন।

যাবার সময় ঠাকুর একটা কাগজে লিখলেন, "এসেছিলাম। খুব খুশী হয়েছি। একটা বেগুনভাজা চেয়েছিলাম। রবীনও বলেছিল- কিন্তু দিল না। তবু আমি খুশী হয়েছি।" বালতি হাতে একটি ছেলে পরিবেশন করছিল। তাকে এককোণে ডেকে নিয়ে, কাগজটা ভাঁজ করে তার হাতে দিয়ে ঠাকুর বললেন, 'যেখানে জন্মোৎসব চলছে, ওইখানে এই চিঠিটা দিয়ে দেবেন।' আর দেরি না

করে সাথীদের নিয়ে ঠাকুর বেরিয়ে পড়লেন। উৎসবের মণ্ডপে গিয়ে ছেলেটি চিঠিটি খুলে পড়েই ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেল আর অস্ফুটস্বরে 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' করতে লাগলো। সবাই যখন জানতে পারলো ব্যাপারটা, চারদিকে ঠাকুরকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ঠাকুর স্থূলদেহেই এসেছিলেন না চিন্ময়দেহে এসেছিলেন, তা অবশ্য তখন কেউ চিন্তা করে নি। এইভাবে মাঝে মাঝে তিনি ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে রগড় করতেন এবং সাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দিতেন। সেই থেকে উদ্যোক্তারা বেগুনভাজা খাওয়া বন্ধ করে দিলেন, জন্মোৎসবেও আর বেগুনভাজা করতেন না।

একদিন ভক্তেরা শোভাযাত্রা করে বালক ঠাকুরকে নিয়ে যাচ্ছে বাগবারীর এক বাড়ীতে [বাগবাড়ী অরবিন্দ রায়চোধুরী, বেণুভূষণ রায়চৌধুরীর বাড়ী। এরপর থেকে সেই বাড়ীতে আর কোন অঘটন বা বিপর্যয় ঘটে নি]। কীর্তন খুব জমে উঠেছে, ভক্তেরা আনন্দে নাচতে নাচতে ঠাকুরকে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ একটা বাড়ীর কাছে এসে ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন। বাড়ীর লোকেরা এগিয়ে এসে প্রণাম করলো। ঠাকুর শান্তভাবে বললেন, "খুব বিপর্যয় চলছে, না?" তারা বলে, "হ্যাঁ ঠাকুর, ভাল কিছু হতে চায় না। যা করতে চাই, তাতেই কেমন একটা ভজঘট বেধে যায়। যেখানে সফলতা নিশ্চিত, সেখানেও এমন একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে, সব বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর, আমাদের বাড়ীতে একটু

পদার্পণ করুন।” ঠাকুরকে ধরে – ওদের বাড়ীর দোষটা কাটিয়ে দিতে হবে। অনেক সাধ্য-সাধনার পর ঠাকুর ওদের বাড়ীতে পদার্পণ করতে রাজী হলেন।

ঠাকুরের নির্দেশ মত উঠানে একটা আসন পাতা হয়েছে - সামনে এক বালতি জল রাখা হয়েছে। এক গাছি দড়ি দিয়ে বাড়ীটাকে বেষ্টন করে দড়ির মুখ দুটো জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হ’ল। ঠাকুর আসনে বসে বাড়ীর সবাইকে বাড়ীর ভিতরে দরজা - জানলা বন্ধ করে বসে থাকতে বললেন। ভক্তেরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে কি হয় দেখতে - সবারই মনে একটা অজানা আতঙ্ক।

এদিকে বালতির জল রীতিমত ফুটতে আরম্ভ করেছে। শোনা গেল কাকে যেন ঠাকুর বলছেন, “তুই এখানে কি করছিস? তোর এখানে থাকার কি প্রয়োজন?” মিহি গলায় কে যেন উত্তর দিল, “কোথায় যাবো? আমার যাবার তো কোন জায়গা নেই।” ঠাকুর বললেন, “তুই এখানে থেকে ওদের ক্ষতি করে চলেছিস। তোর এখানে থাকা চলবে না। আমি তোর জন্য একটা স্থান করে দিচ্ছি, সেখানে চলে যা।” উত্তর এল, “আচ্ছা যাচ্ছি, পূবের দিকের বড় গাছটার ডাল ভেঙে দিয়ে যাবো।”

কিছুক্ষণের মধ্যে অকারণে মড় মড় করে গাছের ডালটা ভেঙে পড়লো। ভক্তেরা আশ্চর্য হয়ে সব দেখলো। এবার ঠাকুর বাড়ীর লোকদের বাইরে আসতে নির্দেশ দিলেন, বললেন, “এক কাজ করবে। তোমাদের

বাড়ীর ভিতের নীচের ঐ কোণটাতে একটা হাড় আছে। ঐ জায়গাটা খুঁড়ে হাড়টা ফেলে দেবে।" অভিভূত হয়ে বাড়ীর সবাই ঠাকুরের শরণাপন্ন হ'ল – দীক্ষা গ্রহণ করে জীবন সার্থক করলো। দ্বিগুণ - উৎসাহে শোভাযাত্রা এগিয়ে চললো ঠাকুরকে নিয়ে নামকীর্তন করতে করতে।

এই অল্প বয়সেই স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা দিয়ে সবাইকে তিনি ঘিরে রেখেছেন। শিশুই হোক আর বৃদ্ধই হোক, এই অনন্ত প্রেম-ভালবাসার ছোঁয়াচ কেউ ভুলতে পারে না। তাই সবাই তাঁকে আপন মনে করে, আর তিনিও সবাইকে আপন করে টেনে নেন। তাঁর এই প্রেম-ভালবাসার বন্ধন থেকে পশুপাখী, জীবজন্তু কেউই বাদ যায় না। বাঞ্ছারামপুরে এক ভক্ত বহুদিন থেকে ঠাকুরকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। শেষে একদিন কয়েকজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাঞ্ছারামপুরে গেলেন। ভক্তটির বাড়ী বেশ সাজানো গোছানো। বাড়ীতে সে একটি ছোট চিড়িয়াখানা গড়ে তুলেছে, নানা রকমের পাখী খাঁচায় করে সাজিয়ে রেখেছে। তার মধ্যে কয়েকটি পাখী আবার মানুষের বোল দিতে শিখেছে। পাখীর কলকাকলীতে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ভোরবেলায় খাঁচার পাখীগুলো মুক্ত পাখীদের কলতানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডেকে ডেকে খাঁচার মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, যেন তারা ওই মুক্ত পাখীদের মত ডানা মেলে মুক্ত আকাশের বুকে বিচরণ করতে চায়। ওদের বন্দীদশা দেখে ঠাকুরের কষ্ট হ'ল। তিনি খাঁচার দরজাগুলো এক

এক করে খুলে দিলেন। মুক্তি পেয়ে মনের আনন্দে পাখীগুলো মুক্ত আকাশে উড়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুর ওদের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। বাড়ীর মালিক পরে এসে দেখে, খাঁচার দরজাগুলো সব খোলা – খাঁচায় একটি পাখীও নেই। দেখেই সে শোরগোল তোলে, 'কে খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছে?' কেউ কিছু জানে না। শুধু একজনই দেখেছিলো গোঁসাইকে খাঁচার দরজা খুলে দিতে, সে দেখেছে, গোঁসাই কেমন সুন্দর হাসছিলেন আর বলছিলেন, 'যা, বেড়িয়ে বেড়াগে যা।' চুপি চুপি সবাইকে জানালো, 'গোঁসাই ওদের ছেড়ে দিয়েছেন।' গোঁসাই নিজেই পাখীদের ছেড়ে দিয়েছেন, সুতরাং বলবার কিছু নেই। পরে কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজেই এক সময়ে প্রসঙ্গটা তুললেন, "তোমাদের এখানে খুব ভাল লেগেছে। ভোরবেলা যখন পাখীগুলোকে ছেড়ে দিই, ওদের আনন্দ দেখে আমার মন তৃপ্তিতে ভরে গেল। কাউকে কষ্ট দিতে আমি চাই না, তাই বাজার থেকে জীয়ন্ত মাছ, কাছিম নিয়ে গিয়ে জলে ছেড়ে দিই। ওরা কেমন পরম তৃপ্তিতে জলে ডুব দেয়! কাউকে বন্দী করে রাখলে তার ভাল লাগতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে মুক্তির জন্য তার দীর্ঘশ্বাস একদিন না-একদিন আমাদের মনে দাগ কাটবেই। ওরা খাঁচায় বসে দেখে মুক্ত পাখীদের অবাধ জীবন – মনে মনে আফশোষ করে। মুক্ত আকাশের জীব মুক্ত আকাশের নিচেই থাকতে চায়, ওতেই ওদের আনন্দ। খাঁচায় ভরে

রাখলে তো অপরাধী হয়ে যাবে। ওদের আনন্দের ছোঁয়াচ পাবে না - পাবে শুধু দীর্ঘশ্বাসের করুণ-কাকুতি।”

বাস্তবের মানে তিনি দরিদ্র হলে কি হবে, আধ্যাত্মিক জগতে তিনি বিরাট ধনী। আবার পাহাড় থেকে লামা সন্ন্যাসীর আমন্ত্রণ এসেছে, সবাই ঠাকুরকে দেখতে চায়। তিনি লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন বালককে নিতে। সুযোগ মিলে গেল – মা গেছেন বাপের বাড়ী, পিতা গেছেন মফঃস্বলে। তাই সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়লেন। দার্জিলিং-এ লামা পরিবার বালক ঠাকুরকে পেয়ে ভীষণ খুশী। লামার বয়স তখন সাতচল্লিশ, লামার স্ত্রীরও বয়স হয়েছে, তবু একটা সুন্দর পাহাড়ী শ্রী আছে তার মধ্যে। ওদের রুটির স্বাদ বালক ভুলতে পারেন না। চিরকাল ভাত খেয়ে অভ্যাস, তবুও ওদের রুটি তিনি খুবই পছন্দ করেন। লামা পরিবারের আগ্রহে বেশ কয়েকদিন ওদের সঙ্গে রইলেন। লামা সন্ন্যাসীরা আসেন – নানা রকম তত্ত্বালাপ শুনে যান। তারপর সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন তিনি – গ্যাংটক পেরিয়ে ক্রমশঃ আরও ভিতরে তিব্বত পর্যন্ত গেলেন। পথে বহু সাধক, মহাপুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ হ’ল – তাঁরা বালক ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করে অনেক তত্ত্ব আহরণ করলেন। এক জায়গায় এক নামী সাধক শক্তি প্রয়োগ করে বসলো, সেটা ‘বাণে’র মত এসে লাগলো । বালক ঠাকুর তৎক্ষণাৎ ওর শক্তি ঘুরিয়ে ওর দিকেই ছেড়ে দিলেন - সহ্য করতে না পেরে সে ধরাশায়ী হ’ল। পাহাড়ে ওরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও

পৌরাণিক তন্ত্র সাধনের উপর ওদের ঝোঁক বেশী – বেশীর ভাগ সাধকরাই তন্ত্র সাধনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

এক জায়গায় সবাই উলঙ্গ। নানারকম আলাপ আলোচনা চললো। কাপড় পরে দেহকে ঢেকে রাখার সার্থকতা ওরা বুঝতে পারে না। বস্ত্রহীন, তাই প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে থেকে সংযমের দিক থেকে যে ওরা এগিয়ে গেছে, তার প্রশংসা করে বালক ঠাকুর বললেন যে তাদের মনটাও পবিত্র রয়েছে। মনে যা আসছে তাই তারা প্রকাশ করছে, সুতরাং তারা স্বচ্ছতার দিকে রয়েছে। আর যারা কাপড় পরছে – কাপড় পরাটা শুধু অঙ্গে নয়, সর্বাঙ্গে আবরণ দিয়ে রয়েছে - মুক্ত চিন্তার মধ্যে বাধা, সত্যকথার পথে বাধা, স্বচ্ছতার পথে বাধা সৃষ্টি করছে, তাই ছল-চাতুরী মিথ্যা-প্রবঞ্চনা বাসা বাঁধছে।

সাধক – তুমি কাপড় প’রছ কেন?

ঠাকুর – আমি Sports-এ নেমেছি। যখনকার যে পরিবেশ, সেই বেশ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি - কাপড়ও আমার নয়, স্যুটও আমার নয়। আমার শুধু ব্যবহার, আর কোন কিছু আমার নয়।

সাধক – এটা তো ভাল কথা - অতি উচ্চাঙ্গের কথা। তুমি তো বেশ সর্বাবস্থায় মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছ।

ঠাকুর – মুক্ত থাকার ব্যবস্থা আমি করতে যাবো কেন? মুক্ত অবস্থায় জীব আছে – মুক্ত পথে রয়েছে। জীব যখন সর্বদিক থেকেই মুক্ত, তখন ওটাই আমার

আসল দিক। আমি সেই আসল দিকটাই নিয়ে বসে আছি, আর পরিবেশের সাথে মিশে মিশে যতটা যা করবার তা করে যাচ্ছি। আসল তো – ফল তো আমার জানাই আছে, সুতরাং আমার কষতে আপত্তি কি আছে? আমি চলছি ফল মিলতির দিকে – ফল যাতে মেলে। বেশীর ভাগই আজ অঙ্ক কষে যাচ্ছে - কিন্তু ফল মিলছে না। সবটাতেই তো মিলের অভাব।

অল্পদিনের মধ্যে অনেক জায়গায়ই ঘুরেছেন। তার মধ্যে লং পাহাড়ে সেই উলঙ্গ 'মহাপুরুষের' সঙ্গে আলোচনাই উল্লেখযোগ্য। সেই মহান - বয়স তখন প্রায় সাড়ে তিনশো বছর। অত শীতের মধ্যেও তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। সামনে একটি ধুনি জ্বলছে। অন্য সব অনুচরবর্গ শুধু কৌপীন পরে আছে - কয়েকজন রুটি-তরকারী বানাচ্ছে। উপাদেয় খাদ্যের সৌরভে স্থানটি ভরপুর। লামা সন্ন্যাসী বালক ঠাকুরকে বেশ সাজিয়ে-গুজিয়ে হাতে একটি রিস্টওয়াচ পরিয়ে নিয়ে গেছেন। সেই উলঙ্গ সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে লামা সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি এক জন্মসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।'

সন্ন্যাসী অবহেলাভরে জবাব দিলেন, 'এ তো নিতান্ত বালক! এখনও এর সাজ-পোশাকের উপর আকর্ষণই যায় নি। আমি সর্বত্যাগী - শীত, গ্রীষ্ম বোধ আমার নেই। ষড়রিপুর দংশন আমাকে বিব্রত করে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ত্যাগ করে নির্লিপ্ত হয়ে সাধনায়

বুঁদ হয়ে বসে আছি। আর এ বালক তো কিছুই ছাড়তে পারেনি - ভোগের আকর্ষণে জড়িয়ে আছে। এর সঙ্গে আর কি আলোচনা?’

বালক ঠাকুর ঐ সাধকের কথা শুনে স্বীকার করলেন যে, তাঁর শীত-গ্রীষ্ম বোধ নেই, তবু ধুনি জ্বালিয়ে বসে তার তাপটা উপভোগ করছেন। এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দু’জনে দুই পার্ট করছেন, একজন উলঙ্গ সর্বত্যাগীর পার্ট করছেন, আর একজন ভোগীর পার্ট করছেন – পার্থক্য কোথায়? সন্ন্যাসী কিন্তু ঠাকুরের বক্তব্যের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝতে না পেরে চটে গেলেন, ‘কি, আমি উলঙ্গের পার্ট করছি! আমি কাম জয় করে নির্লিপ্ত নির্বিকার হয়ে আছি।’ বালক ঠাকুর তখন বিদ্রূপের স্বরে বললেন যে, যিনি এখনও ক্রোধ সংবরণই করতে পারেননি, তিনি কি করে জোর গলায় বলেন যে, তিনি ষড়রিপু দমন করেছেন, কাম জয় করেছেন? বালকের কথায় অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে সাধক তখন বললেন যে, তাঁর কোন কিছুর ওপর আকর্ষণ নেই।

বালক ঠাকুর ধীরে ধীরে বললেন, ‘মহান সাধকের অনুচরেরা দেখা যাচ্ছে বেশ গরম গরম রুটি আর আলুর তরকারী বানাচ্ছেন। মহান সাধক কি ওগুলো খেতে ভালবাসেন?’ সাধক উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন যে, তিনি গরম গরম রুটি আর তরকারী ভালবাসেন। ‘পাহাড়ের চারিদিকের মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্য, রঙ-বেরঙের সুগন্ধি ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ যে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, সাধকের মনে কি তা রেখাপাত করে?’ -

বালক ঠাকুর জানতে চাইলেন। সাধক ভাবে বিভোর হয়ে বললেন যে, এই পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করে, ওই দৃশ্য দেখতে তিনি ভালবাসেন, গোলাপের গন্ধ তাঁকে আমোদিত করে। পাখীর কলকাকলী তাঁকে মোহিত করে।

বালক ঠাকুর এবার পরিষ্কার করে বললেন যে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে মহান সাধকের সব ইন্দ্রিয়ই পুরোপুরি কাজ করছে - তাঁর জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হচ্ছে, তাঁর কর্ণ সুমধুর গান শ্রবণ করে মোহিত হয়, তাঁর চক্ষু মনোরম দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়, তাঁর নাসিকা ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ উপভোগ করে – তবে তিনি নির্লিপ্ত, নির্বিকার হলেন কি শুধু মুখে মুখে? কাম, কামনা, বাসনা তো সর্ব অঙ্গে বিদ্যমান! সর্ব অঙ্গই তো তার আপন আপন খোরাক সংগ্রহ করে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। সবটাই তো তাঁর আছে - কোনটাই তিনি বর্জন করতে পারেন নি। তবে কি করে তিনি বলছেন যে তিনি কাম জয় করেছেন?

সাধক যুক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন - বললেন যে, তিনি এভাবে কখনো চিন্তা করেন নি। বালক ঠাকুর তখন জানালেন যে, এইজন্যই তিনি বলেছিলেন যে একই রঙ্গমঞ্চে দু'জনেই পার্ট করছেন, একই সাজ-ঘর থেকে দু'জনেই সেজে বে'র হচ্ছেন – একজন ভোগীর বেশে, একজন যোগীর বেশে। কিন্তু বেশটা আসল নয়, তার মূলতত্ত্বটাই হ'ল আসল। বর্জনের কথা ওঠে না, কারণ কেউ কোনদিন কোন বৃত্তিই বর্জন করতে পারে না, শুধু সমসুরে বাঁধতে হবে আর সমসুরে বাঁধাটাই হ'ল

শ্রেয়। যখন এই ভাব মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, কোনটাই আমার নয়, আবার প্রয়োজনে আমি সবটাই ব্যবহার করতে পারি, তখনই আসবে সমদৃষ্টি, সমসুর। সাধক অভিভূত হয়ে বালককে প্রণাম জানালেন। বললেন, 'সত্যিই তুমি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ।'

এরপর সেই মহান সাধক বালক ঠাকুরের কাছ থেকে সাধন সম্পর্কে অনেক উপদেশ-নির্দেশ নিলেন। জেনে নিলেন – কোন পথে গেলে, কী ভাবে সাধনা করলে সেই পরম প্রাপ্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সাড়ে তিনশো বছর বয়স্ক সেই সাধক শেষে আনন্দে ভরপুর হয়ে বললেন যে, তাঁর এক নতুন দিগদৃষ্টি খুলে গেল - এক নতুনের সন্ধান পেলেন, যা এত বছর ধরে শুধু কল্পনার মাঝে আর কৃচ্ছসাধনের মাঝে ছিল।

সেই সাধকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাহাড়ে আর কিছুদিন ঘুরে সাধকদের সাধন -পথের হদিশ দিয়ে বালক ঠাকুর ফিরলেন দেশে। কোনবারেই তিনি কিন্তু একমাসের বেশী পাহাড় অঞ্চলে কাটান নি।

।। পনেরো ।।

পূর্ববঙ্গে হাডুডু খেলার চল ছিল খুব বেশী। বহু অঞ্চলে হাডুডু প্রতিযোগিতা হ'ত এবং পুরস্কারস্বরূপ চ্যালেঞ্জ কাপ বা শীল্ড দেওয়া হ'ত। দোগাছি হাডুডু খেলায় বেশ নাম করেছিল। প্রতিযোগিতায় দোগাছির দুটো টিমই

ফাইনালে উঠেছে - একটা সবুজ সংঘ, আর একটা বিদ্যাপীঠ – দুটোতেই বিক্রমপুরের নামকরা খেলোয়াড় আছে। খেলা হবে সবুজ সংঘের মাঠে। মহকুমার এস-ডি-ও সভাপতি হয়েছেন – প্রাইজও তিনি বিতরণ করবেন। গ্রামের জমিদার, সেক্রেটারী এবং অনেক গণ্যমান্য লোকের সমাগম হয়েছে। জমিদার মশাই সবুজ সংঘের পৃষ্ঠপোষক। বালক ঠাকুর বা বাচ্চা গোঁসাই বেশী খেলেন না। কিন্তু খেলার মধ্যে তাঁর একটা বিশেষত্ব ছিল - দেহে যেমন শক্তি রাখতেন, তেমনি ক্ষিপ্রতা ও ক্রীড়াকৌশলে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কখন কি ভাবে খেলবেন, কোন কৌশল অবলম্বন করবেন, তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোগীও আঁচ করতে পারতো না। জানাজানি হয়ে গেছে, বাচ্চা গোঁসাই আজ নামছেন সবুজ সংঘের টিমে। লোকে লোকারণ্য – চারিদিক থেকে লোক আসছে। কাজির পাগলা, কোলাপাড়া, কুমার ভোগ ও তার আশপাশের গ্রাম থেকে সবাই এসেছে – বাড়ীর মেয়েরা, মাসীমা, পিসীমা, দিদিমা, বৌরা, যাঁদের কোনদিন গ্রামের খেলার মাঠে দেখা যায় না তাঁরাও দল বেঁধে মাঠে এসেছেন এই ঐতিহাসিক খেলা দেখতে। দুই পক্ষের সমর্থকরাই এসেছেন। গ্রামদেশে বাড়ীর মেয়েদের এবং বর্ষীয়ান মহিলাদের খেলার মাঠে আসাটা একটু অস্বাভাবিক। কিন্তু আজকের বিশেষ আকর্ষণ হ'ল বাচ্চা গোঁসাইয়ের খেলা। তাঁর ক্রীড়াকৌশল এতই চমকপ্রদ যে, তাঁর টিম জিতলে একটা খেলার মত খেলা দেখা যাবে। আর হারলে মনে হবে স্বেচ্ছায় তাঁরা

প্রতিদ্বন্দ্বীকে জিতিয়ে দিয়েছেন। রোদ তখনো পড়েনি, মাঠে সূর্যের আলো পড়েছে, বাচ্চা গোঁসাইয়ের গায়ে পড়ে ঝলমল করে উঠছে। এস-ডি-ও জমিদার-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই সুন্দর ছেলেটি কে?' জমিদারবাবু সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় দিলেন। এস-ডি-ও অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি!'

সারামাঠে হৈ-হল্লা লেগে গেছে - যেন একটা বিরাট উৎসব হচ্ছে। রেফারী হুইসিল বাজালেন। খেলা শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক পক্ষে এগারো জন করে প্লেয়ার। প্রথম 'ছি' দিলেন প্রফুল্ল হোড়ের ভাই 'বিদ্যাপীঠে'র মানিক - 'কেঁচি'মারা প্লেয়ার। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় দম নিয়ে 'কপাটি' 'কপাটি' করতে করতে তাদের কোর্টে আসে আর 'কেঞ্চি'-মারা খেলোয়াড় এমন ভাবে দুই-পা সাঁড়াশীর মত করে তার কোমর জড়িয়ে ধরে যে, সে আর কিছুতেই নড়তে পারে না, ফলে 'আউট' হয়ে যায়। সবুজ সংঘেও মৈনা, মোহন প্রভৃতি ভাল 'কেঞ্চি' মারে। প্রথম বারের খেলায় ড্র হয়েছে। একটা গেমে সবুজ সংঘ জিতেছে, একটা গেমে বিদ্যাপীঠ জিতেছে। বাচ্চা গোঁসাই খেলছেন। তার দিকে সবার নজর, দেখে মনে হয় একটু লজ্জা লজ্জা পাচ্ছেন। শেষ রাউন্ডের খেলা শুরু হয়েছে। এবারেই মানিক প্রথম 'ছি' দিলো। সবুজ সংঘ কিছুতেই পেরে উঠছে না - একে একে ছ'টি প্লেয়ার আউট হয়ে গেছে, বাকী রয়েছে পাঁচজন। দেখতে দেখতে আরও দু'জন আউট হয়ে গেল। বাকী রইলেন বাচ্চা গোঁসাই আর

দু'জন প্লেয়ার। গোঁসাই এতক্ষণ পিছিয়ে ছিলেন - দেখে মনে হচ্ছিল খেলায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ নেই। টিমের দুরবস্থা দেখে এবার তিনি এগিয়ে এলেন। সবুজ সংঘের সমর্থকরা বেশ দমে' গেছেন, মনে হচ্ছে হার সুনিশ্চিত। ক্রমশ: সবুজ সংঘের আর দুজন প্লেয়ারও বিপক্ষদলের 'কেঞ্চি' কাটাতে না পেরে আউট হয়ে গেল। এবার শুধু বাচ্চা গোঁসাই একা। তিনি এবার 'ছি' দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন, বললেন, 'দাঁড়াও, সবগুলোকে আমি বাঁচাচ্ছি।' চারিদিকে হৈ হল্লা লেগে গেল। বাচ্চা গোঁসাই-এর শক্তি অনেকেই জানে, তাঁকে ধরে রাখা সহজ নয়। 'ছি' দিয়ে বিপক্ষদলের কোর্টের ভিতর ঢুকে গেলেন। বাদল কেঞ্চিতে মাষ্টার – সে কেঞ্চি দিয়ে গোঁসাইয়ের কোমর জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু বাচ্চা গোঁসাই অনায়াসে ওকে নিয়ে নিজের কোর্টে ফিরে এলেন। দু'জন বেঁচে উঠল। আবার 'ছি' দিয়ে ওদের ভিতরে ঢুকে পড়লেন – টগর, মানিক এবং আরেকজন গোঁসাইকে জাপটে ধরলো, মনে হ'ল তিনি ফিরতে পারবেন না - তিনিও বিশেষ চেষ্টা করছেন না। তারপর হঠাৎ এত ক্ষিপ্রতার সাথে লাফিয়ে উঠলেন যে, ওরা ধরে রাখতে পারলো না। সবুজ সংঘের পাঁচ জন বেঁচে উঠলো। গোঁসাই রগড় করে তাঁর পক্ষের খেলোয়াড়দের বললেন, 'তোরা তো শ্মশান থেকে ফিরে এলি; এবার একটু বিশ্রাম কর, ভাল করে খাওয়া দাওয়া কর, আমিই 'ছি' চালিয়ে যাই।' প্রফুল্ল হোড়কে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।'

সবাই হেসে কুটিপাটি। এবার ‘ছি’ দিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে প্রফুল্ল হোড়ের পিঠে একটা চাটি বসিয়ে দিলেন। এদিকে সবাই তাঁকে ঘিরে ফেলেছে - পালাবার উপায় নেই, এমন ভাবে ধরেছে। হঠাৎ একটা গোত্তা মেরে ওদের বোকা বানিয়ে চলে এলেন। ওরা সবাই আলোচনা করছে - এত চেষ্টা করছি, ধরতে পারছি না কেন! নিশ্চয়ই ও তেল মেখে এসেছে। গোঁসাই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘দেখ না, তেল মেখেছি কিনা।’ বাচ্চা গোঁসাই আবার ‘ছি’ দেবার জন্য রেডি হচ্ছেন, ওরা বলে উঠলো, ‘ও বারবার আসছে কেন?’ গোঁসাই রেফারীকে বলেন, “ওরা এত কথা বলবে কেন? আমি যতবার খুশী যাব।” আর কিছু ওরা বলতে পারলো না। গোঁসাই বললেন যে, এবার তিনি একটু মজা করবেন। ‘ছি’ দিয়ে বিপক্ষদলের কোর্টে ঢুকে গেলেন। ওরা এসে জাপটে ধরলো। গোঁসাই ‘কপাটি’ ‘কপাটি’ করে যাচ্ছেন, ওরা অপেক্ষা করছে কতক্ষণে গোঁসাইয়ের দম ফুরিয়ে যাবে। ওরা মাত্র দুজন – হঠাৎ তিনি বসে পড়লেন এবং ফুরুৎ করে বেরিয়ে গেলেন। ওরা সব নামকরা প্লেয়ার, আর গোঁসাইয়ের অভ্যাস নেই। প্র্যাকটিস না থাকলে কি হবে, গোঁসাই যে কৌশল অবলম্বন করলেন, তাতেই ওরা কাত হয়ে গেছে। ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগল – সবুজ সংঘ জিতেছে।

এবার প্রাইজ দেবেন এস-ডি-ও সাহেব। বালককে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার নাম কি?’

বালক উত্তর দিলেন।

-কত দিন তুমি সবুজ সংঘে আছ?

-তা' চার বছর হবে।

কাপটা তিনি বালকের হাতে দিতে চাইলেন। বালক বললেন যে, তিনি কাপটা একা নিতে চান না, সবুজ সংঘের সব খেলোয়াড় আসুক। সব খেলোয়াড়রা এগিয়ে এল। এস-ডি-ও আবার কাপ দেবার উদ্যোগ করলেন। বালক বললেন, 'শেষ হলো না স্যার। সবুজ সংঘ আর বিদ্যাপীঠ এপিঠ আর ওপিঠ, এক গ্রামের এক পাড়ার। যদি কোথাও বাইরের প্রতিযোগিতায় যেতে হয়, এই টিম থেকেই বাছাই করে গ্রামের হয়ে খেলবো! সুতরাং আমরা দুই টিম একসঙ্গে কাপ নেব। এ জয় শুধু আমাদের নয়।'

এস-ডি-ও খুশী হয়ে বললেন, 'এ কথা তুমি বলতে পারলে?'

বালক উত্তর দেন, 'কেন পারবো না স্যার?' বিদ্যাপীঠ আসতে চাইছে না। বালক তাদের ডেকে বললেন, 'এগিয়ে এস। তোমরা কি রায়টের সূচনা করতে চাও?' বিদ্যাপীঠের খেলোয়াড়রা দ্বিরুক্তি না করে এগিয়ে এল। বালক এবার সভাপতি এস-ডি-ও-কে বললেন, 'কাপটা এবার বিদ্যাপীঠের হাতে দিন। আমরা যখন একসূত্রে গাঁথা, আমাদের জয় - সবার জয়।' এস-ডি-ও খুশী হয়ে বললেন, 'তোমার চিন্তাধারা মহৎ।'

এরপর সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করলেন, দেশের গরম গরম রসগোল্লা জমিদারবাবু

সবাইকে খাওয়ালেন আর বললেন, ‘এ মাঠে এই রকম খেলা আর কোনোদিন দেখতে পাব কিনা সন্দেহ – মাঠ সার্থক, দর্শকও সার্থক।’

এস-ডি-ও খেলার অনেক প্রশংসা করলেন। বললেন যে, তাঁর আসা সার্থক হয়েছে। বালক ঠাকুরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তিনি। এস-ডি-ও এবং অন্যান্য সকলেই বালকের গালে গাল লাগিয়ে আদর করলেন।

এরপর দুই দলই একত্রিত হয়ে ‘হিপ হিপ হুররে’ বলে কাপটা নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করলো।

এদিকে স্কুলে ক্লাস সিক্সে উঠেছেন। স্কুলে ঠিকমত যাওয়া-আসা করেন। মাঝে মাঝে মাইনে দিতে পারেন না বলে নাম কাটা যায়। বই কিনতে পারেন না - অন্যের পুরানো বই দিয়েই চালিয়ে নেন। হয়তো কোন বইয়ের সব পাতা নেই, সহপাঠীর বই থেকে সেটা পড়ে নেন। এইভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেন, কিন্তু বাইরের কেউ – এমন কি অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পর্যন্ত তা জানতে পারে না। স্কুলের পর বিকালে খেলার মাঠেই হোক বা তাঁর ছোট চৌচালা ঘরটিতেই হোক, বালক ঠাকুরের কাছে বহু লোকের সমাবেশ হয়।

উজানচর খেলার মাঠে খেলার পর প্রায়ই ছেলেরা গল্পগুজব করে। বালক ঠাকুর থাকলে তো কথাই নেই। কারণ গল্পে, হাসি-ঠাট্টায় কোনটাতেই তাঁর সমকক্ষ নেই - অথচ তাঁর প্রতিটি গল্প, প্রতিটি বক্তব্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী করে বলেন যে

মুগ্ধ হয়ে সবাই শোনে। সেদিনও তিনি রগুড়ে কথা বলছিলেন, আর সবাই হাসিতে ফেটে পড়ছিল। অনেকেই এসে বালক ঠাকুরের কাছে বসে গেল। তাঁকে বহু দিন এইরকম আমোদ-আহ্লাদ করতে দেখে নি, সুতরাং সবাই হাস্যরসে মেতে উঠেছিল। হঠাৎ তাদের খেয়াল হ'ল – বালক ঠাকুর তো একজন ন'ন, বহু বালক ঠাকুর! প্রত্যেক ভক্তের সামনে একজন করে বালক ঠাকুর বসে আছেন আর হাস্যরস পরিবেশন করছেন। যতজন ভক্ত, ততজন ঠাকুর। বিরাট আনন্দের মাঝেও সকলে বিস্মিত হয়ে গেল – এ কী ব্যাপার - কোনটি আসল বালক ঠাকুর! কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তিও শেষে এসে সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। ঠাকুরের মাস্টারমশাই প্রকাশ বল তো হতভম্ব হয়ে চীৎকার করতে লাগলেন, 'কোনটা বীরুঠাকুর?' উচ্চাঙ্গের বিভূতি এই কায়াব্যুহ দেখে সেদিন সবাই আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো।

উজানচরে আশু সেনের ঘরে সবাই বসে আছেন, বালক ঠাকুরের কাছে কিছু তত্ত্ব উপদেশ নেবেন। পাঠশালার মাষ্টারমশাই গুরুচরণ পণ্ডিত, আনন্দ মাষ্টার, নায়েব ত্রৈলোক্য সোম ও আরও অনেকে রয়েছেন। পাশেই আর একখানা ঘর, তার দরজা জানলা বন্ধ, বালক ঠাকুর সেই ঘরে আছেন। হঠাৎ ওই ঘর থেকে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ সবাই শুনতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবছেন - শোবার ঘরে জলের শব্দ আসে কোথা থেকে! আশু সেন তো অবাক - ও ঘরে তো এক ফোঁটাও জল

রাখা নেই! শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে যেন কেউ নদীতে নেমে ইচ্ছামত স্নান করছে – ব্যাপারটা কি? বালক ঠাকুর তো একা ও ঘরে! ভিজে বাতাসও ওঁদের গায়ে লাগছে। জলের ছাঁট এসে লাগতেই বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে যায় – এ তো শুধু শব্দ নয়, সত্যি সত্যিই জল! সব প্রশ্নেরই মীমাংসা করে বালক ঠাকুর বেরিয়ে এলেন দরজা খুলে। তাঁকে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি যে দেখছি একেবারে স্নান করে উঠেছো! এই বন্ধ ঘরে জল পেলে কোথা থেকে?’

বালক ঠাকুর হেসে বললেন, “কেবল নদীতে নামলেই তো জল পাওয়া যায় না, এই বিশ্বের সবটাই তো জলে ভর্তি। আকাশে, বাতাসে- কোথায় জল নেই? এই জলকণাগুলো একত্র করলেই তো জল জমে যায়। এই যে আমরা এই ঘরে বসে আছি, এখানকার এই বাতাসেও তো কত জলকণা আছে। যেভাবে বৃষ্টি হয়, ঝর্ণা হয়, যেভাবে পৃথিবীর মাটিতে জল জমা হয়, ঠিক সেইভাবেই এই ঘরও জলে ভর্তি হয়ে গেছে। এতে আর অবাক হবার কি আছে? আমার মনটা ওর মধ্যে সেইভাবে লাগিয়েছি, তাই এখানে ঘর ভর্তি জল। ভিজে গেছে সব জামা কাপড়। মনের ক্রিয়ার ফলে সবই সম্ভব। শুধু মনটা লাগাতে হবে – এই আর কি।”

বালক ঠাকুরের সহপাঠী কাঞ্চন মিঞার বিয়ে। কাঞ্চন মিঞার বাবা ছিলেন একটা দলের নেতা – লাখ লাখ টাকার মালিক হয়েছিলেন। আদর্শবিহীন

প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে কাঞ্চন বেপরোয়া মস্তানের মত হয়ে গিয়েছিল – কারো কথা শুনতো না, কাউকে মানতো না। বালক ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে অদ্ভুত পরিবর্তন এল তার জীবনে। বেয়াড়া দুর্ধর্ষ ছেলে, পিতৃমাতৃভক্ত সুসন্তান হয়ে উঠলো। পড়াশুনা করে, কু-অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। ওর বাবা তো ওর পরিবর্তন দেখে অবাক। ঠাকুরকে তিনি বলতেন, 'আল্লার পেয়াদা - মানুষ না' – এই বলে সবাইকে পরিচয় দিতেন।

এই কাঞ্চন মিঞার বিয়েতে গেলেন ঠাকুর ঝগড়াচরে, ওদের বাড়ীতে। ওদের নিয়ম আছে, মা ছেলেকে কোলে বসায় - মেয়েকে প্রশ্ন করে, ছেলেকে প্রশ্ন করে। কাঞ্চনের বদলে ওর মা ঠাকুরকে কোলে বসিয়েছেন; কাঞ্চনের বাবা বললেন, 'ওকে দুজনের সঙ্গেই বিয়ে দিচ্ছি – প্রথম বর কাঞ্চনের ঠাকুরভাই।' নানা প্রশ্নোত্তরের পর কাঞ্চন মিঞার বিয়ে হ'ল। মেয়ের বাবা তো দেখে অবাক! কাঞ্চনের বাবা বললেন, 'ও তো মানুষ নয় – আল্লার পেয়াদা।' বালক ঠাকুর বিদায় নেবার সময় কাঞ্চন কেঁদে আকুল। ঠাকুর কাঞ্চনের বৌকে দেখিয়ে বললেন, 'ও তো কিছু বলছে না।' মেয়েটি জবাব দিল, 'কী বলতে হবে তা তো জানি না।' ফিরে আসবার আগে কাঞ্চন মিঞার বাবাকে দেখিয়ে ঠাকুর মেয়েটিকে বললেন, 'তোমায় একটি বুড়ো ছেলে দিয়ে গেলাম - ওকে দেখবে, যত্নে রাখবে।' আর কাঞ্চনের মাকে দেখিয়ে বললেন, 'আর মেয়েকে দিয়ে গেলাম, ওকে মেয়ের মত যত্ন

করবে।’ কাঞ্চনকে বললেন, ‘ওকে কোনোদিন ছাড়তে পারবে না – ও বেঁচে থাকতে আর কাউকে সাদী করবে না।’

কি স্বচ্ছ পবিত্রতার বন্ধনে এই সব মুসলমান পরিবারের সঙ্গে বালক ঠাকুর বাঁধা আছেন! এঁরাই তাঁকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, যা শিক্ষিত সমাজের অনেকেই বুঝতে পারে নি।

ভক্ত-শিষ্যের সংখ্যা যত বাড়ছে, সমস্যাও তত বাড়ে। বহু ছেলে-মেয়ে আসে যাদের খাওয়া-পরার সংস্থান নেই, শিক্ষা তো দূরের কথা। বর্তমান সমাজের কাঠামোতে তাদের বেঁচে থাকাই কঠিন। আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আসে তাদের বালক ঠাকুরের কাছে। নিজেই দরিদ্র্যতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন, সুতরাং নিজের কাছে রাখার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ব্যবস্থা করতে ছাড়েন না। উপায়টা তাঁর অভিনব, মৌলিকত্বে ভরা। যাদের অবস্থা একটু সচ্ছল, এইরকম আঠারো শ’ থেকে দু’হাজার ঘর ঠিক করেন। তাদের বলেন, “আমি তো গুরুদক্ষিণা নিই না, এবার তোমাদের গুরুদক্ষিণা দিতে হবে।” তারা তো খুশী – যাক, গুরুদেবকে এবার কিছু দেওয়া যাবে। ঠাকুর বললেন, “আমার শত শত দুঃস্থ ছেলেমেয়ে আছে। তাদের না আছে খাবার সংস্থান, না আছে পড়ার ব্যবস্থা। তোমরা প্রত্যেক সংসারে যদি একটি করে ছেলে বা মেয়ে মানুষ কর, তাহলে আমার সমস্যাটা কিছু মেটে। তবে ওরা যেন কখনও মনে না করে যে ওরা কারও দয়া-দাক্ষিণ্যের

ওপর আছে।” সবাই এককথায় রাজী হয়ে গেল - এ আর শক্ত কি! পাঁচজনের সংসারে একজন আর এমন কি সমস্যা! ঠাকুর বললেন, “এখানেই শেষ নয়। তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে কিছু না কিছু পতিত জমি আছে। ওটা আমাকে দেবে।” তারা তো তখনই রাজী হয়ে গেল। ঠাকুর বললেন, “দাঁড়াও, এত সহজ নয়। জমি লিখে দিতে হবে না, ওটা থাকবে মুখে মুখে। আর আমার নামে তোমরা নিজেরা ওই জমিটা চাষ করবে, ফসল ফলাবে। যে সব সবজি হবে, তার অর্ধেক আমার আর অর্ধেক তোমাদের।” সবাই এক কথায় রাজী হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ঠাকুর তাঁর সাথীদের নিয়ে ভোরবেলায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হন, কখনও বা একাই যান। বাড়ীর লোকদের ঘুম থেকে ওঠার আগেই মাটি কুপিয়ে ক্ষেত তৈরী করে দিয়ে আসেন। তারা ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে যায় সব দেখে, বুঝতে পারে না কারা এসব করে গেল! দুই একবার বাড়ীর গোমস্থা বা বাইরের কাজ করার লোক ঠাকুরকে দেখে ফেলে, বাড়ীর কর্তাদের জানায় যে ‘ফটোর ঠাকুর’ অন্ধকার থাকতে এসেছিলেন এবং নিজহাতে মাটি কুপিয়ে গেছেন, গাছে জল দিয়ে গেছেন। তারা তো শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়! প্রতিজ্ঞা করে – নিজেরাই খেটে ফসল ফলাবে, ঠাকুরকে আর কষ্ট দেবে না। নিজ হাতে কাজ করে শিক্ষা দিতে ঠাকুর ভালবাসেন, তাই প্রায়ই সকলে খবর পায়, ঠাকুর অমুকের বাড়ী গিয়ে জমি কুপিয়ে এসেছেন, অমুক জায়গায় আগাছা নিড়িয়ে

এসেছেন, অমুক জায়গায় চারা পুঁতে এসেছেন। নিজের হাতে ঠাকুর বাড়ী বাড়ী গিয়ে কাজ করে আসছেন, আর তারা কিনা চুপ করে বসে আছে! - লজ্জায় তাদের মাথা কাটা যায়। বাড়ীর ছেলেমেয়ে, কর্তা, গিন্নী, কাজের লোক সবাই দ্বিগুণ উৎসাহে ফসল ফলাতে নেমে পড়ে। ক্রমে প্রচুর ফসল ফলতে থাকে – ওই সব একত্র করে হাটে বাজারে বিক্রী করে যে পয়সা রোজগার হয়, তাই দিয়ে ঠাকুর বাচ্চাদের খাতা, পেন্সিল, স্লেট, কাপড় - চোপড় কিনে দেন। তারা সব সময়ই মনে করে ঠাকুরই তাদের পিতামাতা। আর ওই গৃহস্থদেরও কর্মের মাধ্যমে বেশী করে গুরুস্মরণ হতে থাকে। সবটাই ঠাকুর করেন, উপায়ও অভিনব, মৌলিক, কিন্তু কাউকে জানতে দেন না।

নিজের আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের কথা সবাই ভাবে, তাদের জন্য অনেক কিছুই করতে পারে; কিন্তু পরকে আপন করতে, পরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে ক'জন পারে? শুধু কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। নিজের কর্মধারার ভিতর দিয়ে, নিজের আচরণের ভিতর দিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেন, "শুধু পাঁচ নম্বর বাড়ীটাকে নিজের বাড়ী মনে না করে, সমস্ত দেশটাকে নিজের বাড়ী মনে কর।" দেশাত্মবোধ তাঁর মধ্যে এত গভীর, তাঁর ভালবাসার টানে সবাই তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তিনি সবার জন্য ভাবেন। তাই যখন হরিনারায়ণ সাহা ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফিজ ত্রিশ টাকার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে শেষ পর্যন্ত বালক ঠাকুরের কাছে এল,

নিজের সঙ্গতি নেই, তবু তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। তাকে নিয়ে গেলেন সুরেন্দ্র সাহার বাড়ীতে। সুরেন্দ্র সাহাও গরীব - ঠাকুরের কথা শুনে বললেন, 'আমার পঞ্চাশ টাকা জমেছে - তুমি যখন ব'লছ, ওর থেকেই ত্রিশ টাকা দিয়ে দিই।' মেঝে খুঁড়ে বে'র করে ত্রিশ টাকা হরিনারায়ণকে দিলেন। হরিনারায়ণ ক্রমে ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ পাশ করে বড় চাকরী পেলো। ঠাকুর শুধু একটি কথা হরিনারায়ণকে বলেছিলেন, 'যতদিন বাঁচবে, সুরেন্দ্র সাহার পরিবারকে দেখবে।' তাই প্রথম মাসের মাইনের অর্ধেক সুরেন্দ্র সাহাকে পাঠিয়ে দিয়ে সে লিখলো, 'আপনি যে উপকার করেছেন, অবশ্য আমি গেলে হ'ত না, যার মাধ্যমে গিয়েছিলাম তাঁর কথা মনে করেই বলছি, তার তুলনা হয় না। টাকাটা কিছু নয়, যে সময়ে উপকারটি করেছিলেন, সেটি না করলে আজ আমার দাঁড়াবার কোন উপায় থাকতো না। তাই যৎসামান্য পাঠালাম। উপকারের তুলনায় এটা কিছুই নয়।' আর প্রতি মাসে সে তাঁকে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠায়। প্রতিটি পরিবার ঠাকুরকে অতি আপন বলে মনে করে, যেন রক্তের সম্পর্ক। ঠাকুরও সেই স্বচ্ছ সম্পর্কটি মনে-প্রাণে পোষণ করেন।

সেবার ফাইনাল পরীক্ষার পর উজানচর স্কুল কমিটির মিটিং-এ বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেল। মহেন্দ্র বাবু হেডমাস্টার বেশ কড়া লোক। তিনি বেশ উত্তেজিত। এ রকম হলে স্কুল কী করে চলবে! আলোচনায় জানা গেল, ক্লাশ সিক্সের ছেলেরা সবাই পরীক্ষায় খুব বেশী বেশী

নম্বর পেয়ে পাশ করেছে – প্রায় সবাই পাশ করেছে। প্রশ্নপত্র নিশ্চয়ই ছেলেরা আগে থেকে জানতো। ছেলেদের সবাইকে ডাকা হ'ল, - ভয়ে তারা স্বীকার করলো যে বালক ঠাকুর সব প্রশ্ন তাদের বলে দিয়েছেন। হেডমাস্টারমশাই স্কুলের প্রেসিডেন্ট ত্রৈলোক্য সোমকে অনুরোধ করলেন বালকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নিতে। ত্রৈলোক্য সোম তাঁর পরম স্নেহের পাত্র বালক ঠাকুরকে ভাল করেই জানতেন – তাঁর শিশুবয়সের বহু বিভূতির তিনি প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা। কমিটিতে এসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার জয়মঙ্গল সাহা এবং আরও অনেকে ছিলেন। তাঁরা অনেকেই বালক ঠাকুরের ঐশী শক্তির কথা জানতেন। একটু চিন্তা করে ত্রৈলোক্য সোম জিজ্ঞাসা করলেন, "বালক কত নম্বর পেয়েছে? ও কি পাশ করেছে?" দেখা গেল যে বালক পাশ তো করেনই নি, সব বিষয়ে সব চেয়ে কম নম্বর পেয়েছেন। তাঁকে কমিটির সামনে ডাকা হ'ল। প্রশ্নের উত্তরে বালক বললেন, "ছেলেরা সব ধরেছিল প্রশ্ন বলে দেবার জন্য। চোখ বুজে সব দেখতে পেলাম, বলে দিলাম।" প্রশ্ন এল, "তুমি এত খারাপ করলে কেন?" বালক উত্তর দিলেন, "আমার কি আর ও সব মনে আছে? প্রশ্নগুলো তখন চোখের সামনে ভাসছিল, ওদের বলে দিয়েছিলাম। আমি ওগুলো মনে রাখিনি। প্রশ্নগুলো আমার জানার মধ্যে এসে গেছে, সুতরাং ওগুলো ব্যবহার করলে ত্রুটি হবে। তাই ওই প্রশ্নের উত্তর আমি পড়ি নি। এবার না পড়েই পরীক্ষা

দিয়েছি। সেইজন্যই সব বিষয়ে কম নম্বর পেয়েছি।” বালক চলে গেলেন। কমিটি আলোচনা করতে শুরু করলো। ত্রৈলোক্য সোম বললেন, “আমি ওকে ভাল করে জানি, ও কখনো মিথ্যা বলবে না।” অনেকেই ত্রৈলোক্য সোমের কথা সমর্থন করলেন। বালক ঠাকুরের ঐশী ক্ষমতার কথা নিয়ে কিছুক্ষন আলোচনা হ’ল। হেডমাস্টারমশাই যে একেবারেই কিছু জানতেন না, তা নয়। কিন্তু যখন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেছে শুনলেন, তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে বাস্তবে যেরকমভাবে এই সব ঘটনা ঘটে, সেইভাবেই এটাও হয়েছে। দু’একজন সেদিন লক্ষ্য করেছিলেন যে বালক নিজের হাতে পেয়েও তাঁর ঐশী শক্তির ফল নিজের কাজে লাগালেন না।

দুই এক বছর আগের কথা, সরস্বতী পূজার আয়োজন চলছে কৃষ্ণনগরে। ছেলেমেয়েরা রাত জেগে পূজামণ্ডপ সাজাচ্ছে। কেউ পাহাড় বানাচ্ছে মাটি দিয়ে, কেউ আবার ডালপালা দিয়ে সাজাচ্ছে। বালক আর একটি মেয়ের ওপর ভার পড়েছে - রং-বেরঙের কাগজ দিয়ে লম্বা শিকলি ও নিশান বানাতে হবে। রাত প্রায় দু’টো বাজে - সবাই ব্যস্ত। শিকলি বানাতে বানাতে মেয়েটি বলে, ‘একটা গোপন কথা জিজ্ঞাসা ক’রব, উত্তর দিবি?’

ঠাকুর বলেন, ‘বল না, কি জানতে চাস।’

মেয়েটি বলে, ‘আচ্ছা আমার বিয়ে হবে তো? আমার বর কি রকম হবে বল তো?’

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, 'কি রকম বর তুই চাস?'

মেয়েটি বলে, 'তুই বল না।'

ঠাকুর বলেন, 'তোর বর হবে শিক্ষক, কোঁকড়া চুল, মাঝখানে সিঁথি'; তারপর মেয়েটির সন্দেহ দূর করে বলেন, 'না, দেখতে কুৎসিত না, তোর কথা শুনবে। তারপর কার্তিক মাসে তোর একটি ছেলে হবে, তার নাম রাখবি কার্তিক।' [নানা জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসতে থাকে, কিন্তু কোনটাই টেকেনা। অণিমার বয়স যখন পনেরো - ষোল, ঘুরতে ঘুরতে এক শিক্ষকের সঙ্গে সম্বন্ধ এল। ছেলের ফটো পাঠিয়েছে - কোঁকড়া চুল, মাঝখানে সিঁথি - বাড়ীতে সবার পছন্দ হয়েছে। ছেলে-পক্ষ অণিমাকে পছন্দ করে গেছে। অণিমা আগেই তার দিদিকে বলেছিল ঠাকুর তার বর সম্বন্ধে কি বলেছেন। শেষপর্যন্ত ঠাকুরের কথা আশ্চর্যভাবে মিলে গেল। এখানেই শেষ নয়, কার্তিক মাসে অণিমার প্রথম পুত্র সন্তান হ'ল – নাম রাখা হ'ল কার্তিক]

মেয়েটি বলে, 'ঠিক তো?'

এ ঘটনার পর দু'এক বছর কেটে গেছে, মেয়েটি একদিন ঠাকুরকে বললো, 'তুই আমাকে দীক্ষা দিবি? আমাকে কি করতে হবে?'

- 'কিছুই করতে হবে না, শুধু স্নান করে আসবি আর কিছু ফুল নিয়ে আসবি।'

-'আচ্ছা, তুই তো আমার গুরু হয়ে যাবি। তোকে কি বলে ডাকবো।'

-'কেন, তুই আমাকে নাম ধরে ডাকিস। কৃষ্ণকে লোকে কৃষ্ণ বলে ডাকে না, মহাদেবকে মহাদেব বলে ডাকে না? তাঁদের তো নাম ধরেই ডাকে, তুইও আমার নাম ধরে ডাকিস।'

মেয়েটি দীক্ষা নেয়। এই প্রথম সে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রল এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলো। ঠাকুর বলেন, 'কাঁদছিস কেন? এত কাঁদবার কি আছে?' মেয়েটি উত্তর দেয়, 'আজ গুরু পেলাম, কিন্তু সেই বন্ধু তো হারালাম!' আর সে ঠাকুরকে নাম ধরে ডাকতে পারে না বা 'তুই' বলে সম্বোধন করতে পারে না।

।। ষোলো ।।

এ বছরও বালক ক্লাস সিক্সেই রয়ে গেলেন কিন্তু তার জন্য তাঁর আক্ষেপ নেই। নতুন বই কিনতে হবে না, সুতরাং একটা বিরাট সমস্যার থেকে বাঁচলেন।

১৯৩৫ সন। পঞ্চম জর্জের সিলভার জুবিলী উৎসব। হেড মাস্টার মহেন্দ্রনাথ দাস ঠাকুরকে স্কাউটস্-এ ভর্তি করে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্কুলের বাছাই করা স্কাউটস্ বাঞ্ছারামপুর মাঠে কুচকাওয়াজ করবে। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসবেন কুচকাওয়াজ দেখতে। ড্রিল মাষ্টার সনাতনবাবু, হেডমাস্টারমশায় দুজনেই ঠিক করলেন,

বালক ঠাকুরই উজানচর-স্কুল-টিমের পুরোভাগে থাকবেন। বালক ঠাকুর কিন্তু তাঁর সাথীদের বললেন, 'ইংরেজদের নিয়ে এত নাচানাচি আমার ভাল লাগে না। মুষ্টিমেয় ক'জন ইংরেজ এতগুলি ভারতবাসীর ওপর রাজত্ব করছে, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। নিজেদের দেশের ক্ষতি আমরা নিজেরাই করছি। আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে যদি প্রতিবাদে নামি, তবে ইংরেজ এদেশে থাকতে পারবে না। আমরা তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী, ষাট হাজার ইংরেজকে তাড়াতে কতক্ষণ লাগে! মীরজাফর দেশের এক চরম ক্ষতি করে গেছে, বাকীটা আমরা করছি ইংরেজদের নিয়ে নাচানাচি করে।' যাই হোক, একদিকে মাস্টারমশাইরা তাঁকে স্কাউটস্ লিডার করতে চাইছেন, ছেলেদেরও একই ইচ্ছা, স্কুলের সুনাম নির্ভর করছে তাঁর ওপর, তাই তিনি মাস্টারমশাইদের কথায় রাজী হলেন।

বাঞ্ছারামপুর মাঠে সে এক অপূর্ব দৃশ্য - ব্যান্ড বাজিয়ে সব স্কাউটস্ টিম একে একে প্যারেড করছে। ঠাকুরের উজ্জ্বল গৌরবর্ণের উপর রোদ পড়ে চিক চিক করছে - সবার চোখ ঝলসে দিচ্ছে। সভাপতি ত্রিপুরার ওই মহকুমার এস.ডি.ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন হেড মাস্টারমশায়কে, 'ওই ছেলেটি কে? কি সুন্দর দেখতে - কি স্মার্ট!' সেই বর্ণাঢ্য সমাবেশে নানা রকমের কুচকাওয়াজ খেলা চললো – উজানচর- স্কুল-টিম স্কাউটিং-এ সবচেয়ে সেরা বলে গণ্য হ'ল। পঞ্চম জর্জের ফটো নিয়ে যখন ঠাকুর এবং তাঁর টিম মার্চ করে যাচ্ছেন গাইতে গাইতে,

মাঠের দর্শকরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করলো যে এ রকম মার্চ বাঞ্ছারামপুরে কেউ কখনও দেখেনি – ঘন ঘন হাততালিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। এস.ডি.ও এবং অন্যান্য অভ্যাগতরা বালক ঠাকুরের ক্রীড়া – নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে সদর গভর্নমেন্ট স্কুলে নিয়ে যেতে চাইলেন। সেদিন একটি দুর্ঘটনা মাঠে হয়েছিল - বালক ঠাকুরের হাত থেকে পঞ্চম জর্জের ফটোটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। ঠাকুর তখনই বললেন, “সামনের বছর পঞ্চম জর্জ আর থাকবে না।” ....বিজয়ী উজানচর স্কুলের স্কাউটস্ টিম ব্যান্ড বাজিয়ে গ্রামে ফিরে এল।

বালক ঠাকুরের সেদিনকার কথা শুনে তার সাথীদের অনেকেরই মনে হয়েছে বিপ্লবী সূর্য সেনের সেই কথা। কয়েক বছর আগে যখন বালক ঠাকুরের সঙ্গে সূর্য সেনের সাক্ষাৎ হয়েছিল, ঠাকুরের আচার-আচরণ, কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে সূর্য সেন বলেছিলেন, “তোমার ওপর আমার ভরসা আছে। এ রকম গভীর দেশাত্মবোধ আমি আর কারও মধ্যে দেখিনি। তুমিই পারবে দেশকে এক করতে, দেশকে বাঁচাতে।”

চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড় বা সীতাকুণ্ড হিন্দুদের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রত্যেক বছর, বিশেষ করে শিবচতুর্দশীতে দশদিন ধরে এখানে মেলা বসে – বহু সাধু-সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রীদের সমাগম হয়। বালক ঠাকুর আশু সেনের সঙ্গে চট্টগ্রামে গেলেন, তখন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে

উৎসবের সময়। তীর্থে যাবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর যান নি। আশু সেন পিতৃতুল্য, তাঁকে ঠাকুর জ্যেঠামশায় বলে ডাকেন। তাঁর অনুরোধ ফেলতে পারলেন না, সুতরাং দুজনে পাহাড়ে গেলেন। পাহাড়ে উঠবার পথে এক জায়গায় সাধু-সন্ন্যাসীদের বিরাট সমাবেশ দেখা গেল, প্রায় হাজার - বারশো সন্ন্যাসী হবে।

এক সন্ন্যাসী ভস্ম মেখে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে। যাত্রীরা ভোগের জন্য পয়সা দিয়ে যাচ্ছে দেখে বালক ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ধুনি জ্বালিয়ে যে বসেছ, কিছু উপলব্ধি হয়েছে?"

সন্ন্যাসী – নামে ডুবে আছি, ভগবানকে ডাকছি।

ঠাকুর – দেখে তো মনে হচ্ছে না কিছু হয়েছে। বাহ্যিক আড়ম্বরেই তো দেখছি ডুবে আছ। .... এই যে ত্যাগ, এ'তো ভড়ং ছাড়া কিছুই নয়।

সন্ন্যাসী – (চটে গিয়ে গম্ভীর-ভাবে) তুমি বাচ্চা শিশু, ভগবান সম্বন্ধে তুমি কি বুঝবে?

ঠাকুর – ক্রোধ তো পুরোপুরিই আছে! ......সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতার সাথে যদি যোগাযোগ থাকতো তবে একটিমাত্র বোধই থাকতো। জান কি, কে বাচ্চা, কে শিশু? একবারই আমাদের জন্ম। আবার আমাদের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। মৃত্যু নামে যা অভিহিত, সেটা হচ্ছে পরিবর্তন। সবাই আমরা পরিবর্তনের মাঝে পরিবর্তিত হ'তে হ'তে এগিয়ে চলছি

মিশে যাবার প্রচেষ্টাতে। তোমার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় নি। এখনও সাধু সাজবার শখ আছে। জ্ঞানের পূজা কর, সত্যের পূজা কর – তবেই সত্যিকারের আলোর সন্ধান পাবে।

ইতিমধ্যে আরও বহু সন্ন্যাসী এসে যোগ দিয়েছে। বাইরের লোকও অনেক জড় হয়েছে। সবাই বালক ঠাকুরের কথা শুনছে। ঠাকুর বলে চলেছেন, “এই বিশ্বজগতে যে যা কর্ম করছে, প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক শক্তি – বিরাটের শক্তি। সেই শক্তিকেই জাগাতে হবে, বাড়াতে হবে। আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে সত্য ও জ্ঞানের অনুশীলন। জ্ঞান ভিক্ষাই হচ্ছে প্রকৃত ভিক্ষা – সেখানে কোন আড়ম্বর নেই, অনুষ্ঠান নেই, আশ্রম নেই, গেরুয়া নেই বা ভস্ম নেই। ভিক্ষুক হবার প্রবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে জ্ঞানভিক্ষু হয়ে যাও। ধনীকে ছেড়ে ধ্বনির দুয়ারে জ্ঞান যাচঞ্ঞা কর।”

“সাধুর বেশে লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে পয়সা রোজগার ক’রছ। বিনা মূলধনে ধর্মের নামে চমৎকার ব্যবসা ক’রছ। তোমরাই সমাজকে বিভ্রান্ত ক’রছ। ভয়ভীতি দেখিয়ে, কর্মফল, শনি-রাহুর ভয় দেখিয়ে সমাজকে তোমরাই পঙ্গু করে দিয়েছ। ধর্মকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ। তোমাদের মত সাধু-সন্ন্যাসীই দেশের সব চেয়ে বেশী ক্ষতিকারক।”

একথা শুনে দশ-পনেরো জন সন্ন্যাসী তো চিমটা তুলে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ

নেই, তিনি বলেই চলেছেন, "এত জন তো এখানে একত্র হয়েছো। বুকে হাত দিয়ে বল দেখি; কার সত্যিকারের দর্শন হয়েছে। যদি সাহস থাকে বুক ঠুকে এগিয়ে এস।"

একজনও এগিয়ে আসছে না দেখে ঠাকুর আবার বললেন, "তোমরা বরং সব ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে যাও, ঘর-সংসার কর আর চুপচাপ থাক।"

এতে সন্ন্যাসীরা সবাই চটে গেল। এক মাতাজী কালভৈরবীর বেশে এগিয়ে এলেন।

মাতাজী – তুমি যে এত বড় বড় কথা বলছ, তুমি ভগবান সম্বন্ধে কি বুঝেছ বল।

ঠাকুর – চিনি মিষ্টি সবাই তো জান। কেমন মিষ্টি বোঝাতে পারবে? সেই মিষ্টত্ব স্বাদটাই আমার ভগবান, সেই মিষ্টত্বই আমি গ্রহণ করেছি। আর তোমরা গ্রহণ করেছ সংস্কারকে।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে 'অখণ্ড' যজ্ঞের এক আগুন জ্বলছে।

ঠাকুর – আচ্ছা সন্ন্যাসীদল! ফুঁ দিয়ে ঐ আগুনটা নেভাও দেখি, তোমাদের কত শক্তি!

সবাই মিলে ফুঁ দিল অনেকবার, কিন্তু কিছু হ'ল না।

ঠাকুর – তোমাদের ফুঁর জোর নেই। তোমাদের ফুঁতেই জোর নেই, ধর্ম শেখাবে কি করে? দেখ, আমি একটা ফুঁ দিচ্ছি।

ঠাকুর একটু ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের আগুন নিভে গেল। সন্ন্যাসীরা অবাক হয়ে দেখলো – এ কেমন হ'ল!

সকলে তখন হাত জোড় করে বললো, 'তুমি তো সাধারণ নও, তুমি অসাধারণ! এগিয়ে যাবার পথ বলে দাও, প্রভু।'

ঠাকুর – দেখ, ভগবান বলে আলাদা কিছু নেই, তাঁকে জানবার বিশেষ কোন রাস্তাও নেই। সবদিকই তাঁর রাস্তা, সবদিকই তাঁর দিক। তোমরা যেদিকে যাও, যে অবস্থায় যাও, শুধু জেনে নাও কোন জানার মধ্যে যাচ্ছ, কি জন্য যাচ্ছ। কি জানার দরকার – সেই জিনিসটাই জান, সেই জিনিসটাই বুঝে নাও।

সন্ন্যাসীরা – এটা কি করে নিভলো?

ঠাকুর – দেখ, এই যে বাতাস আসছে- এটাতে যখন আরও বেশী বাতাস দেওয়া যায়, তখন ঝড় ওঠে আকাশে, বৃষ্টি হয় কখনো কখনো। যাদের মাত্রাজ্ঞান আছে, তাদের যে শক্তি ও মাত্রা আছে, সেটাকেই তারা বাড়াতে চেষ্টা করে। তখন পঞ্চাশ কেন, হাজার হাত দূরে সে ফুঁ দেওয়া যায়। সুতরাং 'আছে' শক্তিকে-ই বাড়িয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রনাথ থেকে ফেরবার পথে ট্রেনে ভীষণ ভীড় হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা সব ফিরছে- গাড়ীর ছাদেও প্রচুর লোক। সবাই তীর্থ দর্শন করে ফিরছে, ট্রেনের মধ্যে তীর্থস্থান নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। এর মধ্যে হঠাৎ কে

একজন ‘চেন’ টেনেছে। শোনা গেল, একটি বাচ্চা গাড়ী থেকে পড়ে গেছে। গোঁসাই গাড়ী থেকে নেমে দেখলেন ভীষণ ভীড় – বাচ্চাটির আধ-মরা অবস্থা। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললো, ‘ভিতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, কাজেই বাচ্চাটির বাঁচবার আশা নেই।’ ঠাকুর তখন এগিয়ে গেলেন এবং একটু জল চাইলেন। হাতে একটু জল নিয়ে বাচ্চাটির গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। মিনিট দশেক পরেই বাচ্চাটি চোখ মেলে তাকালো। ঠাকুরের এই অলৌকিক শক্তি দেখে ভীড় আরও বেড়ে গেল। অনেকে জিজ্ঞাসা ক’রল, “কি করে এই মৃতপ্রায় শিশুটিকে বাঁচালেন?” বালক ঠাকুর বললেন, “এতে অবাক হবার কিছু-ই নেই, সবার ভিতরেই এই শক্তি রয়েছে। আমার বেলাতে সে শক্তি জেগেছে, তাই কার্যকরী হয়েছে। আপনাদের ভিতরে সেই শক্তি সুপ্ত আকারে রয়েছে, তাই কাজে লাগাতে পারছেন না। ফুল ফুটলে গন্ধ আপনি বের হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক শক্তির সেই বীজ যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তার বিকাশ হতে থাকে। শক্তির এই যে প্রকাশ, এটাই হ’ল বিভূতি। এই শক্তির যখন স্ফুরণ হয়, তখন সব কিছুই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। অসম্ভব যা, তাও তখন সম্ভব হয়।”

চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে ফিরেছেন। যখনই উজানচরে থাকেন, নিয়মিত স্কুলে যান, লেখাপড়া করেন। সাথীদের সঙ্গে খেলার মাঠেও যান। যতটা না খেলেন, তার থেকে খেলায় রেফারী হন বেশী। আবার যখনই ভক্ত-

শিষ্যের সমাগম হয়, তাদের সমস্যার সমাধান করেন, উপদেশ-নির্দেশ দেন। রাত্রি তাঁর কাটে ধ্যান-ধারণায়-আলাপে, বিশ্রাম তাঁর নেই বললেই চলে; কখনও কখনও দুই এক ঘণ্টা বিশ্রাম করেন রাত্রিতে মাটির ওপর কাগজে-মোড়া ইট মাথায় দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে সেই অবস্থাকে নিদ্রা বলা হলেও সেই সময়ে প্রায়ই অন্যত্র দূরবর্তী স্থানে চিন্ময়দেহে দর্শন দেন। দরিদ্র পরিবার, সুতরাং বাড়ীর সমস্ত কাজ – জল তোলা, বাসন মাজা, সময়ে রান্না সবই তিনি করেন। বাড়ীর কাজ করার সময়টুকু বাদে আর প্রায় সবসময়ই ভক্ত-শিষ্য পরিবৃত হয়ে থাকেন এবং বাস্তবের কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়ে তোলেন সবার মধ্যে, আবার পরিপক্ক আম পাড়তে গাছেও ওঠেন। মাঝে মাঝে এত উঁচুতে উঠে যান, এত সরু ডালে চলে যান যে, সেখানে উঠতে চেষ্টা করলে অন্য ছেলেরা পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে বসবে। অন্যের গাছের ডাল হয়তো বাড়ীর সীমানার বাইরে গিয়ে পড়েছে, সাথীদের নিয়ে সেখান থেকে তিনি আম পেড়ে আনেন। এমনি একদিন যখন আম পাড়ছিলেন, বাড়ীর বৌ বকাবকি করতে লাগলেন; তিনি জানতেন না যে ঠাকুর গাছে উঠেছেন। বকাবকি শুনে ঠাকুর বললেন, “দাদার গাছ থেকে আম পাড়ছি, দাদা তো কই বকছেন না। তুমি বৌঠান, পরের বাড়ীর মেয়ে। তোমার বাড়ীতে গিয়ে আম পাড়লে তুমি তখন বকা দিও।” গ্রাম-সম্পর্কে দাদা তখন বাড়ীতে ছিলেন- তিনি

তাঁর স্ত্রীকে হেসে বললেন, “কেমন, হ’ল! এবার জবাব দাও।” এ গাছ, সে গাছ করে আম পাড়া শেষ হলে বৌঠানকে ষাট-সত্তরটি আম দিয়ে এলেন। সবাইকে কিছু কিছু আম দিলেন তো বটেই, আবার কিছু আম নিজে কেটে সবাইকে খাওয়ালেন। কাছারীর দরওয়ান, পেয়াদা, পিওন - কেউ বাদ পড়লো না।

আবার এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে যে রকম শক্তির প্রতিযোগিতা হয়, তাও যে হতো না তা নয়। একদিন হ’ল, কাছারী বাড়ীর সীমানা নির্দেশ করে একটি পাকা দেওয়াল ছিল, সেটা কে ভাঙতে পারে - এই প্রতিযোগিতা। প্রথমে সবাই একা একা চেষ্টা করলো, শেষে পাঁচ-সাত জন একত্রে চেষ্টা করলো। কিন্তু দেওয়াল একটুও নড়ে না। ঠাকুর তখন বললেন, ‘দ্যাখ, আমি একবারেই ফেলে দিচ্ছি’ - তাঁর ধাক্কায় তাসের ঘরের মত দেওয়াল পড়ে গেল। সাথীরা অবাক হয়ে বললো, ‘তোমার গায়ে কী জোর!’ ঠাকুর উত্তর দিলেন, ‘জোর হবে না! আমি নিয়মিত ব্যায়াম করি। তোমরা তো আর ব্যায়াম করবে না, হবে কি করে!’ দেওয়ালটা ভেঙ্গে পড়ার পর ভয় হয়ে গেল যে, নায়েব মশাই ভীষণ রাগ করবেন। চুন-সুরকি আর পাবেন কোথায়- তাই বালি, মাটি দিয়েই সবাই মিলে দেওয়ালটি আবার গেঁথে ফেললেন। [কিছুদিন আগে যখন কয়েকজন ভক্ত উজানচর-কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন, তাঁরা দেখে এসেছেন যে অনেক দেওয়ালই আজ ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু ঐ দেওয়ালটি ঝড়-তুফান সব কিছু সহ্য করে

আজও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচা হাতের গড়া অমসৃণ দেওয়ালটির ৪০/৪৫ বছরেও কিছু হয়নি]।

কথা প্রসঙ্গে, খেলায় রেফারী হওয়ার একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি। তখনকার দিনে গোলকীপার বল ধরলে অপর পক্ষের খেলোয়াড়রা তাকে চার্জ করে বল কেড়ে নিতে পারতো - আইনে বাধতো না। একটা গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচ খেলা হচ্ছে – নিরপেক্ষ রেফারী হিসাবে ঠাকুরকে রেফারী করা হয়েছে। গোলকীপার বল ধরেছে, অপরপক্ষের ফরোয়ার্ড লাইনের প্লেয়াররা তাকে চার্জ করলো। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ফাউল দিয়ে বসলেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল – এভাবে চার্জ করলে ফাউল হয় না। ঠাকুর কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল - তিনি বললেন যে, গোলকীপারকেও খেলতে দিতে হবে, যে গোলরক্ষা করছে তাকে একটু বেকায়দায় চার্জ করলে সে মারাও যেতে পারে, সুতরাং চার্জ করার এই আইন বদলানো উচিত। ঠাকুরের অকাট্য যুক্তি সেদিন সবাই মেনে নিয়েছিল [ঠাকুরের সেদিনকার রায় আজ ফুটবলে এক অলঙ্ঘনীয় আইন]। যেখানে যেখানে ঠাকুর রেফারী হয়েছেন, সেখানেই এই আইন চালু হয়।

মানবজীবনের অনেক সমস্যার মধ্যে দুরারোগ্য রোগ একটি প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বহু রোগী ঠাকুরের কাছে আসে। আবার রোগীকে না আনতে পারলে, তাঁকেই রোগীর বাড়ী নিয়ে যায়। ১নং ঢাকেশ্বরী

মিলসের এক পদস্থ কর্মচারী টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। ডাক্তারেরা আর ভরসা দিতে পারছেন না - এমনিতে রোগী যতদিন টেকে টিকবে। তখনকার দিনে টিবি রোগের সেরকম ভাল ওষুধ ছিল না। আত্মীয়দের কাছে বালক ঠাকুরের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা শুনে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তারা আকুতি জানালো। ঠাকুর একদিন সময় করে গেলেন সেখানে। ঠাকুরের স্পর্শে রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন – ডাক্তারেরা তো দেখে অবাক! যে রোগীর বাঁচার আশা নেই, তিনি কি করে এত তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করে ওঠেন! শীতলক্ষ্যার পাড়ে [শীতলক্ষ্যার পাড়ে গোদনাইল], নারায়ণগঞ্জের কাছে এই জায়গাটিতে ঠাকুরের বেশ কয়েকদিন থাকতে হ'ল। আশপাশের গ্রাম থেকে, অন্য মিল থেকে বহু লোক এসে দীক্ষা নিলো – ঠাকুরকে তারা লঞ্চে করে নিয়ে গেলো ওপারে চিত্তরঞ্জন কটন মিলসে। সেখানেও বহুলোক দীক্ষা গ্রহণ করলো।

আর একবার বালক ঠাকুরকে ঢাকেশ্বরী কটন মিলস-এ আনা উপলক্ষে একটা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। কালীসাধক প্রহ্লাদ দাস সেখানে পালাকীর্তন করে আসর জমিয়ে তুললো। ঠাকুর মন দিয়ে কীর্তন শোনেন। প্রহ্লাদ দাস বালক ঠাকুরের থেকে বয়সে অনেক বড় – বাচ্চা ঠাকুরকে দেখে তার সেরকম বিশ্বাস আসে না। সে কিছু অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখতে চায়। ঠাকুর বললেন, 'ঠিক আছে, দরজা জানলা বন্ধ করে দাও।

আলোটা নিভিয়ে দাও। আমাকে ধরে বস।’ কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বেলে দেখে - ঠাকুর আসনে নেই, সে শুধু আসনটা ধরে বসে আছে। ঘরের মধ্যে যারা ছিল, সবাই মিলে দরজা খুলে ঠাকুরকে খুঁজতে বে’র হল। খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে পৌঁছে দেখে – ঠাকুর সেখানে আসনে বসা। কাছে গিয়ে প্রণাম করতে যায় – দেখে, ঠাকুর নেই। কোথাও আর খুঁজে পায় না। শেষে ঘরে ফিরে এসে দেখে, আগের মতই ঠাকুর আসনে বসে আছেন।

পরের দিন প্রহ্লাদ দাস এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে বাঁধানো পুকুরের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলেন ঠাকুর। নামতে নামতে জলের কাছে এসে পড়লেন। কিন্তু হাঁটা বন্ধ না করে খড়ম পায়ে দিয়েই জলের ওপর দিয়ে হেঁটে দীঘির ওপারে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ওপারে পৌঁছে আবার জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলেন। প্রহ্লাদ দাস তখন বুঝলো যে, জল আর স্থল যার কাছে সমান, যিনি মুহূর্তে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারেন, তিনি মানুষের পর্যায়ে পড়েন না। প্রহ্লাদ দাস সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তার অবিশ্বাসের জন্য ক্ষমা চায়, কিন্তু দীক্ষা নেয় না।

কয়েকমাস পরের কথা, বালক ঠাকুর তখন উজানচর-কৃষ্ণনগরে। প্রহ্লাদ দাস তার গুরু নাম-করা তান্ত্রিক শ্রদ্ধানন্দ গিরির নির্দেশে একুশ দিন নারায়ণগঞ্জের পাঁকোণা শ্মশানে সাধনা করতে থাকে। এ শ্মশানটি খুবই

ভয়াবহ স্থান, অতি বড় সাহসীও এখানে থাকতে ভয় পায়। সাধনা করতে করতে সে হঠাৎ ভয় পায়। ভয় পেয়ে ‘গুরুদেব’ বলে চেঁচিয়ে উঠে অজ্ঞান হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে বালক ঠাকুর এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বসেন। - তখন শেষ রাত্রি। কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে আসে, দেখে বালক ঠাকুর তাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। ওর গুরু বলেছিলেন, ‘যতক্ষণ তুমি শ্মশানে, ততক্ষণ আমি আসনে।’ ওর গুরু ওকে দেখলেন না। সম্বিত ফিরে পেয়ে প্রহ্লাদ দাস জিজ্ঞাসা করলো, ‘তুমি তো উজানচরে ছিলে, এখান থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে, তুমি এ সময়ে এলে কি করে?’ ঠাকুর বললেন, ‘বিপদে পড়ে ডাকছো, তাই চলে এলাম।’ প্রহ্লাদ দাস বললো, ‘তুমি না এলে এ যাত্রা আমি বাঁচতাম না।’

এতদিনে প্রহ্লাদ দাসের সব দ্বিধা কেটে গেল, উজানচরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে জীবন সার্থক করলো। সহজ পথের সন্ধান পেয়ে তন্ত্র–সাধনার পথও ছেড়ে দিল সে।

দিদিমার অনেকদিনের ইচ্ছা এক পবিত্র যোগে গঙ্গাস্নান করে আসেন, কিন্তু কে তাঁকে নিয়ে যাবে, কোথায় গিয়ে উঠবেন? কত লোক কলকাতা যাবার মনস্থ করেছে - তারা গিয়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়ী উঠবে - সেই বিরাট যোগের পুণ্য মুহূর্তে গঙ্গাস্পর্শ করে জীবন সার্থক করবে। দিদিমা তাঁর প্রিয় নাতির অপেক্ষায় থাকেন। কি একটা কাজ উপলক্ষে বালক ঠাকুর এসেছেন দোগাছিতে।

দিদিমা এই-কথা সেই-কথা বলতে বলতে আক্ষেপ করতে লাগলেন, ‘কত লোক তো কলকাতা যাচ্ছে, এই বিরাট যোগের মধ্যে গঙ্গাস্নান করবে। আমাকে কে নিয়ে যাবে? এই যোগের মধ্যে যদি একটু গঙ্গাস্পর্শ করতে পারতাম!’ ঠাকুর শুনে বললেন, ‘এ আর বেশী কথা কি! যোগের মধ্যে তোমাকে গঙ্গাস্নান করালেই তো হ’ল। বেশ, আমি তার ব্যবস্থা ক’রব, তুমি চিন্তা কোর না।’ যোগের দিন যত এগিয়ে আসছে, দিদিমা নাতিকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ‘কই, আমাকে গঙ্গায় একটা ডুব দিতে নিয়ে যাবি না?’ ঠাকুর বললেন, ‘ব্যস্ত হ’চ্ছ কেন, তোমাকে গঙ্গাজলে স্নান করালেই তো হ’ল।’ যত দিন যাচ্ছে দিদিমা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন, কিন্তু নাতির ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস – যে করেই হোক গঙ্গাস্নান তিনি করাবেনই। ইতিমধ্যে বাড়ীর ছাদের ওপর ঠাকুর সব ব্যবস্থা করেছেন। দিদিমাকে বলেছেন, ‘তোমার জন্য গঙ্গাকে দোগাছি বাড়ীর ছাদেই নিয়ে আসব। দিনক্ষণ দেখে তুমি তৈরী হয়ে নিও।’ দিদিমা এসেছেন পুণ্যস্নান করতে – কলকল করে কোথা থেকে জল এসে ছাদে ভরে গেল। দিদিমা সেই অপূর্ব পূতগন্ধময় গঙ্গার জলে অবগাহন করে তাঁর গঙ্গাস্নানের সাধ মেটালেন।

পূজার ছুটির কিছুদিন পূর্বে ঢাকা গেলেন। রূপবাবু-রঘুবাবুর যে উজানচরের জমিদারী সেরেস্তায় বালক ঠাকুরের পিতা কাজ করেন, ঢাকায় সেই জমিদারবাড়ী থেকে আকুতি জানিয়েছে, যদি বালক ঠাকুর

দয়া করে একবার তাঁদের বাড়ীতে পদধূলি দেন! জমিদার বাড়ীর থেকে লোক এসে ঠাকুরকে নিয়ে গেল, সঙ্গে বিখ্যাত সেতার বাদক শ্যামবিনোদ ঘোষ এবং আরও অনেকে গেলেন। ভক্তিমূলক সঙ্গীতের আর কীর্তনের মূর্ছনায় এক অপূর্ব পরিবেশ গড়ে উঠলো। প্রেম-ভক্তির যে জোয়ার সেদিন বয়ে গিয়েছিল, তা অনেকের মনেই গেঁথে আছে। জমিদার বাড়ীর অনেকেই সেদিন দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

বালক ঠাকুরের জন্মোৎসব অনেক জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হয়। যার যার সাধ্যমত ব্যবস্থা করে। সেবার ঠাকুর জন্মোৎসবে ছিলেন দোগাছিতে ভক্তদের অনুরোধে। এত লোকের সমাগম হয়েছিল আর এত আয়োজন হয়েছিল যে, খিচুড়ি রাখার পাত্রের অভাব হয়ে পড়লো। তখন এক বড় নৌকার খোল পরিষ্কার করে নতুন হোগলা পেতে তার ওপর খিচুড়ি রাখা হ'ল। প্রসাদ হিসাবে খিচুড়ি, লাবড়া দেওয়া হ'ল। সারাদিন পূজা, গান, কীর্তন চললো মহাসমারোহে।

বিকালবেলা সাথীদের নিয়ে নৌকা করে খালের দিকে বেরিয়েছেন। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে সাতটা হ'ল। এদিকে মামাবাড়ীতে সবাই তাঁর পথ চেয়ে বসে আছেন। পূজার বাড়ী - বাইরের অনেক লোকজন আছে বাড়ীতে, সুতরাং মামাতো ভাই সুধাংশু ভট্টাচার্যের মেয়ের হার আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। একমাত্র ভরসা ঠাকুর। ঠাকুর বাড়ী ফিরতেই মামা হেরম্বনাথ বললেন,

'ভাগ্নে, পূজার দিন, কল্যাণীর হারটি গেল! তুমি একটা ব্যবস্থা কর।' ঠাকুর বললেন, 'চিন্তা করবেন না, - পাবেন।' সবাই মিলে ধরলেন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে। ঠাকুর বললেন, 'উঠানের ধারের আমগাছটার গোড়ায় গিয়ে দেখুন একটা জায়গায় সদ্য মাটি খোঁড়ার চিহ্ন। ওখানে হারটি পাবেন।' একটু খোঁজ করতেই দেখা গেল, এক জায়গায় সদ্য মাটি খোঁড়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। - কিছু মাটি তোলার পর হারটি পাওয়া গেল। হারটি পাওয়া যাওয়াতে সবাই খুশী হলেন। কেউ কেউ জানতে চাইলেন কে এই অপকর্ম করেছে। ঠাকুর কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কারও নাম বলতে তিনি চাইতেন না।

দোগাছি থেকে ঢাকা হয়ে ফিরছেন কৃষ্ণনগরে। সঙ্গে প্রচুর মালপত্র। গয়নার নৌকা চলেছে পাল খাটিয়ে হাওয়ার অনুকূলে। হাল ধরে বসে আছে উদয় মাঝি, সঙ্গে আছে হাইরা। ঠাকুর বললেন, 'আমাকে কৃষ্ণনগর ঘাটে নামিয়ে দাও – সঙ্গে অনেক মালপত্র আছে তো!' উদয় মাঝি গা করে না। হাওয়ার টানে তর তর করে গয়না নৌকা এগিয়ে চলেছে, মাঝখানে না থামিয়ে একেবারে উজানচর ঘাটে গিয়েই সে যাত্রীদের নামিয়ে দেবে। ঠাকুর আবার বললেন, 'আমার সঙ্গে ভারী ভারী মালপত্র আছে, কৃষ্ণনগর ঘাটে একটু লাগাও - আমি নেমে যাই।' উদয় মাঝি কথা শোনে না। সোজা উজানচর ঘাটে নিয়ে যাবে। ঠাকুর বললেন, 'ঠিক আছে, আমার কথা

শুনলে না, কৃষ্ণনগরে নামিয়ে দিলে না; দেখি গয়না আমার কথা শোনে কিনা।’ বলতে বলতে গয়না উল্টোদিকে ঘুরে গেল। উদয় মাঝি তো হাল ধরে বসে আছে - অবাক হয়ে সে বলে, ‘এ কি করে হ’ল?’ ঠাকুর বললেন, ‘তুমি হাল ধরে বসে থাক, গয়না আমাকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাচ্ছে।’ একেবারে বিপরীত দিকে হাওয়ার বিরুদ্ধে চলতে দেখে উদয় মাঝি হতভম্ব হয়ে গেল। কৃষ্ণনগরে পৌঁছতেই ঠাকুর আস্তে নেমে গেলেন। সেদিন থেকে উদয় মাঝি বালক ঠাকুরের কথা অমান্য করতে আর কোন দিন সাহস করে না।

উজানচরে ফিরে এসেছেন ঠাকুর। স্কুল নিয়মিত শুরু হয়ে গেছে। নায়েব ত্রৈলোক্য সোমের পুত্র বিনয় সোম বি.এসসি. পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন। সেদিন ক্যালকুলাসের অঙ্ক নিয়ে বসেছেন, কিন্তু কিছুতেই ফল মিলাতে পারছেন না। একটা অঙ্ক নিয়েই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। বালক ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেখলেন বিনয় সোমের অবস্থা; বললেন, ‘কি বিনয়দা, অঙ্ক মিলাতে পারছো না? আমি করে দেব?’ বিনয় সোম অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে তাকান, - ছেলেটা বলে কি! ক্লাস সিক্সের ছেলে বলে কিনা ক্যালকুলাসের অঙ্ক করে দেবে! যাই হোক, বিনয় সোম বললেন, “ঠিক আছে, কর দেখি!” ঠাকুর বললেন, “জিনিসটা কি, আমাকে একটু বাংলায় মোটামুটি বুঝিয়ে দাও, আমি করে দিচ্ছি।” ক্যালকুলাসের অঙ্ক কি জিনিস বিনয় সোম একটু বললেন। ঠাকুর কয়েক

মিনিটের মধ্যে অঙ্কটি কষে বললেন, “দেখতো, ফলটা মিললো কিনা।” আশ্চর্য হয়ে বিনয় সোম বললেন, “কি করে করলে?” ঠাকুর বললেন, “তা বলতে পারব না, তবে যে কোন অঙ্ক করে দিতে পারব।” বিনয় সোম কঠিন কঠিন অঙ্ক বেছে বালককে দিলেন – বালক চটপট অঙ্কগুলো করে উত্তর মিলাতে বললেন। বিনয় সোম অবাক, সব কটারই উত্তর নির্ভুল! বিনয় সোমের সেদিন চক্ষু খুলে গেল। এ নিয়ে অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের সাথে বিনয় সোম কথা বলেছেন। তিনিও শুনে হতভম্ব।

কৃষ্ণনগরের কাছারী বাড়ীতে অনেকে সেদিন এসেছে। ঢাকা থেকে মহম্মদ আলি, দ্বিজেন চক্রবর্তী, - বিনয় সোম, বিজয় সোম, নরেশ দাসও উপস্থিত। নরেশ দাস মাঝে মাঝে ঠাকুরকে গীতা পড়ে শোনাতো, - নানা দিক থেকে ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে তার মনে খটকা লেগেছিল যে, কাকে সে গীতা শোনাচ্ছে? সেদিন সে বলেই ফেললো, “তুমি তো আত্মগোপন করে রয়েছো।” যাই হোক, ঠাকুর বললেন, “তোমরা সবাই জাপটে ধরে রাখো আমাকে, যাতে আমি চলে যেতে না পারি।” ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে বাইরে ঠাকুরের গলা শুনে ওদের খেয়াল হ’ল ঠাকুর তো ঘরে নেই। তবে কাকে তারা জাপটে ধরে আছে! - আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে দেখলো যে, নিজেরাই জাপটা-জাপটি করে বসে আছে, ঠাকুর নেই। উঠে দরজা জানালা পরখ করে দেখে, সব ঠিকমত বন্ধই

রয়েছে। দরজা খুলে বেরিয়ে ঠাকুরকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে তারা নদীর ঘাটে পৌঁছলো। দেখে ঠাকুর সেখানে বসে আছেন। নরেশ দাসের অহংকার ছিল যে, সে গীতার ব্যাখ্যা ভাল বোঝে এবং গীতা সম্বন্ধে তার খুব জ্ঞান আছে। সেদিন সে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালো যে, তার সকল দম্ভ চূর্ণ হয়েছে। মহম্মদ আলি নদীর ঘাটেই দীক্ষা নিতে চাইল।

আর একদিন কাছারী ঘরে অনেকেই এসেছেন – আশু সেন, ত্রৈলোক্য সোম, প্রকাশ বল, হাজী মিঞা, জিন্নত আলি, অনুকূল, হরিচরণ ছাড়াও আরও অনেকে। সবাই ঠাকুরকে ধরলেন, ‘একটা কিছু দেখাও।’ আশু সেন প্রস্তাবটা উত্থাপন করলেন। ঠাকুর বললেন, ‘কি দেখতে চান? ....আচ্ছা জ্যেঠামশায়, আপনি তো খুব কালীভক্ত। মা কালী তো অনেকদিন ধরে মহাদেবের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে – মহাদেবকে বলি এবার একটু নড়েচড়ে পা টান করতে - কি বলেন?’ আশু সেন বললেন, ‘পারবে তুমি? হবে?’ দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারটির দিকে তাকিয়ে ঠাকুর জবাব দিলেন, “হবে না মানে, হতে বাধ্য। মহাদেবের বাবা এখানে বসে রয়েছে।” জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে একটু রগড় করে বললেন, “তবে এবার মহাদেবকে বলি - বাবা শম্ভুনাথ, কত কাল তো একভাবে শুয়ে আছো, এবার একটু নড়ে চড়ে শোও।” যেমনি বলা, অমনি ক্যালেন্ডারের ছবিতে মহাদেবের পা দু’খানি নড়েচড়ে ভিন্ন ভঙ্গী নিল।

[মহাদেবের পদযুগলের পরিবর্তিত অবস্থার এই ক্যালেন্ডারের ছবিটি বাঁধিয়ে রাখা হয়েছিল। আজও সেই ফটো এক ভক্তের কাছে আছে। এই ক্যালেন্ডারেরই আর একটি পূর্ববর্তী অবস্থার ছবি আশু সেনের কাছে ছিল] সকলে তো অবাক – এ কি করে সম্ভব!

ঠাকুর আবার বললেন, “মহাদেবকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। যদি বলেন তো জ্যেঠামশায়, কালীকে এবার ফটো থেকে নামিয়ে এনে আপনাদের কাছে হাজির করি।” আশু সেন উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললেন, “সে তো অতি উত্তম কথা।” ঠাকুর বললেন, “তবে তাই হোক।” যেই বলা, ক্যালেন্ডার থেকে ঝনাৎ করে কালী নেমে এলেন বিশাল রূপ নিয়ে, মহাদেব একা শুয়ে রইলেন। জীবন্ত মা কালীকে সামনে দেখে সবাই ভয়ে অস্থির। মা কালী হাত পা নাড়ছেন, মনে হচ্ছে খড়্গাটা এখনি কারো ঘাড়ে পড়বে। জিন্নত আলি এবং আর যাঁরা দরজার কাছে ছিলেন তাঁরা ভয়ে ছুট দিলেন। আশু সেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসে রইলেন। আর যারা ভিতরে ছিলেন তাঁদের অবস্থাও সঙ্গিন - যতই মা কালীর ভক্ত হ’ন না কেন – ওই দৃশ্য কেউ সহ্য করতে পারছেন না। একজন তো খাটের তলায় গিয়ে লুকালেন। সকলেই অনুরোধ করতে লাগলেন, “গোঁসাই, মা কালীকে যথাস্থানে নিয়ে যাও - আমরা তো আর সইতে পারছি না।” ফটোতে বা মা কালীর মূর্তিতে যতই প্রণাম করুন না কেন, জীবন্ত কালীর উপস্থিতি কেউই বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলেন

না। ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, মা কালীকে তাহলে এবার নিজ স্থানে ফিরে যেতে বলি।" সঙ্গে সঙ্গে মা কালী অন্তর্হিত হলেন, ক্যালেন্ডারের ছবিতে আবার আগের মতই মা কালী শিবের উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা পরিবর্তন কিন্তু থেকে গেল। মহাদেব যে পায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেছিলেন, সেটা রয়েই গেল।

পরের দিন আশু সেন বললেন, "মা কালী নিয়ে কি এরকম করবে না কি?" ঠাকুর বলেন, "না, আপনারা দেখতে চাইলেন তাই একটু দেখালাম।"

"আচ্ছা, তাহলে আমাদের দর্শন হয়ে গেল তো?" – আশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

ঠাকুর বললেন, "আপনারা যা দেখেছেন তার ওপর আমি কোন গুরুত্ব দিচ্ছি না। স্বপ্নে যেমন দেখে, এটা সেই রকম। আপনাদের মনটা স্বপ্নের স্তরে নিয়ে গিয়েছি, কিন্তু আপনাদের জাগ্রত অবস্থায় রেখেছি। স্বপ্নের দরুন যে মা কালী দর্শন হয়, তার ওপর ভিত করা চলে না, নির্ভর করা চলে না। শুধু দেখে তৃপ্তি। সেটা ঘুমন্ত অবস্থা – আপনার নিজস্ব কোন বুদ্ধি চালাতে পারবেন না। আপনার মাত্রাটা নিয়ে গেছি স্বপ্নে - স্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু ঘুমিয়ে নয়। স্বপ্ন যারা দেখে, তারা অনেক সময় বোঝে যে তারা স্বপ্ন দেখছে। তখনকার অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য ভিতরের জ্ঞানচক্ষু, বাস্তব চক্ষু খুলে যায়। থার্মোমিটারে যেমন তাপ দিলে ৯৬° থেকে ১০০° ডিগ্রী, এমন কি ১১০° ডিগ্রী পর্যন্ত তোলা যায়, তেমনি মাত্রাটা বাড়িয়ে

দিলাম। মাত্রা বাড়ালেই ঘুম আসবে, কিন্তু ঘুমটাকে আসতে দিলাম না, যাপ্য করে রাখলাম। ঘুমটা সরিয়ে দিয়ে বাস্তব জ্ঞান, বাস্তব বুঝটা প্রতিষ্ঠিত করে দিলাম। যেমন এক গাছের মধ্যে আর এক গাছ লাগিয়ে দেয়। স্বপ্নে মানুষ কত কিছু দেখে; দেখে - স্নান করছে, দৌড়াদৌড়ি করছে, আরও কত কি! সেটা না করে মা কালীকে দেখিয়ে দিলাম। স্বপ্নের স্তরে গেলে স্বপ্ন দেখবেই। অন্য দিকে যাতে মন না যায়, তার জন্য মনকে ঠিকমত চালনা করে করে এক পাশে রেখে দিলাম।”

“আপনাদের দেখলে শ্রদ্ধা বাড়বে, ভাল লাগবে তার জন্য ঘুমন্ত অবস্থায় না রেখে সেই স্তর, সেই মাত্রা সব কিছু রেখে দেখিয়ে দেওয়া হ’ল। এটার ওপর ভিত করবেন না, কিন্তু এটার ওপর একটা গুরুত্ব দিতে পারেন। এই ঘুমন্ত অবস্থা আর জাগ্রত অবস্থার সুর যদি এক করতে পারেন, তবেই আপনি সাফল্য লাভ করবেন। এই বাস্তবে জাগলে সেটা থাকে না, মাত্রা নেমে যায়।”

“ঘুমন্ত সমাধি, -সমাধিটা বড় কথা আপনারা ভাবেন, কিন্তু এই সহজাত সমাধিটার উপকারিতা কি? প্রকৃতির ধারায়, প্রকৃতির মহাদানে কেন ঘুম দিল? – এই সমাধিটাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। এই সমাধি অবস্থায় বাস্তবের শত অবস্থা, ছাঁকনী দিয়ে যেমন ফিল্টার হয়, তেমনি (পরিশ্রুত) ফিল্টারড হয়ে যায়। ঘুমন্ত সমাধির ফিল্টারে মনটা এমন সুন্দর স্বচ্ছ হয়, যেটা বাস্তবে করা সম্ভব নয়। এই সমাধি অবস্থায় অতি কঠিন কাজ অতি

সহজে হয়ে যায়। মনে করলো উড়ে যাবে, অমনি উড়ে যায়- সে তখন ভাবে না যে সে পড়ে যেতে পারে। তার কারণ, জন্মগত যে সহজাত ধারা আছে, সেটা প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে জেগে যাচ্ছে তো, তাই ঘোলাটে অবস্থাটা আর থাকে না। আবার জাগলেই ঘোলাটে হয়ে যায়। ঐ অবস্থাটাকে মনের 'মুভি' ক্যামেরা দিয়ে জাগ্রত অবস্থায় যদি রাখতে পারা যায়, তবে তো আর কোন কথাই থাকে না, জ্যাঠামশাই।"

"আমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, প্রতিটি স্তরে, প্রতি আঙ্গুলের নড়াচড়ার মধ্যে আমাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতি স্বয়ং বুঝিয়ে দিচ্ছে – প্রতি লোমকূপে লোমকূপে বুঝিয়ে দিচ্ছে আমার চলার পথের গতি। এই প্রকৃতির গ্রন্থের আপনি নিজেই একটি মহান দৃষ্টান্ত – প্রতিটি জীবই এক একটি দৃষ্টান্ত।"

"প্রতিদিন যে যোগ অভ্যাস করছেন, যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হচ্ছেন, প্রকৃতি এই সমাধিটা এমন গেঁথে দিয়েছে যে আপনাকে গুছিয়ে নেওয়ার পক্ষে, চালিয়ে নেওয়ার পক্ষে কোন অসুবিধা হবে না। অযথা ঘুমটাকে ব্যবহার করে সময় নষ্ট না করে ঘুমের সমাধিকে কেন্দ্র করুন। ঘুমের সমাধি হচ্ছে বাস্তবে চলার পথে এক বিরাট অবলম্বন।"

"যেটা আমি দেখালাম, আমি আমার সহজাত (instinct) শক্তির মাধ্যমে করেছি, অন্য কিছু নয়।"

আশু সেন – না হে! একথা বললে চলবে না। তুমি তো আমার বাচ্চার মত। আমি তো জানি! দেখতে পাচ্ছি, তুমি কত বড় চিকিৎসক, কত বড় মিস্ত্রী। প্রকৃতি স্বয়ং তোমাকে বড় মিস্ত্রী করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ঠাকুর – আপনাদের সবার শুভচিন্তাতে, শুভদৃষ্টিতে আমি যেন তার থেকে চ্যুত না হয়ে পড়ি। সেই সমাধি থেকে যেন আমি চিরন্তন সমাধির পথে এক গতিতে চলে যেতে পারি।

আশু সেন – না হে, তুমি চ্যুত হবার নও।

ঠাকুর – মানুষ যায় বনে-জঙ্গলে সাধনা করতে – আমি চাই সমাজের ক্লেদ পঙ্কিলতা দূর করতে। সেই বনে-জঙ্গলে আমি সেই বীণাই বাজাতে চাই, সেই সুরবীণাই বাজাতে চাই। আলাদা করে নয়, শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি না, সবাইকে নিয়ে চিন্তা করতে চাই, সবাইকে নিয়ে বাজাতে চাই।

আশু সেন – তুমি তো বিরাট কর্মী- নীরব কর্মী। তোমার তো এখানে এসে কোন কিছু করার প্রয়োজন হয় নি, তুমি সব নিয়েই এসেছ। তাই আমরা পাচ্ছি তোমার কৃপায়। এটা আমাদের বহু জন্মের মহানদের আশীর্বাদ, তাই তোমার সংস্পর্শ লাভ করে আমরা ধন্য হয়েছি।

একজন বলে উঠলো, ‘প্রকৃতি আমাদের সব বুঝিয়ে দিলেই তো পারতো, তবে তো আর কোন সমস্যা থাকতো না।’

ঠাকুর – প্রতি ক্ষণে ক্ষণে চলছে আমাদের ধ্যান-ধারণা-যোগ। এক মুহূর্তের যদি লক্ষ ভাগ কর, তাও তুমি ধ্যান বা সমাধি ছাড়া নও। ‘অমনি করে বস, এমনি করে বস, অমনি করে তাকাও’, অন্তর্যামিত্বহীন দেশে সবটাই একই ধারায় আছে। কেন অন্তর্যামিত্ব দিল না? কেন অজ্ঞানতা দিল? কেন অন্ধকারে আমরা বাস করছি? কারণ ওটাই হ’ল সমাধির অঙ্গ। সমাধির ধারায় আছ বলেই অন্তর্যামিত্বের প্রয়োজন হয় না। তুমি সমাধির সুরে বীজের মত পড়ে আছ – কিন্তু সমাধিকে তোমাকে ধরতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। যা আছে, তাই নিয়ে চলতে হবে। নতুন করে তোমার টেনে আনবার কিছুই নেই। যে ছক-বাঁধা গুটি রয়েছে, যে ভাষার অক্ষরগুলো রয়েছে, যে স্বরগ্রামগুলো আছে, তা দিয়েই তোমার চলতে হবে। তোমার যা আছে - মহান প্রকৃতির সুরকে জানার পক্ষে, উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট। এই দেহই হ’ল তার মহান যন্ত্র। সুতরাং ভুলে যেও না যে, এই যন্ত্রের মূল্য কত বিরাট! এই যন্ত্র স্বয়ং এই মহাশূন্যের থেকে সৃষ্টি হয়ে কত বড় হয়েছে! এই যন্ত্রের মাধ্যমে তোমায় জানিয়ে দিয়েছে – এত কৃপা পেয়েও যদি আমরা বঞ্চিত হয়ে থাকি, তা হলে আমাদের থেকে অভাগা আর নেই। এ যন্ত্র শুধু চালাবার জন্য নয়, খাওয়া-পরা, ভোগের জন্য নয়। যন্ত্র পড়ে থাকলে বিকল হবে, তাই কখনো কাম, কখনো ক্রোধ, কখনো লোভ, কখনো মোহ, যা ভাষায় বলে, - দিয়েছে। দেহ থেকে এগুলোর উদ্রেক হচ্ছে যন্ত্রগুলো

চালিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, যে পর্যন্ত না তোমার সমস্যা সমাধান, সফলতা বা সিদ্ধির পথে না যায়। তুমি ভেবেছো সামান্য বিষয়বস্তু দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করবে - কাম চাইলো কাম দিলে, ক্রোধ চাইলো ক্রোধ দিলে, খাওয়া চাইলো খাওয়া দিলে - এগুলো দেবে - কিন্তু গাড়ীতে যেমন তেল দৌড়ায় না, আবার তেল ছাড়া গাড়ী দৌড়ায় না, তেমনি সামান্য ক্ষুধা নিবারণের জন্য এ যন্ত্র নয়। কিন্তু খাওয়া দরকার, কাম দরকার – এগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এই দেহটাকে চালিয়ে রেখে মহাকাশের তত্ত্বকে সত্যিকার উপলব্ধি করার পথের সাহায্যকারী হিসাবে। তাঁর মহাদান, তাঁর সৃষ্টির সৃষ্টবস্তুর ওপর এই যে বিরাট আশীর্বাদ, – এই বিশ্ববিরাটকে, অসীমকে, সীমাহীনকে জানার জন্য এই যে সুযোগ-সুবিধা – এ অতুলনীয়! এই যন্ত্রের যে কত বড় মূল্য, কত বড় দান! সবকিছুকে জানার, সবকিছুকে অবগত করার মূলকেন্দ্র, মূলবীজ হচ্ছে এই দেহযন্ত্র। তাই যা কিছু দেহের কার্যকলাপ, তা শুধু একে চালু রাখার জন্য।

ষ্টেশনে গাড়ী ধরতে গেছ - গাড়ী আসার আর তিন ঘণ্টা বাকী। এই সময়টুকুর জন্য খাট-পালঙ্ক, বিছানা-বালিশ-মশারি এনে টাঙিয়ে প্লাটফরমে যদি কেউ বিশ্রাম করতে চায় -সেটা শুনতে কেমন লাগে? ট্রেন এসে গেলে সব ফেলে চলে যেতে হবে। এই অল্প সময়ের জন্য কেউ কি প্লাটফরমে সাজিয়ে গুছিয়ে ব’সতে চাইবে? তেমনি এখানকার এই যে ভোগ, আরাম বা তৃপ্তি - এটা

কিন্তু অঙ্গেরই একটা ফুলের গন্ধের প্রকাশ মাত্র। 'আমার লোভ', 'আমার কাম' - 'আমি তৃপ্তি চাই', 'আমি যশ চাই' - যাই চাও, বাঁচবার জন্য যে পথই তুমি অবলম্বন করো, -এই যে চাওয়া-পাওয়া, এই যে তৃপ্তি, এই যে প্রকাশগুলো হচ্ছে, এগুলো আর কিছু নয় - অন্তর্নিহিত সুরের, এই যন্ত্রের বিকাশ মাত্র। এগুলো হচ্ছে চরম চাওয়ার ইঙ্গিত। এখানকার চাওয়া দিয়ে সেই চাওয়াকে সীমাবদ্ধ রাখছো। এই ইঙ্গিতগুলো প্রকাশ পাচ্ছে যন্ত্রের মাধ্যমে, সেই মহাসুরের সাথে মিশবার অনন্ত তৃপ্তির চাওয়া। হয়তো এখানে অনেকে ব্যাখ্যা করবে 'এগুলো কিছু নয়' - তা ঠিক নয়। এই বৃত্তিগুলো কেন? চাওয়া কেন? কি কি নমুনা প্রকাশ পাচ্ছে? প্রকৃতির মহাদান হিসাবে এগুলোর বিশেষ প্রয়োজন - সেই সুরে, সেই তৃপ্তিতে মেলাবার জন্য। 'মহাকামে'র সাগর রয়েছে, মহাতৃপ্তির সাগর রয়েছে, মহাদর্শনের, স্পর্শনের, ঘ্রাণের চরম সাগর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে তার নমুনা। এগুলো ধরে ধরে জেনে জেনে জানিয়ে দিচ্ছে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিচ্ছে – এর চেয়ে বড় আর কি গ্রন্থে পাবে? মহানের কথায় আর কি পাবে? এমন জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গুলি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে - এই তোমার সম্পদ। যেমন খাবার তালিকা দেখে 'কি চাইতে হবে' ঠিক করতে হয়, তেমনি এই তালিকা ধরেই বুঝতে হবে তালিকার সাগর রয়েছে সেখানে। চলে যাও সেখানে, সেখানে পাবে যা পেলে সব পাওয়া হয়ে যাবে। যা পেলে

আর পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। চরম পরিবর্তনের পথে সেখানে যাবে। ঐ পরিবর্তনই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে যে, এই পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তনের সুরের লয়-ই হচ্ছে এটা - এই ধরে ধরে চলতে হবে। তারই সমাধি দিয়েছে তোমাকে- এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছে। তবু কেন আবার আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছি? বিভ্রান্তিটাও তারই দান – বিভ্রান্ত করে দেওয়াও প্রকৃতির দান। তার কারণ, বিভ্রান্ত যদি না করে, বুঝটা তো আসবে না - বুঝটা পাকা হবে না। সুতরাং বিভ্রান্ত করাটা আরও পাকা বুঝে নেওয়ার জন্য। পেন্ডুলামটা টক টক করে। পেন্ডুলাম দেখে কেউ ঘড়ি দেখে না, কাঁটাটা দেখে। আমাদের পেন্ডুলাম হচ্ছে বিভ্রান্তি - জ্ঞানে, অজ্ঞানে, অন্ধকারে, মনের দ্বন্দ্বে এই যে ভুগছো – এটা পেন্ডুলাম। টক টক করছে – ঐটা দিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে, এর মধ্যে সব কিছু আছে – এত সুন্দর! ধন যেখানে, জন সেখানে, শয়তান সেখানে, পকেটমার সেখানে। পকেটমার আছে বলেই আবার সাবধানতা আছে। ‘উঃ’ যদি না থাকতো, তবে একটা লোকও কি ঠিক থাকতো? ‘উঃ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে’ – ‘উঃ’তে তোমাকে জানিয়ে দিল যে, এর ওপরে গেলেই তোমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। ‘উঃ’টা ব্যথার জন্য নয়, এটা তোমাকে সচেতন করে দিচ্ছে – ঐ ‘উঃ’টা যখন আরেক জনের কানে যায়, সে ছেড়ে দেয়। জীবনে চলার পথে অনেক ‘উঃ’ আছে।

জীবনের চলার পথে প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে প্রহরী দিয়ে রেখেছে, জানিয়ে দিচ্ছে। আর সবচেয়ে মহাদান – তাকে কোনসময়ই তোমার সাথে টেনে আনতে পারবে না যতক্ষণ না তার হাতের সাথে হাত মিলাবে। আমাদের জীবন-চলার পথে প্রকৃতি দিয়ে রেখেছে সেই চৈতন্য, যার নাম দিয়েছে বিবেক। এই বিবেক সব সময়ে গার্ড দিয়ে যাচ্ছে, 'কি করছিস', 'কেন করছিস' – তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে তোমার ত্রুটি - বিচ্যুতির কথা। এই বিবেক হচ্ছে আমাদের চলার পথের সাহায্যকারী – তার দান অতুলনীয়। সুতরাং আমি তার সাথে যদি হাত মিলিয়ে চলি, এখানকার বাস্তবে ঠোকাঠুকি খেতেই হবে - কারণ মিলবে না। এখানে তো সবাই বিবেক মেনে চলে না, সুতরাং হোঁচট খেতে হবে। হোঁচট খাও, বকা খাও, গালি খাও – সবই তো এই পোড়া দেহে মিশছে। আমার বিবেককে স্পর্শ করতে পারবে না। বিবেক আমার শুদ্ধ, স্বচ্ছ। বিশ্বের বিবেকের সাথে মিশে যাবে। সুতরাং তোমরা সেইভাবেই কাজ কর।

।। সতেরো ।।

১৯৩৬ সাল। ক্লাস সিক্স-এর অ্যানুয়াল পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করে ঠাকুর ক্লাস সেভেন-এ উঠলেন।

স্কাউটসের কুচকাওয়াজে বালক ঠাকুরের হাত থেকে যখন পঞ্চম জর্জের ফটো পড়ে গিয়েছিল, তিনি

বলেছিলেন যে, পরের বছর পঞ্চম জর্জ আর টিকবেন না। -সেই কথাই ফলে গেল। পঞ্চম জর্জ মারা গেলেন, তাঁর জায়গায় অল্পদিনের জন্য অষ্টম এডওয়ার্ড রাজা হলেন। তিনি সিংহাসন ছেড়ে দেবার পর এলেন ষষ্ট জর্জ।

পঞ্চম জর্জের শোকসভাতে দাঁড়িয়ে উঠে বালক ঠাকুর বলেন, “আমাদের রক্তে এখনও গোলামীর স্রোত বইছে। খাঁচার পাখী স্বাধীনতা পেলেও উড়ে যেতে চায় না, খাঁচার ভিতরেই ঢুকতে চায়। আমাদের মনোবৃত্তিও তাই হয়ে গেছে। আমাদের কিছু ধাক্কা খাওয়া দরকার। ধাক্কা না খেলে আমাদের শিক্ষা হবে না। ভারতের সন্তান প্রতিদিন গালে চড় খাচ্ছে। কয়েকটি মাত্র ইংরেজ আমাদের এত কোটি লোকের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। বিপ্লব ছাড়া স্বাধীনতার কোন পথই নেই।”

কেউ কেউ বলে উঠলেন, ‘তুমি এ সব কথা বলবে না।’

ঠাকুর বললেন, “আমি তো কোন রাজনৈতিকের আসনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি না। যার ব্যথা, সে তো ব্যক্ত করবেই। যত সান্ত্বনার বুলি বলা হোক না কেন, যার ব্যথা সে তো প্রকাশ করবেই। সহ্য করতে পারছি না। ভারত স্বাধীন হবে সেটা সত্যি। তবে একঘণ্টায় যেটা হতো, এক মুহূর্তে যেটা হতো, সেটা অনেক ঘোলাটে হয়ে হবে। বনে যখন জন্তু তাড়ায়, কতকগুলো শিকারীকে ছেড়ে দেয়। তারা হৈ চৈ করে জন্তুগুলিকে একদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তখন তাদের

শিকার করা যায়। তেত্রিশ কোটি ভারতসন্তান যদি একদিকে হৈ-হল্লা করতে থাকে, তখন কোন বৈদেশিক শক্তিই এসে আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।”

কিছুদিন পরে স্কুলে একটি মিটিং হ’ল। সেই মিটিং-এ সবারই স্বাধীনভাবে বলার অধিকার ছিল। একে একে অনেকেই বক্তৃতা দিলেন। শেষে ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “আমি আজ কয়েক বছর ধরে এই একই জাতীয় কথা বলে যাচ্ছি, আজ তার-ই পুনরাবৃত্তি করবো। রাজনীতি আমি বুঝি না – আমি বুঝি আমাদের শত্রু যারা, তাদের তাড়াতেই হবে। ব্যাধি হলে যেমন রোগ বিনাশের জন্য ঔষধ দেওয়া হয়, অপারেশন করা হয়, ভারতবর্ষ এবং ভারতের সন্তানগণ আজ ব্যাধিগ্রস্ত, - সুতরাং ঔষধের দ্বারাই হোক, অপারেশন দ্বারাই হোক, যেভাবেই হোক, সেই ব্যাধি তেমনি সারাতেই হবে। - ভারত হবে স্বাধীন রাষ্ট্র - ভারতের সন্তানগণই ভারতকে চালাবে। এর জন্য যা করণীয় আমরা করবো। কিন্তু আমাদের মন এত ছোট হয়ে গেছে যে, এখন ভারতবর্ষ আমাদের হাতে পড়লে আমরা চালাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই ঠোকাঠুকি, মারামারি না করে বসি। অনেক ছোটখাট ব্যাপারের ভিতর দিয়ে অনেক ছোট মনের পরিচয় পাই। গদী নিয়ে, ক্ষমতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুটা ঝুঁকি পোহাতে হবে। তবু স্বাধীনতা ফিরে আসুক।”

মাস্টারমশায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি মনে হয় যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলে নিজেদের মধ্যে অশান্তি হবে?'

ঠাকুর – শুধু অশান্তি নয় মাস্টারমশায়, ইংরেজ রাজত্বে যে সহজ-খাওয়া আপনারা খেয়ে গেলেন, সে আর চোখে দেখবেন না। আর আমরাও ভবিষ্যতে দেখবো কিনা সন্দেহ আছে। বাদশাহের আমলে শুনেছি টাকায় দুই মণ চাল ছিল। ইংরেজ আমলে তিন-চার টাকা মণ চাল পাই। আমাদের আমলে শতেক টাকা মণ চাল খেতে হবে।

মাস্টারমশাই – কি সর্বনেশে কথা! এমন স্বাধীনতা দরকার নেই। আর কেনই বা এমন হবে?

ঠাকুর – "শাস্ত্রে আছে 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' দেশবাসী তাদের পাপেই ডুববে।" বড় বড় নেতাদের নাম করে মাষ্টারমশাই বললেন, 'তারা তো দেশের জন্য যথেষ্ট করছে। তাদের সহকর্মীরা গদী পেয়ে কি আজকের কথা ভুলে যাবে?'

ঠাকুর – সবাই কেন ভুলবে! তবে এদের মধ্য থেকে-ই ভুলের সূত্রপাত হবে।

মাস্টারমশাই – তুমি নেতাদের মধ্যে কাকে সমর্থন কর?

ঠাকুর – সূর্য সেন থাকলে সূর্য সেন বা সুভাষ বোসের হাতে যদি দেশ পড়ে, তবে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিন পয়সা সেরের দুধ যে বাটিতে

খাচ্ছেন, সেই বাটি আর সরিয়ে রাখতে হবে না। তবে শেষ পর্যন্ত তার হাতে দেশ পড়বে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং যাদের হাতে দেশ শাসনের ভার পড়বে, তাদের হাতে পড়া মানে আমাদের গোলামী মনোবৃত্তির হাতেই পড়া। আমাদের কাছে এর থেকে বেশী আর কি আশা করতে পারেন?

মাস্টারমশাই – এই দুর্ভোগ কি ভারত চিরকালই ভুগবে?

ঠাকুর – বৈদেশিক শক্তির প্রভাব ভারতের ওপর এসে পড়বে। আমাদের চোখ-কান তারাই খাড়া করে দেবে। ভারতের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে বৃহৎ তিনটি শক্তির সমন্বয়ে একটা শক্তি পৃথিবীর ওপর আধিপত্য করবে।

মাস্টারমশাই – কোন কোন শক্তি?

ঠাকুর – আমি মুখে নামগুলো বলবো না। শুধু একটি কথাই বলবো যে, হাঁটা পথে যে-যে দেশে যাওয়া যায়, সেই সেই দেশ আসবে।

মাস্টারমশাই – তোমার মধ্যে দেশাত্মবোধের একটা স্ফুরণ দেখতে পাচ্ছি। তোমার দ্বারা দেশের একটা বিরাট পরিবর্তন হবে- সেটাও আমি বুঝতে পারছি।

ঠাকুর – সাগরে বিরাট ঝড়। ঢেউয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, নাকে মুখে জল ঢুকছে মাস্টারমশাই। হালটি যেন ঠিক ধরে রেখে সব কটাকে ঠিক করে আনতে পারি। আপনারা শিক্ষক, গুরুস্থানীয়। আপনাদের শুভদৃষ্টি ও

শুভকামনা যেন আমার উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করতে থাকে।

মাস্টারমশাই – তুমি পারবে।........

কি একটা উপলক্ষ্যে দোগাছি গেছেন মামাবাড়ীতে। বেশ কয়েকদিন ওখানে আছেন। বাড়ীতে কাজ করে সন্তোষ – বালক ঠাকুরের থেকে বয়সে ছয় সাত বছরের বড়। ঠাকুরের বড়মাসীমা কমলাদেবী নিঃসন্তান, বাল্য-বিধবা – তিনি সন্তোষকে ছেলের মতো দেখেন, সন্তোষও তাঁকে মা ডাকে। বাড়ীর ছেলের মতই সে থাকে। ঠাকুর সন্তোষকে 'সন্তোষদা' বলে ডাকেন। একদিন কোলাপাড়া থেকে অনেক তরিতরকারী আনতে হবে। মাসীমা ঠাকুর আর সন্তোষকে পাঠালেন। কোলাপাড়া থেকে দোগাছি প্রায় দেড় মাইল পথ। তরকারীর বিরাট বোঝা মাথায় করে নিয়ে এলেন ঠাকুর। এত ভারী বোঝা যে সন্তোষ তুলতে পারে না। রাস্তায় আসতে আসতে দেখলেন, কলসী কাঁখে গৃহবধূরা বাড়ী ফিরছে, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, "এত সুন্দর ছেলেটাকে কি অমানুষিক খাটাচ্ছে!দেখে মায়া হয়।" ঠাকুরের কাঁচাসোনার রংয়ের উপর সূর্যের আলো পড়ে ঝক ঝক করছে। বালক তখনই জবাব দিলেন, "আমাদের বাড়ীর জিনিস নিয়ে যাচ্ছি।" রাস্তায় অনেক লোক বালককে পরিশ্রান্ত দেখে সাহায্য করতে চাইলো, কিন্তু ঠাকুর কারও সাহায্য নিলেন না। সবাই, এমন কি সন্তোষও কাজ এড়িয়ে যায়। ঠাকুর নির্বিবাদে সব কাজ

করে দেন। কেউ গালাগালি করলেও জবাব দেন না। কাজটা করে দিয়েই যেন তাঁর তৃপ্তি।

আবার, যখন কাজে বসেন তিনি আলাদা মানুষ, কেউ সামনে ভিড়তে সাহস করে না, নীরবে দেখে যায়। ঠাকুর সন্তোষকে বলতেন, ‘যখন আমি ধ্যানে বসি, তুমি ঘরে এসোনা।’ সন্তোষ কোঁচ, টেটা এই সব দিয়ে মাছ মারতো- ঠাকুর ওকে অনেকবার নিষেধ করেছেন। ছোট থেকে ঠাকুরকে দেখে আসছে, তারপর ঠাকুরের মাসীমার ‘পাতানো’ ছেলে। সুতরাং বহু বিভূতি দেখা সত্ত্বেও ঠাকুরের কথা ও মানতো না। বলতো, ‘কি হবে!’ ঠাকুর বলতেন, ‘দেখবে, একদিন তোমার গলা কেটে ফেলবো।’ তবুও ওর বেয়াড়াপনার কিছু কমতি ছিল না। শচীন দাস, মনু দাস এবং দোগাছির অনেকেই আসে। একদিন সবাই ধরে ঠাকুরকে - সন্দেশ খাওয়াতে হবে। ঠাকুর সন্তোষকে বলেন ‘খানিকটা কাদা নিয়ে এসো তো।’ সন্তোষ কাদা এনে দেয়। ঠাকুর সবার হাতে একমুঠো করে কাদা দিয়ে বললেন, “খাও, সন্দেশ খাও।” মুখে দিয়ে দেখে অপূর্ব স্বাদ, এরকম সন্দেশ তারা জীবনে খায়নি! ধূপতিটা প্রায় নিভে এসেছে – তার মধ্যে হাত দিয়ে ঠাকুর নানারকমের ফল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভক্তদের দেন – তারা মহানন্দে প্রসাদ খায়। ভক্তেরা এই সব দেখে দেখে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে এটাকে ঠাকুরের স্বাভাবিক ধারা বলেই ধরে নেয়।

একদিন ভক্তদের বললেন, "সমুদ্রের জল খাবি? একটা ঘটি নিয়ে আয়, ভরে নিয়ে আসি।" কিছুক্ষণের মধ্যেই জলভরা ঘটিটি সামনে রেখে বললেন, 'যার যতটুকু দরকার খেয়ে নেও, বাকীটা সমুদ্রে ফেলে আসবো।' ঘরে পনেরো কুড়িজন ছিল, তবে ঐ নোনা জল আর বেশী খাবে কি করে – অনেকটাই রয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বললেন, "যাই ঘটিটা রেখে আসি।" - ঘটিটাতে জল আর নেই। এই রকম নানা বিভূতি দেখে তারা অভ্যস্ত।

কী করে করছেন - জিজ্ঞাসা করলে তিনি সহজভাবে উত্তর দেন, 'শক্তি সবার মধ্যেই আছে, চর্চা করলেই করা যায়। চর্চা করে যাও, তোমরাও পারবে।'

সেদিন ঘরে অনেক ভক্ত-শিষ্য এসেছে। ঠাকুর সন্তোষকে এক ঘটি জল নিয়ে আসতে বললেন। সন্তোষ প্রায়ই ঠাকুরের কথা শুনতো না, বোধ হয় আর একটা সুপ্ত অহমিকা ছিল যে, সেও বাড়ীর ছেলে। তা ছাড়া অনেক সময়ই কাজ এড়িয়ে যেত। সন্তোষ সেদিন এদিক-ওদিক ঘুরে প্রায় আধঘণ্টা পরে জলের ঘটি নিয়ে ফিরলো। অনেকদিন ওকে ঠাকুর বলেছেন যে, কথা যেন সে অমান্য না করে। সেদিন তাঁর হয়তো ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বললেন, 'সন্তোষদা, আজ তোমার গলা কেটে ফেলবো। যাও তোমার 'মা' (অর্থাৎ ঠাকুরের মাসীমা) ও বউকে বলে এস।' কেউ তখনও ঠাকুরের কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। সন্তোষও হালকাভাবে 'মা' ও বউকে

জানিয়ে এল। ঘরে বলির রামদাখানা ঝুলছিল, সেটা হাতে নিয়ে ঠাকুর বললেন, 'সন্তোষদা, তৈরী হও,' বলেই এক কোপে তার মাথা কেটে ফেললেন। মাথাটা গড়িয়ে দূরে পড়ে গেল, ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। ভয়ে সবাই অস্থির, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চীৎকার করে ছুটে পালিয়ে গেল। চারিদিকে হট্টগোল পড়ে গেল – 'বীরু ঠাকুর সন্তোষের গলা কেটে ফেলেছে।' সন্তোষের স্ত্রী কাঁদতে লাগলো। ঠাকুরের মাসীমা পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন, সব দেখে তো তিনি হতভম্ব! বলে উঠলেন, "বীরু, এ কী করলি! এখুনি তো পুলিশ আসবে!" শান্তভাবে ঠাকুর বললেন, "ও! পুলিশ আসবে।" অনেকে আবার বলছে, "ঠাকুর! ওকে বাঁচিয়ে তোল।" ঠাকুর বললেন, 'ঠিক আছে, একটু জল নিয়ে এস।' একটু জল ছিটিয়ে মাথাটা নিয়ে ঘাড়ে লাগিয়ে দিলেন। সন্তোষ দাঁত বে'র করে হাসতে লাগলো। সেই থেকে সন্তোষকে সবাই 'গলাকাটা সন্তোষ' বলে জানে, নিজেও সেই পরিচয়ই দেয় এবং সকলকে তার এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলে। সবই ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু যেখানে ঠাকুর মাথাটা জোড়া দিয়েছেন, সেখানে একটা কাটার দাগ শেষপর্যন্ত রয়ে গেল।

কোন কোন উপলক্ষে মাঝে মাঝে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, দোগাছি বা অন্য কোন গ্রামে যান – আবার ফিরে আসেন উজানচরের স্কুল জীবনে। পড়াশুনায় ফাঁক পড়ে যায়, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কয়েকদিনের

মধ্যেই সহপাঠীদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে সমস্ত পড়া তৈরী করে রাখেন। স্মরণশক্তি এত প্রখর যে, একবার পড়লে বা শুনলে তাঁর হুবহু সব মনে থেকে যায়। শুধু ইংরাজীটা নিয়েই একটু মুস্কিল, বুঝিয়ে দেবার কেউ নেই - অগত্যা সমস্ত গল্পটাই মুখস্থ করে রেখে দেন। বাড়ীতে মাষ্টার রেখে পড়ানোর মত অবস্থা বালকের পিতার নেই। তাই ঠাকুর জল-কাদা ভেঙে মাঝে মাঝে মাষ্টারমশায়ের বাড়ীতে যান পড়া শিখে আসতে। রাতের অন্ধকারে সাপখোপ এড়িয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মাষ্টারমশায়ের বাড়ী থেকে ফিরতে হয়। শুধু সুবিধা ছিল, তখনকার দিনের মাস্টারমশাইরা ছাত্রদের সাহায্য করতে দ্বিধা করতেন না। বাড়ীতে গিয়ে পড়া বুঝে এলে অনেকেই আপত্তি করতেন না।

স্কুলে যাবার পথে কামারশালায় মাঝে মাঝে গিয়ে বসেন। বালক ঠাকুর বসবেন বলে কামার একটা আলাদা টুল তাঁর জন্য বানিয়ে রেখেছিল। ঠাকুর সেখানে গিয়ে বসেন, আর প্রায়ই বলেন, “আমরা সব ভোঁতা হয়ে গেছি, মরিচা পড়ে গেছি – ওইরকম আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ী মেরে আমাদের সিধে কর।” কামার বলে, “গোঁসাই, একি ক’ন?” গোঁসাই বলেন, “আমরা হিংসা, দ্বেষ, ঝগড়া, মারামারিতে ডুবে ভোঁতা হয়ে গেছি, আমাদের পুড়িয়ে হাতুড়ী মেরে সিধে না করলে চলবে না।” সেই বয়স থেকে যখনই স্কুলে যান, একবার করে

কামারশালে গিয়ে বসেন আর এই কথা প্রায় রোজই বলেন।

কৃষ্ণনগর। রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন মশারির নীচে ঠাকুরের ছোট বোন গীতা চক্রবর্তী [ধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী (ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী), দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্তী, বিপুলেন্দু চক্রবর্তী - চার ভাই এবং সর্বকনিষ্ঠ বোন গীতা চক্রবর্তী] - বয়স তাঁর ছয় কি সাত। হঠাৎ আলো দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ভয়ে ভয়ে বিছানায় উঠে বসলেন, কিন্তু বে'র হতে সাহস করলেন না। একটা স্নিগ্ধ শুভ্র আলোকে ঘরটি ভরে গেছে। মাঝখানে ঠাকুর বসে আছেন - তাঁকে ঘিরে বসে আছেন দশ বারোজন অদ্ভুত মানুষ – আজানুলম্বিত দাড়ি, লম্বা চুল। দেখলে মনে হয় অনেক বয়স হয়েছে, তবু তাঁদের স্বাস্থ্য সুন্দর - প্রত্যেকের দেহ থেকে একটা অদ্ভুত স্নিগ্ধ জ্যোতি বে'র হচ্ছে এবং সেই আলো ঘরটি আলোকিত করে তুলেছে। ঠাকুর যেন কি বলছেন আর সেই অদ্ভুত মানুষেরা মন দিয়ে শুনছেন। ছোটবোন গীতাদেবী চুপ করে বসে গেছেন - ভয়ে কোন শব্দ করছেন না। নিজের অজ্ঞাতসারেই গীতাদেবী হঠাৎ অস্ফুট একটি আওয়াজ করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্যোতির্ময় দেহধারীরা সকলেই অন্তর্হিত হলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "আলো দেখে তোর ঘুম ভেঙে গেছে বুঝি?" গীতা দেবী বললেন, 'হ্যাঁ, মেজদা।' .....এইরকম ঘটনা দেখবার সৌভাগ্য তাঁর কয়েকবারই হয়েছিল।

পূজার সময়ে মামাবাড়ী দোগাছি গেছেন। গ্রামের বিখ্যাত জমিদার অপূর্ব হাজরা – নামডাক বেশ আছে। তাঁর মেয়ের নতুন বেনারসী শাড়ী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না – তখনকার দিনেই তার দাম সাড়ে তিনশো টাকা। কেউ নিশ্চয়ই চুরি করেছে। শাড়ীটা চুরি যাওয়ার জন্য তাঁরা তত ব্যস্ত নন, তাঁরা জানতে চান - কে চুরি করেছে। বালক ঠাকুরের কাছে এসেছেন জানতে। বালক ঠাকুর তখন বাড়ীর নৌকা করে সাথীদের নিয়ে খালে বেড়াতে গিয়েছেন। দু'ঘণ্টা পরে ফিরলেন। সব শুনে ঠাকুর প্রথমে বললেন যে, বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ করলেই শাড়ী পাওয়া যাবে। ওঁরা আবার কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসেছেন – খুঁজে পাচ্ছেন না। ঠাকুর এবার বললেন, 'পুষ্করিণীতে গিয়ে খোঁজ করুন।' সেখানেও খুঁজে না পেয়ে আবার এসেছেন সঠিক স্থান জানতে। ঠাকুরের মাসীমা বললেন, 'ওঁরা বারবার আসছেন, ঠিক করে বলে দে না।' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে ঠাকুর বললেন, 'আপনাদের পিছনের পুষ্করিণীর দক্ষিণ কোণে কচুরীপানার তলায় গিয়ে খোঁজ করুন, শাড়ীটা পাবেন।' কিন্তু কে চুরি করেছে তার নাম তিনি বললেন না। প্রায়ই তখন সব প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়ে দিতেন – কিন্তু কারও নাম বলতেন না। কারণ তাতে অনেক সময়ে অনেকে বিব্রত হয়ে পড়তে পারে। ক্রমশ: যখন এই ধরণের সমস্যা তাঁর কাছে ভুরিভুরি আসতে লাগলো – তিনি বলা বন্ধ করে দিলেন, কারণ তাতে অনেক সময় নষ্ট হ'ত।

ভক্তদের অনুরোধে বালক ঠাকুর কিছুদিনের জন্য ঢাকায় গেলেন। অনেক সমস্যাই তাঁকে সমাধান করতে হচ্ছে, কারণ প্রায় প্রত্যেক দর্শনার্থীই একটা না-একটা সমস্যা নিয়ে আসে। কয়েকদিনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল যে ঠাকুর ঢাকায় এসেছেন। সুতরাং দর্শনার্থীদের ভীড় বাড়তে লাগলো। একদিন এক মহিলা এসে ঠাকুরের কাছে কেঁদে পড়লেন। ইনি হচ্ছেন জ্যোতিষ রায়ের স্ত্রী মণিকুন্তলা রায়।

জ্যোতিষ রায় ছিলেন পাটের অফিসের বড়বাবু – অবস্থা বেশ সচ্ছল। আনন্দময়ী মা তখন ঢাকায় - জ্যোতিষ রায়কে তিনি খুব স্নেহ করেন। তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য জ্যোতিষ রায়ও আনন্দময়ী মাকে খুব ভালবাসেন এবং তাঁর সাধনপথের সহযোগিতার দিক থেকে অনেক কিছু করেন। মায়ের জন্য আলমোড়ায় একটি মনোরম আশ্রম গড়ে দিলেন নিজের উপার্জিত অর্থে। মায়ের সঙ্গে নানা তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে শেষে গেলেন মানস সরোবরে। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো – কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে বেনারসে এসে মারা গেলেন।

এই জ্যোতিষ রায়ের একমাত্র পুত্র রামানন্দ রায় মৃত্যুশয্যায়। সিভিল সার্জেন শশাঙ্কবাবু জবাব দিয়েছেন - জীবনের আশা নেই। জ্যোতিষ রায়ের স্ত্রী মণিকুন্তলা রায় অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হয়ে, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে বহু টাকা ব্যয় করে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন, তবু পুত্র রামানন্দের রোগের কোন উপশম হ'ল না। শরীর

এত দুর্বল হয়ে গেছে যে হাত পর্যন্ত তুলতে পারে না, দেহে রক্ত নেই, একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে - প্রাণটুকু শুধু ধুকধুক করছে। সব চেষ্টা শেষ করে মণিকুন্তলা নিরাশ হয়ে পড়েছেন।

টিকাটুলি শ্যামাবাসে মণিকুন্তলা থাকেন, আর থাকেন কামিনী জজের স্ত্রী। কামিনী জজের স্ত্রী ঠাকুরের মামীমাকে মেয়ে ডেকেছেন, সেই সুবাদে ঠাকুর তাঁর নাতির মত। মণিকুন্তলাকে কামিনী জজের স্ত্রী একদিন বললেন, "তোমার ছেলেকে একজনই শুধু ভাল করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন বালক ঠাকুর – আমার 'নাতি'। তুমি একবার তাঁর কাছে যাও।" মণিকুন্তলা সেইদিনই ঠাকুরের মামার বাড়ী স্বামীবাগে গেলেন। ঠাকুর মামার বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য এসেছেন। মণিকুন্তলা কেঁদে পড়লেন ঠাকুরের কাছে – তাঁর ছেলেকে ভাল করে দিতে হবে।

দুই-একজন ভক্তকে নিয়ে ঠাকুর গেলেন 'শ্যামাবাসে' জ্যোতিষ রায়ের পুত্র রামানন্দ রায়কে দেখতে। কিছুক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কঙ্কালসার রামানন্দের দেহ প্রায় বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, রক্তশূন্য, প্রাণ কোনরকমে ধুকধুক করে চলছে। ঠাকুর এক গ্লাস জল চাইলেন। জলে অঙ্গুলি স্পর্শ করে তিনি রামানন্দকে খাইয়ে দিতে বললেন আর হাতের ছোট লাঠিটি দিয়ে ওর মাথায় দু-তিনটা টোকা দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে সাতদিন পরে ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে স্বামীবাগে। এর মধ্যেই ও সুস্থ হয়ে

উঠবে।' মণিকুন্তলা আশার বাণী শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন, তাঁর একমাত্র সম্বল তিন ভরি সোনার হারটি খুলে ঠাকুরের পায়ে দিয়ে বললেন, 'আমার আর কিছু নেই, এই আমার শেষ সম্বল, – আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন।' ঠাকুর হারটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি যা করি, দিলের বিনিময়ে করি, সেখানে অর্থের কোনো চাহিদা নেই। এটা দিয়ে বরং ওর শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর।' ওঁর পীড়াপীড়িতে ঠাকুর শেষ পর্যন্ত ছয় আনা পয়সা রিক্সাভাড়া নিলেন, নিয়ে বললেন 'আমি হেঁটেই বাড়ী যাব, আর এই ছয় আনা পয়সা দিয়ে একটা ইন্সট্রুমেন্ট-বক্স কিনবো।' সাতদিনের মধ্যে রামানন্দ সুস্থ হয়ে উঠলো এবং হেঁটে মায়ের সঙ্গে গেল ঠাকুরের বাড়ীতে। ঠাকুর রামানন্দকে কিছুদিন গ্রামে নিয়ে যেতে বললেন, যাতে গ্রাম্য আবহাওয়ায় সে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্য ফিরে পায়। সাতদিন পরেই রামানন্দকে সব কিছু দিয়ে পরিপাটি করে খাওয়াতে বললেন [জমিদার যোগেশ চন্দ্র রায়চৌধুরীর কন্যা এবং জ্যোতিষ রায়ের স্ত্রী মণিকুন্তলার বাড়ী চট্টগ্রাম, পরিকুরা গ্রামে - সেখানে ঠাকুরকে কয়েকবার নিয়ে যান এবং পরিকুরায় বহুলোক দীক্ষা গ্রহণ করেন। আজও রামানন্দ রায় জীবিত। মণিকুন্তলা ও রামানন্দ দু'জনেই দীক্ষিত]।

রামানন্দের এই আশ্চর্য আরোগ্যলাভের খবর আনন্দময়ী মা-এর কানে গেল। তিনি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন – কে সেই মহান, যিনি মৃত্যুর দ্বার থেকে তাঁর

প্রিয়শিষ্য জ্যোতিষ রায়ের পুত্রকে ফিরিয়ে এনে পুনর্জীবন দান করলেন? কত সাধু-সন্ন্যাসী, ডাক্তার বৈদ্য চেষ্টা করলো - কই কেউ তো রামানন্দকে ভাল করতে পারলো না! কে সেই মহাশক্তিধর পুরুষ যিনি তাঁর স্পর্শে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে তুললেন! একদিন দু'চার জন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দময়ী মা স্বামীবাগে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ঠাকুর বাড়ীতে ছিলেন না। কাছেই ভোলা গিরির আশ্রম - সকালে ঠাকুর আশ্রমের পুষ্করিণীতে স্নান করতে যান, আর বিকেলে আশ্রমে বেড়াতে যান ভক্তশিষ্যদের নিয়ে এবং ঘাটলার কাছে গিয়ে বসে নানারকম আলাপ করেন। ঠাকুরকে স্বামীবাগের বাড়ীতে না পেয়ে আনন্দময়ী মা সোজা সেই আশ্রমে গেলেন এবং 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' - বলে ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরলেন। আশ্রমবাসী অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন; এই অপূর্ব মিলন দেখে সকলেই পুলকিত হয়ে উঠলেন। অনেকক্ষণ তাঁদের আলাপ আলোচনা হ'ল। বিদায় নেবার সময় আনন্দময়ী মা বললেন, 'নারায়ণ, এবার আসি।' ঠাকুর বললেন, 'তোমার মিষ্টি হাসি, মিষ্টি কথা ও মিষ্টি ব্যবহারে আমি খুশী হয়েছি [স্বামীবাগ আশ্রম থেকে সংগৃহীত]।'

ঢাকাতেই হঠাৎ একদিন বালক ঠাকুর ঠিক করলেন এক জায়গায় যাবেন। যেমন কথা তেমনি কাজ। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে, শুধু ভূপেন রায়কে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর ট্রেনে চেপে বসলেন। কোথায় যাবেন, কাউকে বলে গেলেন না। কেউ বিশেষ জিজ্ঞাসা করতেও সাহস করতো

না। তিনি কখন কোথায় যাচ্ছেন, আগে থেকে সবসময়ে বলতেন না। পার্বতীপুর হয়ে তাঁরা দার্জিলিং গিয়ে পৌঁছেছেন। লামা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে পেয়ে ভীষণ খুশী। সেখানে লামা-পোষাক পরে ভূপেন রায়কে সঙ্গে নিয়ে লামা সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। কখনও চমরী গাই বা রাম ছাগলের পিঠে চড়ে, কখনও হেঁটে তিব্বতের কাছাকাছি 'টং' পাহাড়ের এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন, -অনেক পাহাড়ী গ্রাম পেরিয়ে যেতে হ'ল। সেখানে সবাই উলঙ্গ অথচ তাদের মধ্যে আছে একটা স্বচ্ছ পবিত্রতা। ইতিমধ্যে তিব্বতে বহু লোক, বহু সাধক তাঁর শিষ্য-ভক্ত-অনুগামী হয়ে গেছে। তারা তো ঠাকুরকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা! যাই হোক, তাঁর সাথীকে নিয়ে লামা সন্ন্যাসীর সঙ্গে যখন টং পাহাড়ের সেই অপূর্ব সুন্দর উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছলেন, কাপড় জামা ছেড়ে রেখে দিয়ে গেলেন। ওদের সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। সাধনায় ওরা বেশ অনেক দূর এগিয়েছে। ধ্যানে যখন বসে, কেউ কেউ মাটির থেকে দুই এক ফুট ওপরে উঠে যায়। কোন বার্তা পাঠানোর জন্য ওদের টেলিফোনের প্রয়োজন হয় না। মনের সাহায্যেই বার্তা পাঠাতে পারে। ওরা বৌদ্ধ মতে থাকতে পারে, কিন্তু পৌরাণিক সব তন্ত্রের ওপর ওদের ভীষণ নজর। ঠাকুরকে ওরা তন্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো। ঠাকুর বললেন, 'তন্ত্র সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারবো না। আমি ব্যাপকভাবে বলি, বেদের কথা বলি। আমার কথা হ'ল, সাগরের পাড়ের কত নাম! সাগর-পাড়ের নাম যদি জিজ্ঞাসা কর,

তাহলেই তো গেছি। সাগরটাই চিনি। লেখাপড়া এখনও অত করিনি, আমার বয়সই বা কত? তবে মোটামুটি একটা রেজাল্ট আমি বলে দিতে পারি। তোমার তন্ত্রে সব অঙ্ক কষে ফল আমি বলে দিতে পারি। তোমার তন্ত্রের যে উদ্দেশ্য, তুমি যে উদ্দেশ্যে চাও, সহজে বলে দিতে পারি।'

তিব্বতী সাধক - তুমি ফল বলে দিতে পারবে?

ঠাকুর - হ্যাঁ, ফল বলতে পারবো। এই যে তুমি মনঃসংযোগ করার জন্য যেসব যোগাযোগ সূত্রে বাঁধতে চাইছো, – তন্ত্রের মাধ্যমে যে গণ্ডী করতে চাইছো, সীতাকে যেমন গণ্ডী থেকে নিয়ে গিয়েছিল, দস্যু তেমনি তোমাকে গণ্ডী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। কিছুতেই প্রাচীর দিয়ে গণ্ডী রাখতে পারবে না।

তিব্বতী সাধক - যদি পাকা করে দেওয়াল দিই?

ঠাকুর - যত পাকা দেওয়ালই কর, তুমি একবার গণ্ডী করবে আর এক দানব এসে ভেঙে চুরমার করে পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে।

তিব্বতী সাধক - আমি যদি গন্ডীর মধ্যে থেকে মনঃসংযোগ করে ঊর্ধ্বে চলে যেতে চাই?

ঠাকুর - কি করে সম্ভব? এত বড় পাহাড়টাকে একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে রাখতে পারবে? এত বড় সাগরটাকে একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে পারবে? এ রাখা যায় না। ভেঙে যাবে, চুরমার হয়ে যাবে। কোনদিনই কি তন্ত্রের মাধ্যমে পারবে? ওগুলো শুধু ধাঁধার মধ্যেই থেকে যায়। ধাঁধার গণ্ডীর মধ্যে পড়ে থাকলে তো চলবে না।

কথার মালার প্যাঁচে এত জড়িয়ে প’ড়ছ কেন? এই শব্দের থেকে ঐ শব্দে, এই অভিধান খুলে আর এক শব্দ বা’র ক’রছ, শব্দের থেকে তার অর্থ বা’র ক’রছ, অর্থ বা’র করে এই কাজ ক’রছ। তার থেকে কখনও তুমি শবে, কখনও মড়ার মাথায়, কখনও ‘কারণে’, কখনও তুমি উলঙ্গ হয়ে, কখনও তুমি নারী সংস্পর্শে – শত সহস্র তার সামগ্রী রয়েছে। আসল ফেলে দিয়ে, সাগরে কোথায় স্নান করবে তা-না, সাগরের পাড়ে বসে বসে ঝিনুক কুড়াচ্ছ। ঝিনুক কুড়াতেই থাকলে, – সাগরের যে ঢেউ, তার যে সুর, তার যে নাদ তা আর দেখছ না। শেষে ঝিনুক আর কড়ি কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ী চলে গেলে। এ দিকটাই তোমার বাদ পড়ে যাচ্ছে। তুমি বসে বসে বিরাটের থেকে কথার মালা, কথার প্যাঁচ, কথার সুর, কথার ধারা নিয়েছ। তুমি বিরাট পণ্ডিত হতে পারবে, ভাল করে পড়াশুনা করে হোমরা-চোমরা হতে পারবে, আর সেখানে গিয়ে আমি একটা মূর্খ,অজ্ঞান বনে, আসব – এত কথা আমি কিছুই বলতে পারব না। না বলতে পারলেও, দেখেছ তো একটা মুদীর দোকানের লোক - সে অঙ্ক কষে নি, কিন্তু অঙ্ক কষার চেয়েও বেশী হিসাব, এমন কি কড়াক্রান্তির হিসাব এমনভাবে করবে যে mathematician (গণিতশাস্ত্রজ্ঞ) ও মাথায় হাত দিয়ে বসবে। কাজ উদ্ধার নিয়ে কথা। অঙ্ক নিয়ে বললে, ভগবান নিয়ে বললে, কিন্তু ফল মিলাতে পারছো না। তুমি তো নিজেই কথাবার্তায় বুঝতে পারছ কোথায় গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছ? ধাক্কা খাচ্ছ, কিন্তু বলছ, ‘আমি

গণিতে আছি। আমি এই শাস্ত্রের এত ধারাতে চলছি।' গণ্ডীতে আটকে যাচ্ছে।

তুমি বলছ, 'আমার নিশ্চয়ই হবে।' এত করেও তুমি বলছ 'তোমার নিশ্চয়ই হবে।' আর তোমারই বিষয়বস্তু নিয়ে আমি বলছি, 'নিশ্চিত আমার হয়ে আছে।' যেটা আছে, সেটাকেই দেখতে পাচ্ছি। 'আছে' বস্তুর ভিতর দিয়ে আরো যাতে 'আছে' বস্তুকে বুঝে নিতে পারি, চলার পথে যেটা আছে সেটাকেই আরো বেশী যাতে দেখতে পাই - তাই চাইছি। আমি তো হারিয়ে গিয়ে হাতড়াচ্ছি না, আর তুমি আসলের ভিতর দিয়েও এমনভাবে হারিয়ে আছ যে হাতড়াচ্ছ। সমুদ্রে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে তুমি গিয়ে একেবারে সমুদ্রের সেই বালির স্তূপে পড়ে না পার এদিকে যেতে, না পার ওদিকে চলতে। এদিকে পা বালির স্তূপে ঢুকে যাচ্ছে, বালি ভেদ করে চলতে পারছ না। অঙ্ক কষে তো যাচ্ছ তুমি, এদিকে পরিশ্রম তো কম হচ্ছে না। সুতরাং আসল বস্তুতে থেকে, আসল বস্তু উপলব্ধি করে, আসল বস্তুতে সর্বাবস্থায় থাকা স্বত্বেও যদি চোখ বুজে থাকার মত অবস্থায় বসে থাক, তুমি কি করে দেখবে? কোনদিনই দেখতে পাবে না। [বালক ঠাকুর ওদের ভাষাতেই কথা বলে যাচ্ছেন, ওরাও বেশ বুঝছে, মাঝে মাঝে লামা সন্ন্যাসী সাহায্য করছে। পরে অনেকেই আশ্চর্য হয়ে গেছে যে, তিব্বতী ভাষায় এত দখল কোথা থেকে তিনি পেলেন!]

তিব্বতী সাধক - তুমি কিছু ক'রছ?

ঠাকুর - আমি তো এ সবের মধ্যেই নেই। আমি তো সাগরেই রয়েছি। সাগরের ঢেউ দেখতে পাচ্ছি। আমার উপলব্ধি করতে হবে, উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা করতে হবে - এ চিন্তাই আমার নেই। আমি তো জানি যে, আমি এই মহাকাশের মহার্ণবেতেই সৃষ্ট হয়েছি, এই মহার্ণবেই আছি। আলাদা করে আর সাগরে যেতে হবে কেন? – ভাবতেই পারছি না।

তিব্বতী সাধক- এই রকম ভাবনা তোমার মধ্যে গেঁথে রেখেছো?

ঠাকুর - গেঁথে রাখব কেন? তুমি কি ভাবছ- আমি কল্পনা করে বাড়িয়ে নিয়েছি? তোমার কাজকর্ম যে ধরণের, সেই ধরণের কথাবার্তা। যেটা গাঁথা রয়েছে, সেটাকে আবার গাঁথতে যাব কেন? তোমার বাড়ী-ঘর রয়েছে - সেটাকে আবার কুঁদে তৈরী করবে কেন? যার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছ - আশ্রয় নিয়েছ যখন 'আছ'ই। 'আছ' এর মধ্যেই তুমি রয়েছ, আবার এর মধ্যে থেকেই তুমি তৈরী করছো, ভাবছো, 'নতুন করে তৈরী করবো।' যাই তৈরী কর না কেন, 'আছে' বস্তু থেকেই তো তৈরী করছো - সেটা তো তুমি জান। তোমার তো জানাই রয়ে গেল। এটা তোমায় স্বীকার করতেই হবে যে, তুমি মা ফেলে মাসী, পিসীর কাছে যাচ্ছো। যখন জানলে এই বাবা, এই মা, তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়েছ - সেটা আবার নতুন করে জানতে চাইছো কেন? দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছো কেন? তোমরা চুলকিয়ে ঘা করছো, আবার সেই ঘা শুকাচ্ছো। তোমার

ঘা-ও শেষ হবে না, চুলকানিও শেষ হবে না। আমি এসব তন্ত্রমন্ত্র বুঝি না।

তিব্বতী সাধক - তবে কি ছেড়ে দেব?

ঠাকুর- তুমি তো নিজেই বুঝতে পারছো যে দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছ। তুমি কি বাবা-মাকে ছেড়ে দেবে? তুমিই যে নাই। এ সমস্ত পাকাপোক্ত করার দরকার কি? কথার মধ্যে শুধু সবসময় বলছো, ‘হবে, আরও অনেকের হয়েছে’। - এগুলো না হওয়ার কথা। ঠিকই যে করছো, ঠিক পথে যে আছ, আরও যারা করে গেছে তাদের কথাবার্তা, তারা যে ঠিক করেছিল – এইসব চিন্তা করে তোমার পথটা তুমি ঠিক ভেবে নিচ্ছ। আর আমি কি ভাবছি? আমি ভাবছি ‘ঠিক’-এই আছি, ঠিক-এ থেকেই ‘ঠিকাদারী’ করছি; আর তুমি বেঠিকে থেকে হোঁচট খাচ্ছ। যার বাড়ীতে কাজ করছো, তার মালিকের ঠিক নাই। মালিক খুঁজে পাওনা। তবু বল, ‘মালিক নিশ্চয়ই আছে। নিশ্চয় এর মধ্য দিয়েই কাজ হবে।’ অনিশ্চিতের মধ্য থেকে নিশ্চিত চিন্তা করে আবার তার পিছনে ধাওয়া করছো। এ সমস্ত কাজের মধ্যেই আমি নেই। আমি সহজ-সরল মানুষ। যে সহজাত সুরটা রয়েছে, সহজাত যা দেখতে পাচ্ছি, তার ভিতর দিয়েই আমার কাজ। পথ আছে, পথ ধরে যাই – পৃথিবী আছে, মাটি আছে – সব জায়গাটাই আমার পথ, দুনিয়াটাই আমার পথ।

তিব্বতী সাধক- তবু তো পথ একটা থাকে।

ঠাকুর- ওই পথে মনে কর ডাকাতে ধরলো, ওই পথ দিয়ে গেলে তুমি মারা পড়বে, তখন তো পথ নেই মনে করছো। নদী-নালা, ঝোপ-জঙ্গল কিছুই মানছো না, সাঁতার দিয়ে চলে গেলে। বিপদের সময় পথ তো আর ঠিক থাকছে না- সবটাই তখন পথ। পৃথিবীটাই একটা পথ – পৃথিবীটাই আমার পথ। মহাকাশটাই আমার পথ, এটাই আমার মত। দুনিয়ার সবটাই যেখানে আমার পথ, সেখানে এইভাবে সময় নষ্ট করে লাভটা কি?

বাঁধনমুক্ত-ই আমার ধর্ম। সর্ব অবস্থায় প্রকৃতির বাঁধন মুক্ত করাই আমার কাজ। কারণ মুক্তাকাশ - যার শেষ নেই, সেই আকাশে আমরা বাস করছি। সেখানে কেন বাঁধন সৃষ্টি ক'রব? নিজেই চিন্তা করে দেখ, পৃথিবীর বুকে প্লেনে যখন যাই, আমরা চলছি অনন্ত গতির পথে। বিরাট গ্রহের উপর বসে আছি। একবছর আগে কোথায় ছিলাম, কোথা থেকে কোথায় চলে গেছি! সৌরজগতে মৌমাছির ঝাঁকের মত গতিও চলছে, ওরাও ঝাঁকে ঝাঁকে চলছে, দুলে দুলে যাচ্ছে। সমস্ত মহাকাশে এই পৃথিবী অনন্ত কোটি মাইল চলছে ফাঁকাতে। কোথায় যে কে যাচ্ছে! এমন যেখানে সুন্দর স্বচ্ছ, এত বড় বিরাট মুক্ত যিনি, যাঁর কোন বাঁধ বা বাঁধন নেই, সীমা নেই, আরম্ভও নেই, শেষও নেই, অধঃ নেই, ঊর্ধ্ব নেই – তাঁর বুকে আমরা বাস করছি। সেই মুক্তাকাশ থেকে যখন জন্ম, কেন আমরা কালি-মাখা চিন্তা করবো, বল দেখি? আমরা কেন অন্য চিন্তা করবো? চিন্তা করে দেখ। বীজটা হ'ল বড়

গাছের বীজ। তাকে যদি কৌটার মধ্যে রেখে দাও - সে কি করে ফুটবে? তাকে ফেলে দাও মুক্ত জায়গায়, আপনি দেখবে ফুটে বে'র হবে। আমরা হচ্ছি অসীমের বীজ, সীমাহীনের বীজ। একটা পৃথিবী দিয়ে বোঝো - কত বড়, কি বিশাল তার চেহারা! লক্ষ লক্ষ কোটি বছর ধরে যদি এক সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ কোটি করে গ্রহনক্ষত্র গোনো, তারপরেও তুমি দেখবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো। তোমার কাছে তারা অসংখ্য। তবু মুক্তাকাশ থেকে ধ্বনি এলো, 'যা গুনেছো, মহাকাশের তুলনায় দুই আঙুলের একটা টিপ বললেও তাকে মূল্য দেওয়া হয়।' তবু তার সংখ্যা আছে। তাদের মূল্য না দিতে পার, কিন্তু আমাদের মূল্য দিতেই হবে। কারণ আমরা হচ্ছি বীজ। - মুক্ত আকাশেরই বীজ আমরা, সুতরাং কেন আমরা বাঁধা-বাঁধনের মধ্যে থাকবো? মুক্তাকাশের যে সন্তান, মুক্তাকাশ থেকে যাদের জন্ম, তারা মুক্ত-পুরুষ – এটা বিজ্ঞানসম্মত কথা, কল্পনার কথা নয়।

তোমাকে আশ্রয় করে চলেছে পৃথিবী বা পৃথিবীকে আশ্রয় করে তুমি – এর কোনটাই বলা সাজে না। পৃথিবী একটি বীজ, তুমিও আলাদা একটা বীজ। তোমার মনের চিন্তাধারায় কত বিরাট যুক্ততায় তুমি এগিয়ে যাচ্ছ! আমরা তো মুক্ত হয়েই আছি। তার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছো কেন? মুক্তির জন্য চিন্তা করছো কেন?

তিব্বতী সাধক - তাই তো! কেন মুক্তির জন্য এরকম চিন্তা করছি?

ঠাকুর - সহজাত ধারার থেকে, সহজাত বুদ্ধির থেকে আমরা যে ‘প্রচেষ্টা করছি’ বলছি, সেই প্রচেষ্টা নিয়মের মাধ্যমেই করে যাচ্ছি। নিয়মের মাধ্যমেই তো আমরা অগ্রসর হচ্ছি। বুঝাবার দিকটাও সহজাত। না বুঝার দিকটাও ভিতর থেকে সৃষ্টি করে আমরা আর একটা ধারাতে চলে যাচ্ছি। যে ধারাতেই আমরা ওলটপালট করি না কেন – মাটির ওপরেই করছি, জলের ওপরেই করছি - সবই মুক্তাকাশে করছি। মুক্তাকাশে যখন বিচরণ করছি - খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা সবই এক জায়গায়। ঢেউয়ের থেকে বুদ্বুদ হয় আবার সেই বুদ্বুদ ঢেউয়ে মিশিয়ে যায়। ভুল-ভ্রান্তি এগুলি সবই মহাকাশে। আমরা অনেক সময় বুদ্বুদের মত অনেক কথা বলি। আবার বুদ্বুদের মত সব ওখানেই মিশে যাচ্ছে।

তিব্বতী সাধক - বাঃ! তুমি তো বেশ বদ্ধমূল করে ফেলেছ! তাহলে তো আমাদের হয়ে গেছে।

ঠাকুর - তা ‘বদ্ধমূলে আছি’ এই কথা বদ্ধমূল করতে আপত্তি কি?

তিব্বতী সাধক - তোমার কথার ধরন তো সাংঘাতিক!

ঠাকুর - সাংঘাতিক অবস্থায় রয়েছি। কি প্রয়োজন, না-প্রয়োজন তা বলছি না। আমরা আছি। আমি পৃথিবীতে নিয়ে তোমায় ছেড়ে দিলাম। খাওয়া-দাওয়া দিয়ে দিলাম। তুমি বলছ- ‘আমি পড়ে গেলাম, পড়ে যাচ্ছি।’ আরে তুমি পড়বে কোথায়! তুমি চলছ অসীমের পথে, এমনি বসে

থাকলেও তুমি চলেছ অসীমের পথে, চিরন্তনের পথে; তুমি চলছো চলার গতির পথে; গতির শেষ নেই, চলারও তো শেষ নেই। তোমাদের খেলাধুলা, কথাবার্তা, শাস্ত্র, গীত সবটা তো এক জায়গাতেই রয়ে যাচ্ছে বুদ্বুদের মত।.........

বালকের অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সকলেই প্রণাম জানালেন। পথের সন্ধান পেলেন অনেকেই। তিব্বতী ভক্ত-শিষ্যের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো।

ফিরে এসেছেন কৃষ্ণনগরে - স্কুলে নিয়মিত যান, পড়াশুনা করেন। তার ফাঁকে ফাঁকে ভক্ত-শিষ্যের সমস্যার সমাধান করে যান। দুরারোগ্য ব্যাধি আপন স্পর্শে নিরাময় করে দেন, ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে একজন নামকরা সেতারী এসেছে ঠাকুরকে দর্শন করতে, সঙ্গে আরও দু'জন ভক্ত। [শ্যামবিনোদ ঘোষ – সেতারী, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, মহম্মদ আলি]। ঠাকুর কিছুদিন আগে তাকে আসতে বলেছিলেন, তাই সে এসেছে। গুরুদেবের ঐশ্বরিক শক্তি দেখার জন্য তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নিজে সে প্রায় সব রকমের বাজনা বাজাতে পারে এবং শিশু বয়সেই বেশ নাম করেছে। এখন ঢাকা রেডিওতে চাকরী করে। প্রথম রাতে গান-বাজনা ক'রে সে গুরুদেবকে শোনালো। দীক্ষা তখনও নেয় নি, কিন্তু গুরুদেবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। পরের দিন রাত্রে তিন বন্ধুতে শুয়ে আছে, এমন সময় ঠাকুর গিয়ে

উপস্থিত। সেতারী ঠাকুরকে ধরেছে যে, সে কিছু দেখতে চায়। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখবি?' সেতারী জানালো যে সে দিব্য আলো দেখতে চায়। সঙ্গী দু'জনকে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে রাখতে বললেন। হারিকেনের আলোটা একেবারে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেতারী দেখলো, একটা উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলো দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে অদ্ভুত সুন্দর এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাকিয়ে দেখে, ঠাকুরের কপাল থেকে সেই আলো বে'র হচ্ছে। আলো মিলিয়ে যেতেই সেতারী বললো, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না, আবার একটু দেখান।' আবার সেই স্নিগ্ধতায় ভরা তীব্র আলোর রশ্মি গিয়ে পড়লো সামনের দেওয়ালে। ঠাকুর এবার হারিকেন জ্বালাতে বললেন, কিন্তু সেতারী এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, আরো একবার সেই আলো দেখাতে অনুরোধ করলো। ঠাকুর তার অনুরোধ রক্ষা করলেন। তারপর ওদের বিশ্রাম করতে বলে ঠাকুর চলে গেলেন।

পরের দিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ভক্ত দু'জন ও সেতারী কাছারী ঘরে এসেছে। ঠাকুর কিছুক্ষণের মধ্যেই এলেন। ভক্ত দুজনকে বাইরে বসে পাহারা দিতে বললেন, সেতারীকে দরজা জানলা বন্ধ করে তাঁর সামনে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বললেন, "একটা শব্দ শুনলে আমার কাছে যাবি। তখন যা চাইবি তাই পাবি।" লণ্ঠনের আলোটা একটু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সেতারী চমকে

উঠে দেখে, ঠাকুর আসনে নেই। ঘরের দরজা - জানলা ঠিকই বন্ধ আছে। সেতারী কোনদিন বালক ঠাকুরের এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পায় নি, শুধু শুনেছে যে তিনি মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে দূরদেশ থেকে ঘুরে আসতে পারেন। আজ ঠাকুরকে সহসা অন্তর্হিত হতে দেখে কিছুক্ষণের জন্য হতবাক হয়ে গেল। তারপর ঠাকুরের নির্দেশ মত আর দুজন ভক্তকে নিয়ে বালক ঠাকুরের খোঁজে বে'র হলো। সেতারীর সাথীদের কাছে এটা নতুন কিছু নয়। তারা বহুবার দেখেছে, তাই সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজ করতে করতে নিকটেই একটি বাড়ীতে গিয়ে ঠাকুরকে সমাধিস্থ অবস্থায় পেয়ে গেল। ঠাকুরের মুখের চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। সেতারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। পরের দিন দীক্ষা গ্রহণ করে জীবন ধন্য করলো।

বালক ঠাকুরের যে কি ভালবাসা, তা যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব। সরিষাচরের এক ভক্ত ঠাকুরের উৎসব করছে তার বাড়ীতে। উৎসব উপলক্ষে ভাল করে ভোগ দেয় এবং সবাইকে প্রাণ ভরে প্রসাদ বিতরণ করে। যে ব্যবস্থা সে করতে পেরেছে, তাতে টানাটানি পড়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। ঠাকুর এক শিষ্যকে ডেকে বললেন, "দোকান থেকে চার মণ চাল, চার মণ ডাল, দশ সের তেল নিয়ে সরিষাচরের ওই ভক্তের বাড়ীতে দিয়ে এস। আর পরিমাণ মত কিছু তরিতরকারীও দিয়ে আসবে। কিন্তু বলবে না, ঠাকুর পাঠিয়েছে।" অনেক করে খুঁজে ভক্তের বাড়ীতে সে সব

জিনিস পৌঁছে দিয়ে এল। সে তো এত চাল, ডাল, তরিতরকারী পেয়ে অবাক! মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম জানালো – তাঁর কৃপা ছাড়া তো এই অসম্ভব সম্ভব হতে পারে না! এদিকে ঠাকুর ধীরে ধীরে কয়েক মাস ধরে কিছু কিছু করে দিয়ে দোকানের ধার শোধ করে দিলেন। কেউ জানলেন না – কোথা থেকে এই অযাচিতভাবে সব কিছু এসে পড়লো। উৎসব বেশ ভালভাবেই হয়ে গেল। [প্রায় দু'বছর পরে ভক্তটি জানতে পেরেছিল যে স্বয়ং ঠাকুরই তার বাড়ীতে চাল,ডাল, তেল, তরিতরকারী পাঠিয়ে তাকে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এরকম উদাহরণ অনেক আছে]।

দোগাছিতে কয়েকদিনের জন্য গেছেন কতকগুলি কাজ সারবার জন্য। সাথীরা ধরলো 'ত্রিনাথের মেলা' হচ্ছে - একবার ঠাকুরকে নিয়ে যাবে। ঠাকুর আপত্তি করলেন না। প্রচলিত বিশ্বাস আছে, ত্রিনাথের মেলায় গেলে জুয়া খেলতে হয় – বেশী না হলেও এক পয়সার অন্তত: খেলতে হবে। সবাই ধরলো ঠাকুরকে – খেলতে হবে। ঠাকুর আট টাকা দিয়ে খেললেন। তিনটি জাহাজ উঠলো, জুয়ার মালিক হাত উঠাতে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত যখন হাত উঠালো, দেখা গেল ঠাকুর চব্বিশ টাকা নিলেন, তারপর আট টাকা রেখে ষোল টাকা ফেরৎ দিয়ে দিলেন। জুয়ার মালিক কিছুতেই টাকাটা ফেরৎ নিতে চায় না। ঠাকুর বলেন, 'আমি আগেই দেখে নিয়েছি

কি উঠেছে, সুতরাং তোমার টাকা তুমি নিয়ে নেও।' সমস্ত গ্রামে ঠাকুরের এই মহানুভবতার কথা রটে গেল।

একদিন খেলাচ্ছলে সাথীদের নানারকম উপদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা মন দিয়ে শুনছে। এত কঠিন তত্ত্ব এত সহজভাবে সাধারণ ঘরোয়ালী কথার মধ্য দিয়ে আর কে দিতে পারে! হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও ঠাকুরের কথা এত চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে যে, কেউ উঠে যেতে চায় না। হঠাৎ ঠাকুর বললেন, "আম খাবি?" খেতে সবাই চায় কিন্তু উঠে আম পাড়তে যেতে চায় না। "বেশ, তোরা যখন উঠবি না – আমিই আমগাছকে বলি", ঠাকুর বললেন। ছেলেরা ঠাট্টা ভেবে হেসে উঠলো। বালক ঠাকুর তখন কোঁচড় পেতে বললেন, "আমগাছ, তোমার মগডালে যে আমটি সুন্দর পেকে আছে, ওটার তো তোমার আর প্রয়োজন নেই, ওটা আমাকে দাও।" বলার সঙ্গে সঙ্গে আমটি টুপ করে ঠাকুরের কোঁচড়ে পড়লো। সাথীরা তো অবাক! ঠাকুরকে ধরলো, 'কি করে এটা সম্ভব হ'ল বলতে হবে।' ঠাকুর একটু হেসে বললেন, "চাওয়ার মত চাইতে পারলে, গাছও কথা শোনে। তোরা চাইবি ঠিকই, কিন্তু মনে থাকবে, 'কি জানি - হবে কি করে?' মন আর মুখ এক করে ফেল। দেখবি সকলেই তোদের কথা শুনবে।" তারপর ঠাকুর আমটি কেটে সবাইকে খাওয়ালেন।

ষোড়শী মুন্সীগঞ্জের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রৌঢ়া রমণী। আটবছর বয়সে তাকে তার পিতা গৌরীদান করেছিলেন - পরের বছরই স্বামীর মৃত্যু হ'ল। বালবিধবা

ফিরে এল পিত্রালয়ে। কৃচ্ছ্রসাধন করে তার শরীর ক্রমশ: ভেঙে পড়তে লাগলো। তবুও কর্মক্ষমতা, কঠিন পরিশ্রম এবং সবার প্রতি মমতায় তার সমকক্ষ খুব কমই ছিল। দিনরাতের অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকে নিজস্ব সাধনায়। সাধিকা হিসাবে তার নাম অনেকেই জানে এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে স্মরণ করে। কঠিন রোগে ষোড়শী তখন শয্যাশায়ী, জ্ঞান নেই। সকলেই তার মৃত্যু আসন্ন মনে করে শোকে অভিভূত। এদিকে রমণী স্বপ্ন দেখছে – এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক মনোরম পথ দিয়ে। চারিদিকে এক অপূর্ব মধুময় পরিবেশ, সমস্ত শরীর এত হালকা লাগছে যে, মনে হচ্ছে যেন আনন্দে উড়ে চলেছে। সামনে দেখতে পাচ্ছে এক অপূর্ব স্বপনপুরীর দেশ – সেখানে গাছ-পালা, মাঠ,ঘাট, পাহাড়,নদী, রাস্তাঘাট সবই অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা। যেতে যেতে তারা এক মনোরম প্রাসাদের কাছে গিয়ে থামলো, সেই দিব্যকান্তি পুরুষ তাকে নিয়ে প্রাসাদের সুন্দর বাগানে প্রবেশ করলো। বাগানের অপূর্ব সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে রমণী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। এত সুন্দর গাছপালা, ফুলফল কোনদিন সে দেখেনি - বিভিন্ন ফুলের অপূর্ব গন্ধে সে মোহিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে সেই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো একটি বিরাট হলঘরে। কিছুদূরে একটি ফুলের আসন শূন্যে ঝুলছে। আসনে যিনি বসে আছেন তাঁর দিকে তাকিয়েই রমণী চক্ষু বুঁজতে বাধ্য

হ'ল। সহস্র সূর্যের আলোকে আলোকিত এক জ্যোতির্ময় মূর্তি – তাঁর দিকে তাকানোই প্রায় অসম্ভব। কিছুক্ষণ পরে ষোড়শী শুনতে পারলো 'এদিকে তাকাও'। চোখ খুলে এবার তাকাতেই স্নিগ্ধ শান্ত আলোতে তার চোখ ভরে গেল। নিজের অজান্তেই বলে উঠলো, 'আঃ, কি সুন্দর!' সহস্র সহস্র চন্দ্রের আলোকে আলোকিত সেই পরম বিস্ময় যেন এক অপরূপ রূপের ভাণ্ডার, তাঁর দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত কোমলতা, স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্যে ভরা। এত সৌন্দর্য দেখতে দেখতে তার চৈতন্য যেন লুপ্ত হয়ে যেতে লাগলো, তার অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে লাগলো। আবার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ষোড়শী - বলছেন, "না, তুমি ফিরে যাও - সেখানে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্রই সেখানে যাচ্ছি। তোমাকে দিয়ে সেখানে আমার কাজ আছে। সেখানকার কাজ শেষ করে যথাসময়ে আসতে পারবে। যাও, আমিও তোমাকে ডেকে নেব – তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।" ষোড়শী প্রণাম করে সেই দিব্যকান্তি সাথীর সঙ্গে ফিরে চললো। - কোনদিকে খেয়াল নেই তার - কানে বাজছে সেই মধুময় কণ্ঠস্বর, সেই অপূর্ব ধ্বনি। 'আহা কি সুন্দর', 'আহা কি সুন্দর' বলতে বলতে রমণী চোখ মেলে তাকালো। ....দীর্ঘকাল পরে জ্ঞান ফিরে আসাতে সবাই আশান্বিত হয়ে উঠলো, বললো যে, হেম কবিরাজের চিকিৎসার গুণে ষোড়শী [ষোড়শী যখন মৃত্যুশয্যা থেকে আরোগ্য লাভ করেন, তখন ঠাকুরের জন্মও হয় নি। বহু বছর পরে অশ্বিনী চ্যাটার্জীর কাছে প্রথম বালক ঠাকুরের কথা শোনেন, কিন্তু তখন এত গুরুত্ব দেন নি। পরবর্তীকালে ঠাকুর

যখন ১৯৬৮ সালে বিরানব্বুই বছর বয়স্কা ষোড়শীকে আইন অমান্য আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করার জন্য ডেকে পাঠালেন, নির্দ্বিধায় ষোড়শী এগিয়ে এলেন আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর আন্দোলনে পাঠান হ'ল না] প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

সুস্থ হয়ে উঠে ষোড়শী তার স্বপ্নের কথা নিকটতম দুই-একজনকে জানালো। সেই জ্যোতির্ময় দেবতার রূপ সে ভুলতে পারে না। কবে কোথায় তাঁর সঙ্গে বাস্তবে দেখা হবে কে জানে? তবে এইটুকুই ভরসা যে, তিনি নিজেই তাকে ডেকে নেবেন। বহু তীর্থ ঘুরেছে ষোড়শী, কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করেছে। অপেক্ষা করছে কবে তিনি এ ধরায় অবতীর্ণ হবেন। কয়েক যুগ কেটে গেছে, অশ্বিনী চ্যাটার্জীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে - তাঁর কাছ থেকে সাধনমার্গের উপদেশ-নির্দেশ নিয়ে সাধন ভজন করে। বালক ঠাকুরের কথা ষোড়শী শুনেছে কিন্তু তাঁর দর্শন পায়নি। এক রাত্রে ষোড়শী স্বপ্ন দেখে - কোথায় এক তীর্থে গেছে- মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করে মুখ তুলতেই দেখে সেই পরিচিত দেবতা, যিনি প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে, যখন সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাকে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। মন তার ভরে ওঠে এক অনির্বচনীয় আনন্দে, কিন্তু কি করবে সে! এবার তিনি ষোড়শীকে স্বপ্নের ভিতরে কাছে টেনে নিয়ে মন্ত্র দিলেন এবং বললেন, “যত শীঘ্র পার আমার সঙ্গে দেখা কর – আমি তো তোমার বাড়ীর কাছেই আছি।” বয়স প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি হ'ল - অনেক তীর্থ

করেছে - অনেক জায়গায় ঘুরেছে, কিন্তু দেবতাকে কোথায় খুঁজবে সে, তিনি তো কোনো ঠিকানা দেননি, শুধু বললেন যে তার বাড়ীর কাছেই আছেন। ....তারপর দুই-এক বছর কেটে গেছে - মাঝে মাঝে স্বপ্নের সেই দেবতার কথা তার মনে হয়েছে।

সেবার বিক্রমপুর পালপাড়া গ্রামে ঠাকুর গেছেন। তাঁকে দর্শন করবার জন্য প্রচুর ভীড় হচ্ছে। চিন্তাহরণ মাষ্টার ঠাকুরের দর্শন করতে গেছেন - সঙ্গে ষোড়শীও এসেছে। ঠাকুরকে দেখেই সে চমকে উঠলো – এই তো সেই স্বপ্নে-দেখা দেবতা! আফশোষ হতে লাগলো - অশ্বিনী চ্যাটার্জীর মুখে বালক ঠাকুরের কথা শুনেও সে বিশেষ গুরুত্ব তখন দেয়নি। প্রণাম করে উঠতেই ঠাকুর ষোড়শীকে বললেন, “এত দেরী করলে কেন? একটু খোঁজও তো করতে পারতে!” মন্ত্রমুগ্ধের মত ষোড়শী বলে, “তোমার আর দুই হাত কোথায়?”

।। আঠারো ।।

ক্লাস সেভেন-এর ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। বালক ঠাকুর মোটামুটি ভালভাবেই পাশ করে ক্লাস এইটে উঠলেন। পড়াশুনা করার সময় ছিল অল্প। প্রায়ই এখানে - সেখানে যেতে হয় শিষ্যভক্তদের অনুরোধে। নিয়মিত স্কুলে যাওয়াও সবসময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবু যেটুকু সময় পড়েন তাতেই কাজ হয়ে যায়। অসাধারণ

স্মৃতিশক্তি, একবার পড়লে সেটা ভোলেন না- যতদিন আগেই পড়ে থাকুন না কেন, হুবহু বলে দিতে পারেন। অঙ্কের তো কথাই নেই - অঙ্কের মাস্টারমশাই নিবারণবাবু বলেন যে, ঠাকুরের মত এরকম মেধাবী ছাত্র তিনি খুব কমই দেখেছেন। এই নিবারণবাবুর মত অঙ্কে পারদর্শিতা খুব কম মাষ্টারমশাইদের মধ্যেই দেখা যায়। ছাত্রবয়স পার হতে না হতেই তিনি এলজেব্রার বই লিখে ফেললেন - কিন্তু টাকার অভাবে সেই বই ছাপিয়ে উঠতে পারছিলেন না। তাঁরই এক সহপাঠী - একই হোস্টেলে থাকতেন, অবস্থাও একটু সচ্ছল তিনি এগিয়ে এলেন বইটি ছাপিয়ে বে'র ক'রবার জন্য। কথা ছিল, বই বিক্রী করে নিবারণবাবু টাকাটা শোধ করে দেবেন। বই ছাপা হ'ল ঠিক, কিন্তু নিবারণবাবু সবিস্ময়ে দেখলেন যে, বইয়ের গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর নাম না দিয়ে বন্ধু নিজের নামে বইটি ছাপিয়েছে। এই আঘাত তাঁর এত লেগেছিল যে, তিনি অঙ্কশাস্ত্রে বিরাট পণ্ডিত হয়েও আর কোনোদিন বই লেখবার চেষ্টা করেন নি। বালক ঠাকুর ছিলেন নিবারণবাবুর প্রিয় ছাত্র, কারণ যে কোন কঠিন অঙ্ক তিনি সহজ পদ্ধতিতে অনায়াসে করে ফেলতেন।

নায়েব ত্রৈলোক্য সোমের পুত্র বিনয় সোমের স্ত্রী আড়াইহাজার জমিদার বাড়ীর মেয়ে। তার সনির্বন্ধ অনুরোধে বালক ঠাকুর ঢাকা জেলার আড়াইহাজার গ্রামে যেতে রাজী হলেন। নিজের বাপের বাড়ীর সম্বন্ধে বিনয় সোমের স্ত্রী বাসন্তী সোমের সম্যক জানা থাকলেও, সে

বুঝেছিলো যে, ঠাকুরের ঐশী শক্তির কাছে সবাই শেষ পর্যন্ত মাথা নোওয়াবে। বাসন্তীর আমন্ত্রণে অতিথি হিসাবে বালক ঠাকুর আড়াইহাজারে গেলেন। বিরাট জমিদার বাড়ী - জাঁদরেল জমিদার-বংশ, - পূজা-আর্চ্চা, দেবদেবতা, ধর্ম-কর্মের ধার ধারেন না। বালক ঠাকুরকে তাঁরা কোন গুরুত্বই দিলেন না, ভাবটা যেন - এসেছে যখন, খাও,দাও থাক – এই পর্যন্ত। আর পাঁচ জন অতিথির মত বাহির-বাড়ীতেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা। এঁদের মধ্যে রাজেন চৌধুরী আবার ভীষণ নাস্তিক - ছেলে কোন কীর্তনে বা পূজামণ্ডপে গেছে শুনলে কান ধরে তুলে নিয়ে আসতেন। রাজেন চৌধুরী ভারিক্কী প্রৌঢ় জমিদার - প্রথম প্রথম গড়গড়া থেকে ধোঁয়া মুখের ওপর ছেড়ে দিয়ে ঠাট্টা করে বালক ঠাকুরকে বলতেন - 'কি, ধূপের গন্ধ থেকে ভাল না!' ঠাকুর জবাব দিতেন, 'হ্যাঁ সুন্দর গন্ধ'। হেমেন্দ্র চৌধুরীও ঠাকুরের সামনেই গড়গড়া টানতেন। অল্প বয়স - ওঁদের ছেলেদের থেকেও ছোট, সুতরাং তাঁরা ঠাকুরকে প্রথম প্রথম বিশেষ গ্রাহ্য করতেন না।

তিনটি ঘটনায় জমিদারমশায়দের টনক নড়লো। জমিদারবাড়ীর দুই হিস্যা এবং হিস্যায় হিস্যায় বেশ রেষারেষি – গ্রাম্য সমাজকে সরগরম করে রাখে। সেদিন কলকাতা থেকে জমিদারবাড়ীতে লোক আসবার কথা, ওরা চিঠি দিয়েছে বারদীতে পালকি পাঠানোর জন্য। বেহারারা যখন পালকি নিয়ে যাচ্ছে, ঠাকুর ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছ"? ওরা জবাব দেয়,

"বারদী"। ঠাকুর বললেন, "বারদীতে তো ওরা নামবে না, ওরা নামবে বিশনন্দীতে। তোমরা বিশনন্দীতে যাও"। বারদী থেকে বিশনন্দী প্রায় ৭/৮ মাইল দূরে - সেখানে ষ্টীমার-ষ্টেশন আছে। বালক ঠাকুর হেমেন্দ্র চৌধুরীর হিস্যায় উঠেছেন - সুতরাং ঐ হিস্যার পালকি ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে বিশনন্দীতে গেল। অন্য হিস্যার পালকি ঠাকুরের কথা না শুনে গেল বারদীতে। এদিকে বারদীতে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে - মেঘনার বিশাল ঢেউয়ের ধাক্কায় ষ্টিমার ষ্টেশন-ঘাটে লাগাতে পারলো না, সোজা গিয়ে বিশনন্দীতে ভিড়লো। বিশনন্দীতে নেমে এই তরফের লোক পালকি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল – বিশনন্দীতে পালকি নিয়ে এল কি করে! বেহারাদের মুখে সব কথা শুনে ওরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পালকি করে বাড়ী এসে পৌঁছলো। অন্য তরফের লোক অতটা পথ বৃষ্টি মাথায় করে ভিজে এসে বাড়ীতে বকাবকি শুরু করলো - কেন তারা ঠাকুরের কথা শোনে নি। গ্রাম দেশে টেলিগ্রাফ ছিল না - পালকি যখন রওনা হয় তখন খটখটে রোদ্দুর; বারদীতে যে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে এ আঁচ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ঠাকুরের এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে জমিদারদের একটু টনক নড়লো। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা না করে কিছু করতে ভরসা পায় না।

মাঝে মাঝে বালক ঠাকুর নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন এবং তার মধ্যেই অনন্ত বিশ্বের নিগূঢ়

তত্ত্বের ছোঁয়াচ দেন। জমিদারবাবুরা একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন না। তার ওপর যখন আর একটি ঘটনা ঘটলো, সকলে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বালক ঠাকুর হঠাৎ একদিন বললেন, “আজ সকলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেও। রাত আটটায় ভূমিকম্প হবে। কেউ দালানে থাকবে না।” ঠাকুরের ওপর তখন ওদের অটুট বিশ্বাস। সবাই খেয়েদেয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। ঠিক আটটার সময় নাড়া দিল। হেমেন্দ্র চৌধুরী বলে উঠলেন, ‘নাড়া দিয়েছে রে।’ দালানে ঠাকুর আছেন বলে সবাই দালানেই রয়ে গেল। ঠাকুর যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে খাটের তলায় ব্যায়াম করার লোহার বল, বারবেল, ডাম্বেল প্রভৃতি ছিল। এত জোর ভূমিকম্প হতে লাগল যে লোহার বল, বারবেল প্রভৃতি এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত গড়াতে শুরু করলো – সে কি বিকট আওয়াজ! সবাইতো ভয়ে অস্থির, বলতে লাগলো, “ঠাকুর, দেখো যেন বাড়ী না পড়ে যায়।” ঠাকুর বললেন, “না, বাড়ী পড়বে না, ভয় নেই, কারণ বাড়ীটা জলে মোচার খোলার মত ভাসছে।” ওদিকে অন্য পাড়ায় পুকুরের জল খালি হয়ে বাড়ীর ওপর বুকপ্রমাণ জল দাঁড়িয়ে গেছে - অনেক জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। সবাই ঠাকুরকে অনুরোধ করলো, “ঠাকুর, ভূমিকম্প থামিয়ে দাও।” ঠাকুর একটু জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন – সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রবৎ ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে গেল। ....পরে ভূমিকম্প এবং মনের শক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে কি করে বশে আনা যায় সেই সম্বন্ধে অনেক আলাপ

করলেন। বললেন যে, মনের শক্তির মাত্রা যদি প্রকৃতির শক্তির সঙ্গে একমাত্রায় আনা যায়, তবে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি আদেশ নির্দেশ শুনবে। .....পরদিন গ্রামের বহু লোক এসে দীক্ষা গ্রহণ করে - একদিনেই একশো বিরাশী জন দীক্ষা নেয়।

বৃহৎ জমিদার পরিবারের এখন বালক ঠাকুরের ওপর অগাধ বিশ্বাস। আড়াইহাজার স্কুলের বিজ্ঞান-শিক্ষক সুধীর বোস মরণাপন্ন। বিজ্ঞান-শিক্ষক হিসাবে তাঁর ওই অঞ্চলে খুব নামডাক, সবাই তাঁকে ভালবাসে। এই সুধীর বোস অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঢাকার সবচেয়ে নামী ডাক্তারকে আনা হয়েছে – এঁকে বলা হ'ত ঢাকার বিধান রায়। বড় ডাক্তার এলে কি হবে? সুধীর বোসকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে গেল, নাড়ী ছেড়ে গেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে না – ডাক্তাররা বললেন হার্ট-স্ট্রোক। সুধীর বোসকে ঘর থেকে বে'র করা হয়েছে। বড় ডাক্তার জবাব দিয়েছেন। ডাঃ হেমেন্দ্র রায়চৌধুরী ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে যাচ্ছেন। বালক ঠাকুর সেদিন আড়াইহাজার ছেড়ে চলে যাবেন বলে এগারোটার সময় স্নান করতে যাচ্ছেন, এমন সময় সবাই মিলে ছুটে এল ঠাকুরের কাছে। ওই অবস্থাতেই ঠাকুর গেলেন সুধীর বোসকে দেখতে। ঠাকুর হেমেন্দ্র চৌধুরীকে বাধা দিয়ে বললেন, "ডেথ সার্টিফিকেট লিখ না। আমাকে একটু দেখতে দাও।" যদিও ডাক্তারী মতে প্রাণহীন শব, ঠাকুর দেখলেন তখনও প্রাণ আছে। ঠাকুর একটা আঙুল দিয়ে

সুধীর বোসের কপালে ছুঁয়ে ডাক্তারদের বললেন, “অণিমা শক্তি দিয়ে ওর আজ্ঞাচক্রের সুইচটা টিপে দিলাম। দেখ তো এবার নাড়ী পাও কিনা।” দুই ডাক্তারই অবাক! এ কি, নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে তো! ঠাকুর আবার ওর ভ্রূর মাঝখানে আঙুল স্পর্শ করে বললেন, “আবার অণিমা সুইচটা টিপে দিলাম।” সুধীর বোস এবার চোখ মেলে তাকালেন। সকলে রুদ্ধশ্বাসে বালক ঠাকুরের কার্য্যকলাপ দেখছে। এবার আবার আঙুল স্পর্শ করে বললেন, “এবার শেষবারের মত সুইচ টিপলাম।” সুধীর বোস উঠে বসলেন। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কেমন আছ?” সুধীর বোস বিস্ফারিত নেত্রে বলে উঠলেন, “এ কী! এখানে কী করে এলাম? আমি তো আকাশে উড়ছিলাম!” সকলে তো দেখে-শুনে অবাক! সুধীর বোসের পুনর্জীবনলাভের কথা মুখে মুখে সর্বত্র রটে গেল। বালক ঠাকুরের আর সেদিন যাওয়া হ’ল না। পরদিনই এই হিস্যার হেমেন্দ্র চৌধুরী, ধীরেন্দ্র চৌধুরী এবং বাড়ীর সকলে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। রাজেন চৌধুরীও নরম হয়ে এসেছেন। বালক ঠাকুরকে আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন না, দেখা হলে প্রণামও করেন।

প্রাতঃভ্রমণ বালক ঠাকুরের দিনপঞ্জীর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। একদিন প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরছেন। বাড়ী ভুল করেই হোক আর যাই হোক, আর এক বাড়ীতে ঢুকে কড়া নাড়তে লাগলেন। এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন। বৃদ্ধ কিছু জিজ্ঞাসা

করবার আগেই ঠাকুর বললেন, "তোমার গেরুয়া কাপড় কোথায়? স্নান করে গেরুয়া কাপড়টি পরে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।" বৃদ্ধ তো আকাশ থেকে পড়লেন - এ ছেলেটি বলে কি! ......বহুদিন আগের কথা – বৃদ্ধ তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছেন – বারদীর খ্যাতনামা সাধক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে নিয়মিত যাতায়াত করেন এবং লোকনাথ বাবার তখনকার পাচক ও পরিচারক অশ্বিনী চ্যাটার্জীকে বাবার সেবাকার্যে সহায়তা করেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী কিন্তু তাঁকে দীক্ষা দেন না, বলেন, "যোগেশ, আমি তোকে দীক্ষা দেব না। তার বদলে এই গেরুয়া কাপড়খানি দিচ্ছি। তোর যিনি গুরু হবেন, তিনি তোকে এই গেরুয়া কাপড়খানা পরে আসতে বলবেন। সেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হবে প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে।" ......তারপর কয়েক যুগ কেটে গেছে। ইতিমধ্যে যোগেশ চৌধুরী বি.এ পাশ করেছেন। তখনকার দিনে পাশের সংখ্যা এত কম ছিল যে, বিশ-পঁচিশ গ্রামের মধ্যে তিনিই একমাত্র গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন – দক্ষ হেডমাস্টার হিসাবে তাঁর নামডাকও ছিল বেশ। আজ শিক্ষকতা থেকেও অবসর গ্রহণ করেছেন প্রায় দুই যুগ হতে চললো। তারপর কত দেশ, কত তীর্থস্থান, কত মঠ-মন্দির ঘুরে বেড়িয়েছেন গুরুর সন্ধানে। শেষে প্রায় হতাশ হয়ে বাড়ীতে এসে বসেছেন। লোকমুখে অবশ্য তিনি এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাশালী বালক ঠাকুরের কথা শুনেছেন, কিন্তু

তাঁকে দেখতে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। আজ বালকের মুখে সেই গেরুয়া কাপড়ের কথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। লোকনাথ বাবা আর তিনি ছাড়া কোন তৃতীয় ব্যক্তি এই গেরুয়া কাপড়ের কথা তো জানে না! অবশ্য লোকনাথ বাবা বলেছিলেন যে, তাঁর গুরু নিজেই সেই গেরুয়া কাপড়ের কথা জিজ্ঞেস করবেন, সুতরাং তাঁর গুরুকে চিনতে অসুবিধা হবে না। তবে কি এই বালকই তাঁর গুরু! চিন্তার স্রোতে ভেসে চলেন যোগেশ চৌধুরী। ইচ্ছা হ'ল বালককে ডেকে ঘরে একটু বসান! কিন্তু কোথায় বালক! তিনি তো অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছেন।

গেরুয়া কাপড়টি তিনি সযত্নে তুলে রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু সে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের কথা। কোথায় যে রেখেছেন মনে করতে পারছেন না। পুরো দু'দিন লেগে গেল এ-বাক্স সে-বাক্স হাতড়িয়ে গেরুয়া বস্ত্রটি উদ্ধার করতে। এর মধ্যে মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অনেকটা কেটে গেছে - স্নান করে গেরুয়া বসনটি পরে যোগেশ চৌধুরী গেলেন বালক ঠাকুর সমীপে। ঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন, "কি, এখনও দ্বিধা কাটেনি? লোকনাথ বাবার কথার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলে?" ঠাকুরের কথায় যোগেশ চৌধুরীর যেটুকু সন্দেহ ছিল তা দূর হ'ল। ভক্তিনম্রচিত্তে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করে জীবন সার্থক করলেন।

আড়াইহাজার থেকে ফিরে এসেছেন ঠাকুর উজানচর-কৃষ্ণনগরে। স্কুলের পড়া, খেলাধূলা, তত্ত্ব-আলাপ,

স্বতঃস্ফূর্ত বিভূতি – কোনটারই বিরাম নেই। সহপাঠীদের কাছ থেকে কি কি পড়া হয়েছে দেখে নিলেন এবং কয়েকদিন সেগুলো পড়ে তৈরী করে রেখে দিলেন। একবার যা পড়তেন যা শুনতেন, তিনি কোনদিন ভুলতেন না। সুতরাং তাঁকে বেশী পড়তে হ'ত না। আর বেশী পড়াশুনা করবার সময় কোথায়? ভক্ত-শিষ্যের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, দর্শন দিতে, তাদের সমস্যার সমাধান করতে করতেই এক একদিন স্কুলে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না; আবার স্কুলে গেলেও সেখানে ভক্তদের ভীড় জমে যায়। তারা দেখতে যায় - কেমন করে ঠাকুর স্কুলে পড়াশুনা করেন।

শিষ্য-ভক্তদের একান্ত অনুরোধ ফেলতে পারেন না, তাই প্রায়ই তাঁকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হয়। আশেপাশের দশ-বারোটি গ্রাম ঘুরেছেন - দীক্ষাও নিয়েছে প্রচুর। একদিন আশু সেন এসে ধরেছেন, “গোঁসাই, একটা বিরাট যোগ আছে - অনেকেই কলকাতায় গিয়ে গঙ্গাস্নান করে পুণ্য অর্জন করে, আমার তো আর সে ভাগ্য হয়নি। একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আমি গঙ্গাস্পর্শ করে ওই দিনে জীবন সার্থক করতে পারি।” ঠাকুর বললেন, “ঠিক আছে জ্যেঠামশায়, চিন্তা করবেন না। এখানেই আপনাকে গঙ্গাস্নান করাবো।” আশু সেন ঠিক বুঝতে পারলেন না যে এখানে কি করে বালক গঙ্গাস্নান করাবেন। তবুও বালক যখন কথা দিয়েছেন, তিনি আর দ্বিরুক্তি করলেন না। স্নানের আগের দিন

কাছারী বাড়ীর ছাদে যাবার বন্দোবস্ত ঠিক করতে বললেন আর জল যাতে ছাদ থেকে তখনকার মত বেরিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে বললেন। আশু সেনকে ঠাকুর গঙ্গাস্নান করাবেন শুনে অনেকেই উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তারাও চায় গঙ্গাস্নান করতে। পরদিন সবাইকে কাছারী বাড়ীর ছাদের ওপর যেতে বললেন। অনেকেই গেছে কি হয় দেখতে। কিছুক্ষণ পরে কলকল করে গঙ্গাজলের স্রোত বয়ে গেল ছাদের উপর দিয়ে। আশুবাবু এবং অন্যান্য সকলে সেই পবিত্র গঙ্গার জলে স্নান করে মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন।.......

বালক ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় গেছেন। বহু লোক আসছে তাঁকে দর্শন করতে, দীক্ষাও নিচ্ছে অনেকে। একদিন দু'টি মহিলা একটি অল্পবয়সী ছেলেকে নিয়ে দর্শন করতে এলেন। বড় বোনটা দীক্ষা নিলেন। ছোট বোনকে ঠাকুর বললেন, "আগামী বৃহস্পতিবার এস, সেদিন তোমায় দীক্ষা দেব।" এভাবে তো ঠাকুর সচরাচর কাউকে বলেন না, নিশ্চয়ই এর ভিতরে কোন রহস্য আছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, মহিলাটির স্বামী ছিলেন মৈমনসিং-এর বিখ্যাত গভর্নমেন্ট প্লীডার - নাম কুলদা মুন্সী। স্বামী আগেই মারা গেছেন। মহিলা একদিন স্বপ্ন দেখছেন – কোথায় এক পাহাড়ে গেছেন, সেখানে পরিশ্রান্ত হয়ে বসে আছেন। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ আরাম লাগছে, হাত-পা ছড়িয়ে পাথরের ওপরে তিনি শুয়ে পড়েছেন, এমন সময় দেখলেন যে,

কৃষ্ণ এসে মাথার কাছে দাঁড়িয়েছেন আর শিব দাঁড়িয়ে আছেন পায়ের কাছে। মহিলা তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। কৃষ্ণ তাঁর কানে মন্ত্র দিয়ে বললেন, “আমাকে খুঁজে বা’র করবি, আমি তোকে আবার এই মন্ত্র দেব।” স্বামী বেশ টাকা পয়সা রেখে গেছেন, সুতরাং মহিলার কোন অভাব নেই। তিনি ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন গুরুর সন্ধানে। অবশেষে ভগ্নচিত্তে ফিরে এলেন বাড়ীতে। এর পরে একদিন ঢাকায় দিদির বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন, সেখানে একটি অল্পবয়সী ছেলের মুখে শুনলেন বালক ঠাকুরের কথা। তিনি নাকি স্বামীবাগে কয়েকদিনের জন্য এসেছেন - আশ্চর্য তাঁর শক্তি – বহু লোক তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করছে। সেই শুনে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে দুইবোন এসেছেন। বড় বোনকে ঠাকুর দীক্ষা দিলেন, ছোট বোনকে বৃহস্পতিবার আসতে বললেন। বালককে দেখে তাঁর ভালই লেগেছে, তবে তাঁর ছেলের বয়সী হবে বলে মনে একটু কিন্তু যে না আছে, তা নয়। যাই হোক, বৃহস্পতিবার সকালে স্নান করে ঠাকুরের কাছে মহিলা গেলেন। ঠাকুর দীক্ষা দিলেন!- মহিলা চমকে উঠলেন – এ তো সেই স্বপ্নে-পাওয়া মন্ত্র! ঠাকুর একটু হেসে বললেন, “শিব খুশী হয়েছেন।” মহিলা ঠাকুরের পা জড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।...

কৃষ্ণনগরে ফিরে এসেছেন। সন্ধ্যার সময় অনেকেই [আশু সেন, ত্রৈলোক্য সোম, আনন্দ মাষ্টার।

('জীবন দর্শন' – হরিবন্ধু রায়।)] এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন, "বাবা, আমাদের কি হবে?"

বালক ঠাকুর জবাব দিলেন, "হবে, ঠিক হবে, হবার জন্যই তো আসা। হবে বলেই তো সবাই এসেছি এখানে। তবে হবে না কেন? চৈতন্যময় এই বিশ্বে সবই চৈতন্যময়। চৈতন্যময় বস্তুর সমষ্টি থেকেই এসেছে আমার চেতনা। আমার চেতনাই প্রমাণ করছে সেই চৈতন্যময় জগৎ! চৈতন্যময় জগৎ থেকে সবাই আমরা নিয়ে এসেছি চেতনাশক্তি। যে বস্তুর সমষ্টি নিয়ে আসা, সেই বস্তুর সমষ্টি নিয়েই যাওয়া – এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আসার ও যাওয়ার পথ তাই এক পথ, একই ধারা, - একই সমষ্টিগত প্রাণ। তাই তো আমাদের মধ্যেও রয়েছে সেই প্রাণ, সেই মন, সেই চৈতন্য। এই মহাশূন্যেই চৈতন্যের অণু-পরমাণুগুলো বর্তমান। তার মধ্যেই ঘুরছে গ্রহ-উপগ্রহ, তা থেকেই জীব - সৃষ্টি। আমি, আপনি ও জীবজগতের সবাই আমরা সেই মহাশূন্যেরই বস্তু। সবাই আমরা চৈতন্যময়। মহাশূন্যেই বিরাজ করছি। মহাশূন্যের সীমা নেই, বস্তুরও তাই সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই সীমানাহীন বস্তু হতে বস্তু দিয়েই তৈরী আমি, আপনি ও আমরা সবাই। সহজভাবে এটা বোঝা উচিত - কোথা থেকে, কী ভাবে, কেন এসেছি আমরা সবাই। সেই মহাবিরাট সাড়ার সাড়া আমাদের সবার মধ্যেই আছে। একই সাড়া ও সুর হতেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা তো সবাই সেই একই সাড়াতে ডুবে রয়েছি। বাস্তব বোধ

নিয়ে, বাস্তবের সত্তা নিয়ে এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর চিন্তা করে যান। বাস্তবের এই ধারা নিয়েই চলে যান - ডুবে যান সেই ধারাতে, যে ধারাতে এসেছেন। একই বৃক্ষের বহু বীজ - সেই বৃক্ষেরই রূপ ধারণ করে। বিশ্বের জীবজগৎ তারই বীজ - রূপ নেবে তারই। প্রকৃতির গ্রন্থ অনুসরণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এর বাইরে কিছু নয় - কল্পনায় কিছু নয়।”

- কি ভাবে যাব; পথ বলে দাও, বাবা।

- কী ভাবে যাবেন? আপনার এই দেহের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এই যে ইন্দ্রিয়গুলো, এগুলোর কি কাজ জানেন?

বিরাট ক্ষমতা এদের। বিশ্ব-বিরাটের অনন্ত শক্তির এগুলো হচ্ছে নমুনা। জিনিসপত্র কেনা-বেচার সময় নমুনা পাঠায় না? এগুলোও সেই নমুনা। এগুলোর কোনটা কি বলছে, কিসের সাড়া দিচ্ছে – তা ভাবুন। ভাল করে ভেবে দেখতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে। বিশ্বের যাবতীয় যা কিছু, সব এরাই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে। এই যে সব কিছু জেনে নেবার ও জানিয়ে দেবার ক্ষমতা – আপনার মধ্যেই তো রয়েছে, সবারই আছে। প্রকৃতি কাউকে ফাঁকি দেয়নি। সবই যখন আপনার আয়ত্তের মধ্যেই আছে, তবে আপনি বিশ্বের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন না কেন?

বাস্তব গ্রন্থের সাথে আপনার দেহ-গ্রন্থকে মিশিয়ে দিয়ে আপনি শুধু জেনে যান, বুঝে যান - তার

মধ্যেই ডুবে যান, নিজের পড়াতেই নিজে ডুবে যান, তবেই এই সুর, তান, লয়, মাত্রা সব কিছু খুঁজে পাবেন – প্রকৃত রস আস্বাদন করতে পারবেন। এটা কল্পনা নয়, স্বপ্নরাজ্যের কথাও নয়, বাস্তব জগতের বাস্তব সত্য ও জ্ঞানের কথা। বাস্তব সুর - ধারার ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত সুর - ধারাকে কি ভাবে ভরা যায়, এটা তারই কথা। এটাই সাধনা। এই যে সত্য, এটা উপলব্ধি করাই হ'ল ধর্মের সার কথা। ধর্মে তাই কোন অনুষ্ঠান বা আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না, আশ্রম বা সন্ন্যাসের প্রয়োজন হয় না। সর্বভূতেই তো আশ্রম, এই পৃথিবীই তো একটা বিরাট আশ্রম। জন্মই তো সন্ন্যাস। সবাই আমরা একদিকে বিরাট যোগী ও ত্যাগী, আবার অন্য দিকে বিরাট ভোগী। এই যে যোগী, ত্যাগী ও ভোগী - শুধু বুঝবার জন্যই নামানামি। আসলে সবই কিন্তু এক। সবাই আমরা এক যোগাযোগেই আছি, তাই যোগী – এটাই শুধু বুঝতে হবে।

- বাবা, তুমি ঠিক করে বলতো, এই ভোগের মাঝে থেকেও কি তাঁকে পাবো?

- পথ-হারার বহু পথ; একবার যে দিক চিনতে পেরেছে, তার জন্য কিন্তু একটাই পথ। এই যে নানা মতবাদ – এগুলোর শেষ পরিণতি বিবাদ। এগুলো ভগবানকে জানার পথ নয়। যে ভগবানকে খুঁজতে চাইছেন, সেই ভগবানের ভগবত্তা যেটা, তার সঙ্গে যদি যোগাযোগে থাকতে হয়, সেই শক্তির সঙ্গে যদি যোগাযোগ রাখতে হয়, তবে ভোগের পথ দিয়েই যেতে হবে।

যেটাকে ভোগ বলছেন, সেটা কিন্তু আসলে ভোগ নয়। জীব-জগতের সবাই মুহূর্তে মুহূর্তে ত্যাগই করে যাচ্ছে। কেউই তো কোন কিছু ভোগ করছে না। ক্ষুধা তো কারও মিটছে না। পৃথিবীতে কোন জীবই ভোগ করতে আসেনি। ভোগ যেটাকে বলি, সেটা ত্যাগেরই সূচনা। দিনের পর দিন সব কিছু ত্যাগ করে করেই তো চলছি মহাশ্মশানের দিকে। এই যে দেহ - এটাও একদিন ত্যাগ করতে হবে। মিশে যাব সবাই সেই ধারাতে, যে ধারাতে এসেছি। মৃত্যু যাকে বলা হয় সেটাই তো শেষ নয়- পরিবর্তন মাত্র। সূর্যের যেমন উদয়ও নেই, অস্তও নেই - উদয়-অস্ত শুধু ব্যবহারিক দিক থেকে নামকরণ মাত্র। জন্ম-মৃত্যু, উদয়-অস্ত তেমনি শুধু ব্যবহারিক নাম। যে সূর্য চিরকালই উদিত, তার আবার অস্ত কি? যার জন্ম হয়েছে - যা চিরকালই চলছে তার আবার জন্ম-মৃত্যু কি?- শুধু পরিবর্তন। এই পরিবর্তনশীল জগতে শুধু পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনের মাঝে পরিবর্তিত হতে হতেই তো চলছি সবাই বিরাটের দিকে। আমাদের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। সবাই আমরা যাত্রিক, সবাই পথিক।

সেদিনকার মত এখানেই শেষ করলেন। সকলে ভরপুর হয়ে গেলেন।

পূজার ছুটি এসে পড়েছে। ছুটিতে মামাবাড়ী দোগাছিতে গেছেন। পৈত্রিক ভিটা মেদিনীমণ্ডল যদিও মাইল দেড়েক দূরে, বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন না। হয়তো বা মাঝে মাঝে যেতেন, আবার দেখা-সাক্ষাৎ করে সেই

দিনই ফিরে আসতেন। মামাবাড়ীর সঙ্গেই বেশী যোগাযোগ ছিল বালকের। মামাবাড়ীর মত শেফালীদের বাড়ীতেও পূজা হয় - ওদের অবস্থা বেশ ভাল। ঠাকুরকে পূজার সময় আসতে অনুরোধ জানিয়েছে ‘শেফা’। ঠাকুর কথা দিয়েছেন যে তিনি যাবেন ও আরতি করবেন। অষ্টমীর দিন সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে পৌঁছলেন শেফালীদের বাড়ীতে। মামাবাড়ী থেকে বেশী দূর নয়, পাঁচ-দশ মিনিটের পথ, তবে বিলে দেশ, তাই বর্ষার সময় নৌকায় করে যেতে হয়। ঠাকুরের তখন লক্ষ লক্ষ শিষ্য। সাধারণ গুরুরা তাঁদের মান-মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে শিষ্য-ভক্তদের সামনে ঐভাবে আরতি করতে রাজী হবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঠাকুরের স্বচ্ছ-পবিত্র মনে কোন দ্বিধা নেই- সব বাড়ীকেই তিনি আপন বাড়ী বলে মনে করেন এবং বাড়ীর ছেলে যে ভাবে নির্দ্বিধায় আরতি করতে নেমে যায়, তিনিও সেই রকম ধূপতি হাতে নেমে গেলেন আরতি করতে। এমন সুন্দর আরতি দোগাছিতে কেউ কোনোদিন দেখেনি। এত ধূপ দিয়েছেন যে ধূপের ধোঁয়ায় তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না, শুধু দেখা যাচ্ছে সুললিত ছন্দে আরতি-নৃত্য, ঢাকের তালে তালে। সকলেই মুগ্ধ হয়ে আরতি দেখছে। অন্যেরা কী দেখেছে বলেনি, কিন্তু শেফালী, তার মা এবং বাড়ীর আরও আট-দশ জন একই দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছে। কখনও দেখছে শিব ডমরু হাতে নৃত্য করছেন, কখনও দেখছে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ বাজনার তালে তালে নৃত্য করে চলেছেন। স্বপ্ন না

সত্যি দেখার জন্য একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে – সবাই তো একই কথা বলে, একই দৃশ্য দেখে!....

বিধু পাল ঢাকেশ্বরী কটন মিলসে কাজ করে। অনেকদিন পরে ঠাকুরের কাছ থেকে হঠাৎ চিঠি পেয়ে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ঠাকুর তাকে উজানচর-কৃষ্ণনগরে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই চারদিনের ছুটি নিয়ে কালবিলম্ব না করে সে রওনা হ'ল। উজানচরে পৌঁছে দেখে, ঠাকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। লঞ্চ থেকে নামতেই তাকে আদর করে বুকে টেনে নিলেন। ছোটবেলার নানা রকম গল্প করতে করতে বাড়ীতে তাকে নিয়ে গেলেন। কাছারীঘরে বিধু পালের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে ঠাকুর কাছারীঘরে গেলেন। ঠাকুর হঠাৎ বললেন, "কাজ করবি, বিধু?" প্রথমে না বুঝলেও শেষে বুঝলো, ঠাকুর ওকে জপ করতে বলছেন। বিধু পাল সম্মতি জানালো। দুটো আসন পেতে দুজনে বসলেন। ঠাকুর বলেন, "আমি ছাদে যাব, সেখানে গিয়ে আমাকে স্পর্শ করবি- আমি যে অবস্থায় থাকি না কেন।" বিধু আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করে জপ করে চলেছে। কিছুক্ষণ কেটে গেছে - হঠাৎ শব্দ শুনে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে, ঠাকুর আসনে নেই। আশ্চর্য হয়ে গেল - ঠাকুর গেলেন কোথায়, ঘরের দরজা তো বন্ধই রয়েছে! তখনই মনে পড়লো যে ঠাকুর ছাদে যাবেন বলেছিলেন। দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে যে দৃশ্য দেখলো, তাতে সে ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেল।

ঠাকুরের পরনে বাঘের ছাল, গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, দুই হাতে দু'টি সাপ জড়িয়ে আছে আর শোঁ শোঁ করে ভীষণ আওয়াজ করছে। ঠাকুরের চারিদিকে এক জ্যোতির্ময় বেষ্টনী। বিধু পাল ভয়ে আতঙ্কে পিছিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল যে ঠাকুর তাকে স্পর্শ করতে বলেছেন। ঠাকুরের নাম করে সাহসে বুক বেঁধে ঠাকুরকে স্পর্শ করলো। ঠাকুর হেসে বিধু পালের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "এখানে বস।" কিছুক্ষণ পর বললেন, "নীচে গিয়ে আবার একটু জপ কর।" সে ঠাকুরের নির্দেশ মত কাছারীঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে জপে বসে গেল। একটু পরেই শুনতে পেল ঠাকুরের গলা, "আলোটা জ্বাল।" আলো জ্বেলে দেখে, ঠাকুর সামনে তাঁর আসনে বসা। ঠাকুরের অণিমা এবং অষ্টসিদ্ধির কথা সে অনেক শুনেছে, কিন্তু স্বচক্ষে দেখার তার সৌভাগ্য হয়নি। এই অলৌকিক শক্তি দেখার ইচ্ছা তার অনেকদিন থেকেই ছিল। ঠাকুর তার অভিলাষ এইভাবে মেটালেন। "কি ভাবছিস? শুয়ে পড় এখন। একা থাকতে ভয় করবে না তো?", ঠাকুর বললেন। "না ঠাকুর, তুমিও যাও, একটু বিশ্রাম কর গিয়ে।" বিধু পাল উত্তর দেয়।......

উজানচর কংসনারায়ণ স্কুলে নামকরা শিক্ষাবিদদের সমাবেশ হয়েছিল। হেডমাস্টারমশায় মহেন্দ্রবাবু তখনকার দিনে বিশ-পঁচিশ গ্রামের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট এবং কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁর খুব নাম ছিল। তিনি কখনও কাউকে বেশী কটু কথা বলতেন না, তাঁর

ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে, তাঁর উপস্থিতিতেই সর্ব বিভাগ সুন্দরভাবে চলতো। নিবারণ বাবুর গণিতশাস্ত্রের উপর অদ্ভুত দখল ছিল। স্কুলের সেক্রেটারি ভগবানবাবু নিজে লেখাপড়া জানতেন না বটে, কিন্তু শিক্ষার প্রসারে তাঁর মত আগ্রহী দেখা যায় না। উজানচর স্কুলের কৃতী ছাত্র কৃষ্ণধনবাবু ছয়টি লেটার পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন - তিনি বি.এ. পাশ করার পর ভগবানবাবু তাঁকে স্কুলের শিক্ষক হিসাবে নিয়ে এলেন। বাইরের ভাল চাকুরী উপেক্ষা করে তিনি শিক্ষাদানে ব্রতী হলেন। কৃষ্ণধনবাবু রাশভারী মানুষ - ছাত্রেরা তাঁকে সমীহ করে চলে। শিক্ষক হিসাবে অল্পদিনেই তিনি বেশ নাম করে ফেলেছেন।

শিক্ষক হিসাবে নাম করলে কি হবে, কৃষ্ণধন বাবুর পরিবারে কারও মনে শান্তি নেই। বৃদ্ধা মা সবসময়ই দুঃখ করেন যে, তাঁর পুত্রের কোন সন্তান হ'ল না - বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না। যতরকমের চেষ্টা করা প্রয়োজন সবই করা হয়েছে – তাবিজ-কবচ মানত, মঠ মন্দির কোনটাই বাকী নেই, তবু কৃষ্ণধনবাবুর কোন সন্তান হ'ল না। বিয়ের পর বারো বছর পার হয়ে গেছে - আর কবে বৃদ্ধা নাতি-নাতনীর মুখ দেখবেন! লোকের মুখে রোজই শোনেন বালক ঠাকুরের অপূর্ব অলৌকিক শক্তির কথা - ভাবেন, বালককে বললে কি তিনি কৃপা করবেন না? বালক মাস্টারমশাইয়ের বাড়ীর কাছ দিয়ে স্কুলে যান, কিন্তু আর সব ছাত্রদের মত মাস্টারমশাইয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে একটু দূর দিয়ে যান। কারণ

সবাই এই মাস্টারমশায়কে বাঘের মত ভয় করে এবং যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলে। কৃষ্ণধনবাবুর বৃদ্ধা মা বালকের পথ চেয়ে বসে থাকেন, ছেলে বাড়ীতে না থাকলে বালককে ডেকে আনেন, নিজের সমস্যার সমাধান খোঁজেন। একদিন বালক ঠাকুরকে দেখে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে ডাকলেন, ‘ও গোসাঁই, ও গোসাঁই।’ ঠাকুর কাছে যেতে বৃদ্ধা বলেন, ‘গোসাঁই, কৃষ্ণধনকে একটি সন্তান দেবে না?’ ঠাকুর তখন ক্লাস সেভেন কি এইটে পড়েন - বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হলে রগড়ও করেন। ঠাকুর বললেন, “তোমার ছেলেকে বলতে পার না বুড়ী - ছেলেদের এত মারধোর করে কেন?” বৃদ্ধা দুঃখ করে বলেন, “কৃষ্ণধন বুঝি ছেলেদের মারে!” ঠাকুর উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, আগে তাকে মারধোর করতে নিষেধ করো।” সেদিন স্কুল থেকে ফিরলে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, “কৃষ্ণধন, তুই নাকি ছেলেদের মারিস?” কৃষ্ণধন বাবু জিজ্ঞেস করেন, “কে বলেছে?” পুত্রের কথায় উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, “ছেলেদের আর মারিস না।” মায়ের কথা শিরোধার্য্য। কৃষ্ণধনবাবু আর কোন কথা বললেন না, তবে মনের ভিতর বুঝতে পারলেন যে, কে এই কথা মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। পরের দিন ঠাকুর তাঁর দিকে কৃষ্ণধনবাবুর তাকানো দেখেই বুঝতে পারলেন কি ঘটেছে। এর পর কয়েকদিন কেটে গেছে। বৃদ্ধা আবার বালককে ধরলেন, “কই গোসাঁই, কৃষ্ণধনকে সন্তান দিলে না?” বালক বলেন, “ঠিক আছে বুড়ী ব্যবস্থা করছি, মাকে

একবার ডাক।” কৃষ্ণধন বাবুর স্ত্রী রান্নাঘরে ধোয়াধুয়ির কাজে ব্যস্ত ছিলেন - শ্বাশুড়ী ডাক দিলেন, “কই বৌমা এদিকে এস, গোসাঁই এসেছে।” তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে পরিষ্কার কাপড় পরে কৃষ্ণধনবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। ঠাকুর কৃষ্ণধনবাবুর স্ত্রীর পেটে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “ভাবনা নেই, মা, এবার পেটে বাচ্চা আসবে।” দুই-এক মাসের মধ্যেই কৃষ্ণধন বাবুর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলেন এবং যথা সময়ে একটি কন্যারত্নের জন্ম দিলেন। দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ সন্তান পেয়েছেন বলে কন্যার নাম রাখলেন ‘অঞ্জলি’। বাড়ীতে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল - বৃদ্ধা নাতনীর মুখ দেখে শান্তি পেলেন। কৃষ্ণধন বাবু আড়াই মণ দুধের ক্ষীরের লাড়ু করে নিয়ে ঠাকুরের বাড়ীতে দিয়ে এলেন। ঠাকুর সবার মধ্যে সেই ক্ষীরের লাড়ু বিলিয়ে দিলেন। এই ভাবে বার-তের বছর পরে ঠাকুরের আশীর্বাদে কৃষ্ণধন বাবুর সন্তান হওয়ার সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। [আজও কৃষ্ণধনবাবু (কৃষ্ণধন সাহা - পরিচিতির মধ্যে ফটো আছে) প্রতি কথাতে ঠাকুরের এই বিরাট আশীর্বাদের কথা সবাইকে বলেন। ঠাকুরের কথা বলতে গিয়ে আজ কৃষ্ণধন বাবুর মনে প্রশ্ন জাগে, ‘সত্যিই কি ঠাকুর ছাত্র ছিলেন!’ সেই দিনগুলো তাঁর কাছে স্বপ্নের মত লাগে। ঠাকুরের কথা বলতে তাঁর আজ অঝোরে অশ্রু ঝরে]।

।। উনিশ ।।

ক্লাস এইট-এর ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেল। বালক ঠাকুর ভালভাবেই পাশ করে ক্লাস নাইনে প্রমোশন পেলেন। বড়দিনের ছুটি - স্কুল খুলতে বেশ কিছুদিন দেরী আছে - আড়াইহাজার থেকে চিঠির পর চিঠি আসছে, লোক মারফৎ আবেদন আসছে। গতবার আসার সময় কথা দিয়ে এসেছিলেন যে শীঘ্রই আবার আড়াইহাজারে যাবেন। বড়দিনের ছুটিটাই বেছে নিলেন। বালক ঠাকুরকে পেয়ে এবার আড়াইহাজারে প্রাণের জোয়ার বয়ে গেল - যেন একজন অতি আপনজন বহু দিন পরে এসেছেন। তাঁর সঙ্গ কেউ ছাড়তে চায় না। রোজই নানারকম আলাপ-আলোচনা হয় - সবাই মন দিয়ে শোনে। বিজ্ঞান-শিক্ষক সুধীর বোস নবজীবন লাভ করে ঠাকুরকে আর ছাড়তে চায় না, বলে, “আমি সারা জীবন বিজ্ঞানের চর্চা করে এসেছি, কিন্তু আজ দেখছি আমার যেখানে জানার শেষ, সেখান থেকেই বালকের জানার আরম্ভ।” রাজেন চৌধুরী তাঁর ভাই হেমেন্দ্রকে বলেন, “না রে হেমা, ফেলবার মত নয় রে।” এই রাজেন চৌধুরীই একদিন বলেছিলেন, “সাধু এসেছে, কিছুদিন খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করে দে।” তারপর নদী গর্ভ দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে – বালক ঠাকুরের ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ দেখে সবাই সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজেন চৌধুরীর মধ্যেও বিরাট পরিবর্তন এসেছে। একদিন তিনি এসে বললেন, ‘ঠাকুর, আপনার অনুমতি পেলে আমার বাড়ীতে

আপনার ভোগের ব্যবস্থা করি।' এই হিস্যার সবাই তো শুনে অবাক – রাজেন চৌধুরীর মত ঘোর নাস্তিক শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করছে – ব্যাপারটা কি! রাজেন চৌধুরীর চরিত্র তো সবাই জানে! পূজা-আর্চা, দেব-দেবতাদের কাছ দিয়েও তিনি নেই। একদিন ছেলেকে ডেকে পান না, খোঁজ করে জানতে পারলেন - ছেলে কোথায় কীর্তন শুনতে গেছে। তিনি শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন- নিজেই কীর্তনের আসরে গিয়ে উপস্থিত। ছেলের কান ধরে তুলে নিয়ে এলেন; বললেন, 'কুচুনী পাড়ায় যাবি সেও ভি আচ্ছা, তবু কখনও কীর্তন বা দেব-দেবতাদের মন্দিরে যাবি না।' ছেলে তাই ভয়ে কোনোদিন কোন পূজা-মণ্ডপেও যায় নি। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছে। অবশ্য স্ত্রীর ধর্মবিশ্বাসে তিনি বাধা দিতেন না। নিজে ওসবের মধ্যে যেতেন না, ছেলেকেও যেতে দিতেন না। এ হেন রাজেন চৌধুরীর মুখে ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করবে শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। ঠাকুর অনুমতি দিলেন। এবাড়ী ওবাড়ীর সবাইকে রাজেন চৌধুরী নেমন্তন্ন করেছেন। হেমেন্দ্র চৌধুরী ও বীরেন্দ্র চৌধুরী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন, - 'ব্যাপার কী, সবাইকে রাজেনদা নেমন্তন্ন করেছেন, আবার দেখছি নতুন কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!' ঠাকুরকে অনুরোধ করেছেন এগারোটার মধ্যে যেতে। ঠাকুর স্নান সেরে এগারোটার সময় রাজেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী গেলেন। সসম্ভ্রমে ঠাকুরকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই এসে বললেন, 'আপনি

একটু ঠাকুর ঘরে চলুন।’ ঠাকুর ওদের সঙ্গে ঠাকুর-ঘরে ঢুকলেন, এবার রাজেন চৌধুরী বললেন, ‘আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে দীক্ষা দিন।’........ ঘর থেকে বেরিয়ে তিন ভাই কোলাকুলি করলেন। সে কি আনন্দ-উচ্ছ্বাস!...... পরে, ঠাকুরের মুখের ওপর তিনি যে তামাকের ধোঁয়া ছাড়তেন, তাঁর সামনে যে গড়গড়া টানতেন - সেই জন্য অজস্র ক্ষমা চাইলেন। এঁরা সকলেই ঠাকুরের পিতার থেকেও বয়সে বড়, সুতরাং ঠাকুর নাম ধরে না ডেকে ‘নিমাইয়ের বাবা’, ‘অমুকের বাবা’ বলে ডাকতেন। প্রথমে হেমেন্দ্র চৌধুরীই আপত্তি তুললেন, ঠাকুর ডাকলেও জবাব দেন না। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি, জবাব দিচ্ছ না কেন?’ হেমেন্দ্র বলেন, “আমার বাবা কি আমাকে ‘নিমাইয়ের বাবা’ বলে ডাকবেন?” অতঃপর ঠাকুর হেমেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, রাজেন্দ্র বলে ডাকতেন। রাজেন চৌধুরীর কথা এখানেই শেষ হয়নি। সেইদিনই ছেলে গুর্খাকে টেলিগ্রাম করে দিলেন যে তিনি দীক্ষা নিয়েছেন, সে যেন পত্রপাঠ চলে আসে। গুর্খা তখন অফিসে, তার হাতে এসে টেলিগ্রামটা দিল। টেলিগ্রাম পড়ে গুর্খা বিশ্বাস করতে পারে না - কেঁদে ফেলে। তখনই ছুটি নিয়ে বাড়ী যায়। বাড়ীতে পৌঁছতেই জিজ্ঞাসু পুত্রকে রাজেন্দ্র বললেন, ‘হ্যাঁ, আমার ভগবদদর্শন হয়েছে, দেবদর্শন হয়েছে। যা, আগে স্নান করে আয়।’ স্নান করে এসে গুর্খাও সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ ক’রল।

ঠাকুরের কাছে সবাই এসে বসে, তাঁর উপদেশ-নির্দেশ শোনে, বিজ্ঞান-শিক্ষক সুধীর বোস জানার

আগ্রহে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে। ঠাকুর মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনা করেন – এই যে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র আকাশের বুকে ঝকঝক্ করছে – পৃথিবীর বালুকণা গোনা সম্ভব হলেও এই অনন্ত সৃষ্টি গুনে শেষ করা যায় না। তবু গণিতের দৃষ্টিতে এই অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র গোনা সম্ভব। সব যদি গুনে শেষ করাও যায়, তবু দেখা যাবে যে, সৃষ্টবস্তুর সমষ্টি এই মহাশূন্যের কাছে একটি নস্যির টিপও নয়। তাহলেই বোঝা যায় ফাঁকা কত বিরাট! – এই ফাঁকা থেকেই তুমি এসেছ, সুতরাং তুমিও বিরাটের সন্তান বিরাট। তোমার মধ্যেও অনন্ত শক্তি রয়েছে। যেটা যাপ্য রয়েছে, সেটাকেই জাগিয়ে জেনে নিতে হবে। ঠাকুর হঠাৎ সুধীর বোসকে বললেন, "একটা টর্চের বাল্ব নিয়ে এস তো। এবার বাল্বটা তোমার ভ্রূর মাঝখানে কপালে ধরে রাখ এবং আমার পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে বসো।" আঙুল ধরার সঙ্গে সঙ্গে বাল্বটি জ্বলে উঠলো। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল – এ কি করে সম্ভব! একটি বিজ্ঞানের ছাত্রও সেখানে তখন উপস্থিত ছিল।

ঠাকুর হেসে বললেন – "শুধু টর্চের বাল্ব কেন, বড় ইলেকট্রিক বাল্বও জ্বালানো যায়, আজকাল যে রেডিও বেরিয়েছে তাও বিনা কারেন্টে বাজানো যায়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, আপন শক্তির কথা জানা থাকলে সবই সম্ভব। শুধু চর্চা করলেই হবে। 'আছে' শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে হবে।"

স্কুল খুলে গেছে - সে যাত্রা আর বেশীদিন থাকা হ'ল না। ঠাকুর কৃষ্ণনগরে ফিরে গেলেন, কিন্তু পড়াশুনার সময় কোথায়? – পাঁচ মিনিটের পথ বাড়ী থেকে স্কুল, ওইটুকু যেতেই এক ঘণ্টা সময় লেগে যায় ভক্ত-শিষ্যদের দর্শন দিতে দিতে।

সেবার, উঁচু জাতের হিন্দুরা, যাদের বর্ণ-হিন্দু বলা হয়, তো ভয়েই অস্থির। উঁচু জাতের হিন্দুরা নমঃশূদ্রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, মানুষের মধ্যেই ধরে না; সুতরাং ওরা ঠিক করলো - উঁচু জাতের হিন্দু আর রাখবে না, তাদের সমূলে নিধন করবে। নমঃশূদ্রেরা একবার খেপলে আর উপায় নেই, ওরা যেরকম দুর্দ্ধর্ষ, ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না, বর্ণ-হিন্দুরা শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং সবাই এসে ধরেছে – ঠাকুর! এ যাত্রা বাঁচাতে হবে। সব শুনে ঠাকুর হাইরা অর্থাৎ জগদীশ নম-কে ডেকে পাঠালেন। জগদীশ নম এককালে দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ ছিল, জলে তার সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল। একডুবে জলের তলায় গিয়ে নারকেল ভেঙে খেয়ে তারপর উঠতো, কোন অসুবিধা হ'ত না। শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু জগদীশ নম-র কাছে কিছু অসম্ভব নয়। ওর এক সাথীকে একবার কুমীরে ধরেছে, জগদীশ সাঁতরে গিয়ে কুমীরকে ধরে ফেললো, এক লাফে পিঠের ওপর চড়ে কুমীরের চোখের ভিতরে আঙুল দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চাপতে লাগলো। কুমীরটা বেকায়দা বুঝে তার সাথীকে ছেড়ে দিয়ে জগদীশকে নিয়ে পাড়ের দিকে ছুটলো। পাড়ের কাছে

আসতেই জগদীশ লাফিয়ে নেমে পড়লো। আর একবার, পুলিশ তাকে ধরবেই ঠিক করেছে - স্থল এবং জল-পুলিশ লঞ্চ নিয়ে তৈরী হয়ে এসেছে। জগদীশ জলে লাফিয়ে পড়ে ডুব দিল – অনেক দূরে উঠতেই জলপুলিশ তাড়া করলো, কিন্তু জলের মধ্যে তার কলাকৌশলের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠলো না। শেষ পর্যন্ত তাকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে তারা ফিরে গেল।

জগদীশ বহুদিন হ'ল দীক্ষা নিয়েছে। ঠাকুর তার কাছে দেবতাদের শিরোমণি। ঠাকুর উপস্থিত থাকুন আর নাই থাকুন, সে সমারোহ করে নিয়মিত জন্মোৎসব পালন করে যায়। ঠাকুর থাকলে তো কথাই নেই। ঠাকুরের কথা তার কাছে বেদবাক্য। এই তো কয়েক বছর আগে কুঞ্জ সাহার সদ্য-কেনা নতুন টিনের বাণ্ডিল কে নিয়ে গেছে। কুঞ্জ সাহা এসে ঠাকুরের কাছে কেঁদে পড়লো। ঠাকুর জগদীশকে ডেকে পাঠালেন। জগদীশ নির্দ্বিধায় বললো যে, সে বে'র করে দিতে পারে কে টিনগুলো নিয়েছে। ঠাকুর বললেন, "বারো বাঁধ টিনের মধ্যে অন্ততঃ ছয় বাঁধ ফেরত দেবার ব্যবস্থা কর।" আদেশ অমান্য সে করে না – সেই রাত্রে ছয় বাঁধ টিন কুঞ্জ সাহার পুকুরের মধ্যে রেখে আসার ব্যবস্থা করে দিল। এটা করতে পারবে না, ওটা করতে পারবে না – এই রকম নিষেধাজ্ঞা জারি করে কারো স্বাধীন ইচ্ছার ওপর ঠাকুর কখনও প্রভাব বিস্তার করেন না। স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে তার ভিতর একটা পরিবর্তন এনে দেন

এমনভাবে যে, সে তার অন্যায় বুঝতে পেরে নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে।

যাই হোক, যা বলা হচ্ছিল। জগদীশ নমকে সকলেই মানে, তা ছাড়া ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তার যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে, সে কথা সবাই জানে। ঠাকুর হাইরাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, "আরে হাইরা, এভাবে মারামারি করে কি কিছু করা যায় রে! তার থেকে এক কাজ কর। সবাইকে নিমন্ত্রণ কর আর ভোজের ব্যবস্থা কর। সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া কর।" হাইরা প্রতিবাদ করে না, বলে, 'কর্ত্তা, তুমি যা-বল'। একমাত্র ঠাকুরের কথাই সে শোনে – কারণ গোসাঁই-ই তার একমাত্র ভরসা। এইভাবে ঠাকুর একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করে দিলেন - বর্ণ-হিন্দুরাও জীবন রক্ষা হ'ল বলে ওদের সঙ্গে এক আসনে বসে খেতে আপত্তি করলো না।

একদিন কয়েকটি সাথী নিয়ে তিতাসের পাড়ে বসে আছেন, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে সাথীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। খেলাধূলা থেকে শুরু করে বলে চলেছেন মাটির কথা। প্রতিটি রেখা, প্রতিটি দাগ যা মাটির ওপর পড়ছে – এক একটা বার্তা বহন করে চলেছে। আমরা ভাবছি, মাটি ফেটে গেছে। সেই ফাটা দাগও এক একটা এক এক রকমের - বার্তাও তাদের বিভিন্ন। প্রকৃতির সব কিছুই এক একটা বার্তা বহন করে চলেছে। বিদ্যুতের চমকানিই কত রকমের, মেঘের আকৃতিও অনেক রকমের

– প্রতিটি রেখা বিভিন্ন বার্তা বহন করে চলেছে। কথার মধ্যেই ঠাকুর বললেন, ‘দেখতো, ওই হাঁড়ির মধ্যে কী?’ যে লোকটি হাঁড়িটি তিতাসের জলে ভাসিয়ে দিতে এসেছিল, সেই এগিয়ে এসে বললো যে, তার শিশু-পুত্র মারা গেছে, তাই সে জলে ভাসিয়ে দিতে এসেছে। ঠাকুর শিশুটিকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসতে বললেন। শিশুর দেহটি শক্ত হয়ে গেছে, অনেক আগেই মারা গেছে। হাতে একমুঠো বালি নিয়ে ঠাকুর শিশুর শবদেহে ছুঁড়ে মারলেন। শিশু ‘ট্যাঁ’ করে কেঁদে উঠলো। ঠাকুর বললেন, “যাও ওকে বাড়ী নিয়ে যাও। ও ভাল হয়ে গেছে।” [শিশুটির পিতা ওর নাম রাখল ‘হারাধন’। - সে এখনও জীবিত]

সাথীরা অবাক হয়ে সবকিছু দেখছিল। শিশুর পিতা চলে গেলে-পর তারা বালককে জিজ্ঞাসা করলো, “আচ্ছা ঠাকুর, শিশু তো অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে, ওর শব-দেহও শক্ত হয়ে গেছে। তুমি বুঝলেই বা কি করে, বাঁচালেই বা কী করে? লোকে যদি জানতে পারে, তবে কাতারে কাতারে মানুষ আসবে মৃতদেহ নিয়ে আর তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে আকুতি জানাবে।”

ঠাকুর বললেন, “কী করে জানলাম, জানতে চাও? ও যখন হাঁড়িটিতে মৃত শিশুটিকে ঘাটে নিয়ে এল, আমি শুনছি মৃতদেহের ভিতর কথা চলছে। আগুনে মৃতদেহ চড়ানো পর্যন্ত শবদেহের ভিতর চেতনা থেকে যায়। কেউ কখনই একেবারে মরে যায় না – চেতনা চলতে থাকে কিন্তু আগুনের তাপ বা বরফের শীতলতা

বোঝে না। ঐ অবস্থায় যদি কড়া চার্জ দেওয়া যায়, আবার সব কিছু সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওর ভিতর চেতনা অতি গভীরে কাজ করছে দেখে আমি একটু বেশী ডোজে চার্জ দিয়ে দিলাম। তাই বাচ্চাটা বেঁচে উঠলো। তবে সব সময়ে চার্জ দিয়ে লাভ নেই, কারণ তখনকার মত বেঁচে উঠলেও আবার অন্য কোন কারণে মারা যেতে পারে। প্রদীপে তেল থাকলেও অনেক সময় বাতাসের ঝাপটায় নিভে যায় - সেখানে জ্বেলে দিলে আবার জ্বলতে থাকে। যেখানে তেলেরই অভাব, সেখানে শুধু সলতেই পুড়বে, সুতরাং সেখানে জ্বালিয়ে লাভ নেই।”

ঢাকাতে কিছুদিন থেকে আবার ফিরে এসেছেন স্কুল জীবনে। মাঝে মাঝে মাইনে দিতে পারেন না - নাম কাটা যায়। ওপরের ক্লাসে বেতনও বেশী - পিতার যৎসামান্য উপার্জন থেকে নিয়মিত মাইনের টাকা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফ্রি বা হাফ-ফ্রি হওয়ারও উপায় নেই, কারণ স্কুলই হোক বা বাইরেই হোক, সকলেরই ধারণা ঠাকুরের পিতা সুরেন্দ্রচন্দ্র জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেন, সুতরাং তাঁর অবস্থা ভাল। জমিদারী সেরেস্তায় উপরি পাওনা তো কতকগুলো আছে! কিন্তু সুরেন্দ্রচন্দ্র এ বিষয়ে সাধারণের চেয়ে একটু অন্যরকম। তিনি তাঁর বেতন ছাড়া আর কিছু নেন না। মাঝে মাঝে নিজ নিজ ক্ষেতের চাল, ডাল, তরীতরকারী, কখনও বা নিজের বাড়ীর গরুর দুধ, বাড়ীর গাছের রস জ্বাল দিয়ে গুড় প্রভৃতি নানা রকমের জিনিস বালকবাবার

সেবার জন্য ভক্তেরা নিয়ে আসে। ভালবাসার এই দান ঠাকুর ফেলতে পারেন না – আর এই উপকরণ দিয়ে শিষ্যভক্তদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বালক ঠাকুরের কোন চাহিদা নেই, মুখ ফুটে কাউকে কোন দিন বলেন না - এটা দিতে হবে, ওটা দিতে হবে। তারা নিজে থেকে ঐকান্তিক আগ্রহে শাক-পাতা, গাছের ফল নিয়ে আসে বাবার জন্যে, তাই দিয়েই মাতা চারুশীলা প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। বাড়ীতে মাছ নেই, অনেক অতিথি এসে পড়েছে প্রসাদ পাবার আশায়, হাইরা এসে বলে, 'ঠাকুমা, কড়াই চাপান, আমি এখুনি মাছ নিয়ে আসছি।' সোজা গিয়ে সে ডুব দেয় তিতাসের জলে, জলের মধ্যে তড়িৎ গতিতে এগিয়ে গিয়ে খালি হাতে ধরে নিয়ে আসে দশ বারো সের ওজনের এক বিরাট কোরাল মাছ। সুতরাং ভক্তদের খাওয়াতে কোন অসুবিধা হয় না। হাইরার পরিবর্তন সকলের কাছেই অকল্পনীয়। সৎভাবে সৎপথে ব্যবসা করে সে উপার্জন করে, গুরুর নাম করে। আর সেই নামে বিভোর হয়ে দু'চোখ বেয়ে তার অশ্রু ঝরে। প্রতিটি ভক্তশিষ্য প্রাণ দিয়ে ঠাকুরকে ভালবাসে। আর ভালবাসবেই বা না কেন? এই স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা আর কে দিতে পারে? মানুষের জন্য, দেশের জন্য এত দরদ আর কার আছে? কে পারে ভক্ত-শিষ্যের সমস্ত বোঝা বহন করে নিয়ে চলতে? তবু মানুষ অপবাদ দিতে ছাড়ে না। শুধু এই অল্প বয়সের মধ্যেই কত ভাঙা সংসার

যে জোড়া দিয়েছেন, কত হতাশ মানুষের মধ্যে প্রাণের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন, তার হিসাব কে রাখে?

বিশেষ কাজে ঠাকুরকে আবার ঢাকা আসতে হয়েছে। যদুনাথ রায়ের বাড়ীতে দুই একদিনের জন্য রইলেন। একদিন রাত্রে যদুনাথ রায় এবং আর একটি শিষ্য যদুনাথ রায়ের বাড়ীর দোতলা ঘরে বসে আছেন। ঠাকুর তাদের চোখ বুজে জপ করতে বললেন, নিজেও ধ্যানে বসলেন। ঘরে ধূপধুনা জ্বলছে। জানলা দরজা সব বন্ধ। শিষ্য দুজনকে শূন্যধ্যান করতে বলেছেন। যদুনাথ রায় নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় শিষ্যটি মাঝে মাঝে চোখ মিটিমিটি করে দেখছে ঠাকুর কি করেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঠাকুরের সমস্ত দেহ জীবন্ত দ্যুতিতে পরিণত হ'ল এবং বিদ্যুৎ চমকানোর মত ঘরের ছাদ ভেদ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই ছাদের উপর ঢিপ ঢিপ শব্দ হতে লাগলো। ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন শব্দ শুনলে চোখ মেলতে। চোখ মেলে ওঁরা দেখেন ঠাকুর আসনে নেই। দরজা খুলে বেরিয়ে খোঁজাখুঁজি করে দেখলেন, ঠাকুর ছাদের চিলে-কোঠায় বসে আছেন, কিন্তু চিলে-কোঠায় যাবার কোন সিঁড়ি নেই যে ঠাকুরকে নামিয়ে আনবেন। কি করবেন বুঝতে পারছেন না, এমন সময় দেখেন ঠাকুর দিব্যি নেমে আসছেন। মনে হচ্ছে যেন তাঁর জন্য কেউ একটা সিঁড়ি করে দিয়েছে।

কি একটা উপলক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন মামাবাড়ী দোগাছিতে। প্রতিটি দিন তাঁর ব্যস্ততার মধ্য

দিয়ে কাটছে। ওখান থেকে আশেপাশের অনেকগুলো গ্রামে গেলেন শিষ্যভক্তদের আকুল আগ্রহে। একদিন শিষ্যভক্তদের সাথে দোগাছিতে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন। আলাপ করতে করতে হঠাৎ থেমে গেলেন - কিরকম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে তাঁর কাপড় কোমর পর্যন্ত ভিজে গেল। ঠাকুর বললেন, “দ্যাখ, তোদের জন্য কত খাটতে হয়। মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর কাঠের নৌকা ডুবে যাচ্ছিলো - বাঁচিয়ে দিয়ে এলাম।” দুই-একদিনের মধ্যেই খবর এল যে, মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর কাঠবোঝাই নৌকা মাঝ দরিয়ায় ডুবে যাচ্ছিল। নৌকায় জল উঠে গেছে - কাঠগুলো ভাসছে - বাঁচবার কোন উপায় নেই। হঠাৎ সেই অবস্থায় মনে হ'ল কেউ যেন নীচে থেকে ঠেলে নৌকাটিকে ভাসিয়ে রেখেছে এবং ক্রমশ: পাড়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কল্পনাতীত ভাবে রক্ষা পেয়ে মনোরঞ্জন ছুটে এসেছে ঠাকুরের কাছে। সে বুঝতে পেরেছে যে, একমাত্র ঠাকুর ছাড়া আর কারো পক্ষে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব নয়।

ঠাকুর ঢাকাতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্য। রোজই ভক্তেরা আসছে নতুন নতুন লোক নিয়ে - দীক্ষাও নিচ্ছে অনেকে। একজন ভক্ত এগিয়ে এসে বলছে, ‘ঠাকুর, তোমার কিছু প্রয়োজন আছে তো বলো, আমি কাল কলকাতা যাচ্ছি।’ ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, “যাওয়া ঠিক করে ফেলেছিস? না গেলে হয় না?” ভক্ত উত্তর দেয়, “হ্যাঁ ঠাকুর, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং

অন্যান্য অফিসাররা যাচ্ছেন, আমাকেও যেতে হবে। টিকিট কেনা হয়ে গেছে। রিজারভেশন হয়ে গেছে। কলকাতায় একটা জরুরী মিটিং আছে।” ঠাকুর একটু হেসে বললেন, “টিকিটটা ফেরৎ দেওয়া যায় না?”

ভক্ত – সে কি করে হয়? জরুরী মিটিং, সব বড় বড় অফিসাররা যাচ্ছেন, আমি না গেলে কি করে চলবে?

ঠাকুর – না, তোর গিয়ে কাজ নেই। টিকিটটা ফেরৎ দিয়ে দে, আর জানাশোনা যে সব কলকাতা-যাত্রী আছে তাদের সবাইকে বারণ করে দে, কাল যেন কলকাতা রওনা না হয়।

ভক্ত মুস্কিলে পড়লো। চেয়ারম্যান, অফিসার সব যাচ্ছে, এদিকে ঠাকুর যেতে নিষেধ করছেন – কি করবে সে? যাই হোক, ঠাকুরের নির্দেশমত জানাশোনা সবাইকে সে ওই ট্রেনে যেতে নিষেধ করে দিল। বালক ঠাকুর বলছেন, সুতরাং অনেকেই কলকাতা যাওয়া স্থগিত রাখল। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বীরেনবাবু কিন্তু কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, বললেন, ‘তোমাদের যত সব কুসংস্কার। আমি ও সব বিশ্বাস করি না। আমি কালই যাব। তুমি যেতে না চাও, যেও না।’

পরের দিন সময়মত কলকাতা অভিমুখী গোয়ালন্দ মেল ছেড়ে দিল। ঠাকুরের নির্দেশ যাদের কানে এসেছিল অথচ যারা বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি, এমনি কয়েকজন হাসিঠাট্টা করতে শুরু করলো, “বালক ঠাকুরের

কথা শুনে না এলে তো একটা দিন নষ্ট হ'ত। কই, কিছুতো হ'ল না।" কয়েকজন হাসি ঠাট্টা করতে করতে মাঝপথে নেমে পড়লো। ট্রেন এতক্ষণ ঠিকই চলছিল, বিপদের কোন আভাসই ছিল না। হঠাৎ মাঝদিয়ায় এসে একটি প্রচণ্ড শব্দে ট্রেনের গতি থেমে গেল। ...... তারপর শুধু হাহাকার,কান্না, চিৎকার। পরদিন বড়বড় হরফে খবরের কাগজে 'মাঝদিয়া ট্রেন এক্সিডেন্ট'-এর কথা বের হল [মাঝদিয়া ট্রেন ডিজাস্টার – এপ্রিল, ১৯৩৮]। সেই এক্সিডেন্ট থেকে কেউই রক্ষা পায়নি। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সদলবলে প্রাণ হারালেন, প্রাণ হারালেন আরও অনেকে। যারা বালক ঠাকুরের নির্দেশের কথা শুনে কলকাতা যাওয়া স্থগিত রেখেছিল, তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ভাগ্যিস যাইনি। কি বাঁচা বেঁচেছি!' যারা মাঝপথে নেমে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল তারাও বুঝলো, বালক ঠাকুরের কথা উপেক্ষা করার মত মূর্খতা আর নেই। মুখে মুখে ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লো এই করুণ কাহিনী। যারা বালক ঠাকুরকে জানে, তারা শুধু আফশোষ করে, 'ঠাকুরের কথা শুনলে অনেকেই আজও বেঁচে থাকতো। তাঁর কথা যে বিফল হয় না এটাতো অনেকেই জানে, তবু কেন তারা তাঁর কথা উপেক্ষা করতে গেল!' [আগে প্রায়ই, কোন অশুভ ঘটনা ঘটতে পারে মনে হলে ঠাকুর সকলকে জানিয়ে দিতেন। এই ভাবে অনেক ভক্ত-শিষ্য তাঁর রক্ষা পেয়েছে। এখন তিনি এসব বিষয়ে আর কোন কথা বলেন না। কারণ তিনি বলেন, 'তাহলে আমাকে এই সব নিয়েই

থাকতে হয়, আমি যার জন্য এসেছি, সে কাজ আর করা হয় না।']

।। কুড়ি ।।

পূর্ববঙ্গের গ্রামে-শহরে-গঞ্জে হিন্দু-মুসলমান যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতির অভাব নেই, আবার আছেও। কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবধানের জন্য একটা দুর্ভেদ্য অন্তরায়ও গড়ে উঠেছে। কিন্তু বালক ঠাকুরের কাছে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, আছে শুধু মানুষ-জাতি। তিনি সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখেন, তাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই তাঁর অনুরক্ত। কাঞ্চন মিঞা, সামাদ, মান্না মিঞা প্রভৃতি সকলেই ঠাকুরকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে - তাঁর উপদেশ-নির্দেশ মত চলে। বালক ঠাকুরের নির্দেশ তাদের কাছে শিরোধার্য, তার জন্য যত ত্যাগ স্বীকারই করতে হোক না কেন। একবার মান্না মিঞা কোন একটি ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল - ঠাকুর দেখলেন যে, এর পরিণাম শুভ হবে না। তিনি তাই মান্নাকে বললেন যে, তার মনে ব্যথা লাগবে জেনেও তিনি তাকে ও পথ মাড়াতে নিষেধ করছেন। মান্না সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

মান্না মিঞার বাবা দেখতে সুপুরুষ - বিরাট ধনী ব্যবসায়ী, ওই অঞ্চলের এক নামকরা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। ঢাকার নবাব পরিবারের মেয়ে বিয়ে করেছেন,

সুতরাং আভিজাত্যের দিক দিয়েও তিনি কোন অংশে কম ন'ন। বালক ঠাকুরকে তিনি নিজের ছেলে মান্নার থেকেও বেশী ভালবাসেন। তিনি কি দেখেছিলেন বা কি উপলব্ধি করেছিলেন তা' জানা নেই, তবে এইটুকু দেখা যায় যে, তিনি বালককে 'এঞ্জেল' বা খোদার পয়গম্বর বলে বিশ্বাস করেন এবং বালকের কথা কখনও ফেলেন না। বেশীর ভাগ মুসলমান জনসাধারণই ঠাকুরকে খোদার পয়গম্বর বলে ভাবে।

গ্রামে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি থাকলেও বাইরের প্রভাবে মাঝে মাঝে সম্বন্ধটা বিষিয়ে ওঠে - ফলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে যায়। রায়পুরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিল। তারপর নানাস্থানে দাঙ্গা বেধে যায়। মুসলমানরা এখন প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। তারা ঠিক করেছে অন্যান্য গ্রামের মত উজানচর-কৃষ্ণনগর গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে, একটা হিন্দুও রাখবে না। এর জন্য চল্লিশ হাজার মুসলমান প্রস্তুত। তাদের নেতা মান্না মিঞার বাবা। সকলেই মান্না মিঞাদের সাথে বালক ঠাকুরের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কথা জানে, সুতরাং ঠাকুরের বাড়ীর ওপর কোন হামলা হবে না, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এইজন্য সকলেই সেখানে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত। উপায়ান্তর না দেখে নায়েব ত্রৈলোক্য সোম বালক ঠাকুরকে ধরলেন, "তুমি-ই একমাত্র সব রক্ষা করতে পার। তুমি একবার মান্নাদের বাড়ীতে যাও।"

ত্রৈলোক্য সোমের অনুরোধে ঠাকুর গেলেন মান্নার বাবার কাছে। সব দেখে বুঝলেন - অবস্থা সাংঘাতিক। হাজার হাজার মুসলমান জমায়েত হয়েছে সেখানে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে - মান্না মিঞার বাবা সবাইকে নিয়ে তখন শলা-পরামর্শ করছেন, কি ভাবে কি করতে হবে। এমন সময় গিয়ে বালক উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে তিনি কাছে ডাকলেন। ঠাকুর তাঁর দাড়ি ধরে আদর করে বললেন, "এ সব কি হচ্ছে?" মান্নার বাবা বললেন, "কে, তৈলক্ষা পাঠিয়েছে? আমি জানতাম যে তোমাকে পাঠাবে - এটাই আমি ভয় করছিলাম।" ত্রৈলোক্য সোমের ওপর মান্নার বাবা বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না, কিন্তু ঠাকুরের পিতা সুরেন্দ্রবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বালক ঠাকুর এসেছেন - তাঁর কথা তিনি ফেলতে পারেন না। সব মুসলমানদের ডেকে বললেন, "এ হচ্ছে সাক্ষাৎ খোদার দূত। ও যখন এসেছে - আমাদের আর এগোনো হবে না। তোমরা এবারকার মত যার যার বাড়ী ফিরে যাও।" মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ঠাকুরকে চেনে, সুতরাং তারাও বুঝলো যে গোঁসাই-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। সে যাত্রা উজানচর-কৃষ্ণনগর গ্রাম সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থেকে মুক্তি পেল।

স্কুলে তখনও যান, গতবার ক্লাস নাইনের পরীক্ষা দিতে পারেন নি - এবার দেবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু পড়াশুনা ক'রবার সময় পান না। শিষ্য-ভক্ত এত বেড়ে গেছে যে তাদের উপদেশ-নির্দেশ দিতে, তাদের

সমস্যার সমাধান করতে করতেই তাঁর বেশীর ভাগ সময় কেটে যায়। প্রায়ই ঠাকুরকে বাইরে যেতে হয়; কখনও ঢাকা, কখনও মুন্সীগঞ্জ, ভাগ্যকুল, বারদী এবং অন্যান্য গ্রাম-গ্রামান্তরে, শহর-গঞ্জে। ভক্তদের আকুলতা ফেলতে পারেন না। গতবার যখন আড়াইহাজার থেকে ফিরছেন, সারা গ্রামে একটা শোকের ছায়া পড়লো, যাবার কয়েকদিন আগে থেকেই কান্নার রোল পড়ে গেল। বালক ঠাকুরের স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার সীমা কেউ পায় না, তাই তাঁকে পিতা-মাতার চেয়েও আপন মনে হয়।

দেশনেতা সুভাষচন্দ্র বসু এসেছেন ঢাকায় – ঢাকায় সদরঘাটে বিরাট সভা হবে [নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঢাকার মিটিং-এ ঠাকুরের ভাষণ শুনে যে মুগ্ধ হয়েছিলেন - সেই কথা নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এক সভাতে সম্প্রতি বলেছেন। ঠাকুর তখন নবীন যুবক]। ঠাকুরেরই কয়েকজন শিষ্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন। ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য ঢাকা এসেছেন। মিটিং-এ তাঁকে আমন্ত্রণ করা হ'ল। মিটিং-এর পর সুভাষ বসুর সাথে ঠাকুরের বেশ কিছুক্ষণ আলাপ - আলোচনা চ'লল। ঠাকুরের বেদের অপূর্ব তত্ত্ব শুনে সুভাষচন্দ্র অভিভূত হলেন। বালক ঠাকুরকে একটা বাহিনী তৈরী করতে বললেন, যাতে বেদের আদর্শ ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুভাষচন্দ্রকে ঠাকুর বললেন যে, এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যে কিছু হবে, তা তিনি মনে করেন না; দেশের স্বাধীনতা যাতে আসে তার জন্য সুভাষ যেন সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি

নে'ন। ঠাকুরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সুভাষ কলকাতায় ফিরে গেলেন।

ঠাকুর বেশ কিছুদিন ঢাকায় থেকে গেলেন। প্রতিদিনই শিষ্য-ভক্তদের ভীড় হয়। নানা উপদেশ-নির্দেশ দিতে দিতে সময় কেটে যায়। মাঝে মাঝে তত্ত্ব আলাপ করেন। সাবলীল তার ভঙ্গী, স্পষ্ট তাঁর অভিব্যক্তি, যুক্তিতে ভরা সেই অপূর্ব তত্ত্ব মানুষের মনে গেঁথে যায়।

প্রায় দু'বছর আগে যখন ঠাকুর ঢাকায় ছিলেন, একজন আধা-সন্ন্যাসী সপ্তাহে প্রায় চার-পাঁচ দিন করে ঠাকুরের কাছে আসতো - সে এক আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার গুরু ছিলেন এক 'আনন্দ' - তিনি নাকি অবতার সমতুল্য। সৌম্য চেহারার এই আধা-সন্ন্যাসীর গায়ে ছিল চাদর আর পরনে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় – সব সময়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকতো। মন দিয়ে ঠাকুরের আলাপ-আলোচনা শুনতো। একদিন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি সব সময়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকেন কেন?"

- আজ্ঞে, আমি কামত্যাগের সাধনা করছি। গুরুদেব বলেছেন - কাম চিরতরে বিদায় নিলেই অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছে যাব। অনুভূতি-সম্পন্ন লোকেরই সিদ্ধি-মুক্তি-নির্বাণের অধিকার জন্মে। - নীচের দিকে তাকিয়েই ভদ্রলোক বলেন।

ঠাকুর – আপনি কতদিন ধরে চেষ্টা করছেন?

ভদ্রলোক – আজ্ঞে, নয় বছর।

ঠাকুর – কামবর্জনের দিকে কতটা এগিয়েছেন?

ভদ্রলোক – এখনও চেষ্টায় আছি (হতাশার সুর ভেসে আসে)।

ঠাকুর – কতদিন লাগতে পারে বলে মনে হয় আপনার?

ভদ্রলোক – আজ্ঞে, তা তো জানি না।

ঠাকুর – একটা কথা আপনাকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করছি। যতই কামবর্জনের চেষ্টা করছেন, ততই কাম চাড়া দিচ্ছে না?

ভদ্রলোক – আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো দিচ্ছেই। মাঝে মাঝে স্বপ্নদোষও হচ্ছে। নানা জিনিস দেখার বাসনা হচ্ছে। কি যে করবো বুঝতে পারছি না।

লোকটি বেশ সহজ-সরল। কোনোরকম ছল-চাতুরী, মিথ্যা-প্রবঞ্চনার মধ্যে নেই। কোন কিছু গোপন না করে অকপটে ঠাকুরের কাছে সবকিছু স্বীকার করলো।

ঠাকুর – আপনার গুরুদেবকে জানিয়েছেন আপনার মনের অবস্থা?

ভদ্রলোক – আজ্ঞে হ্যাঁ। সব কিছু জানিয়েছি। তিনি শ্রীমদভগবদ গীতার দু'টি শ্লোকার্থ উদ্ধৃত করে বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রথমতঃ নিজের মানসিক চঞ্চলতায় বিক্ষিপ্ত হয়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। বায়ুকে আবদ্ধ রাখা যেমন দুঃসাধ্য, ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপজনক এই মনকে

নিরোধ করাও তেমন দুষ্কর।' শ্লোকটির মর্মার্থ উদ্ধৃত করে আমাকে বলেছিলেন, - দেখ, অর্জুনের মনেও সংশয় এসেছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সংশয় দূর করে দিয়েছিলেন যে উক্তিতে, সেই শ্লোকটির ভাবার্থই আমি তোমার কাছে তুলে ধরছি। শ্রীভগবান বলিলেন, 'চঞ্চল মনকে নিরোধ করা দুষ্কর। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাকে বশীভূত করা যায়।' এরপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমিও দৃঢ়ভাবে অভ্যাস কর, তাহলেই তোমার বৈরাগ্য হবে। তখন আর সাফল্য বিষয়ে কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না।" আমি তাই গুরুদেবের উপদেশমত চেষ্টা করে চলেছি।

ঠাকুর – দেখুন একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। এখনও যদি কিছু না করেন, আকাঙ্ক্ষা থেকে যাবে। আপনার গুরুকে বলবেন, এক সতেরো বছরের 'বালক' বলেছে, ইউনিভার্সাল ক্যালকুলেসনে (বিশ্বপ্রকৃতির গণিতে) একথা বলে না যে, কামবর্জন হয়। এ ব্যাপারে চেষ্টা অযথা।

এরপর প্রায় দু'বছর ঠাকুরের সাথে ওই ভদ্রলোকের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। সেদিন তিনি এসেছেন ঠাকুরকে দর্শন করতে। দেখা হতেই ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ কথাটা আপনি বলেছিলেন?"

ভদ্রলোক – আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছি।

ঠাকুর – কি বললেন তিনি?

ভদ্রলোক – আজ্ঞে, আমি কথাটা বলে আপনার কিছু পরিচয়ও দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যে আপনার কাছে যাতায়াত করি, সে কথা বলিনি। সব শুনে তিনি বললেন, ‘দেখ হে, কথাটা অযৌক্তিক নয়। তবে শাস্ত্রে যখন আছে কাম ত্যাগ হয়, তখন হতে বাধ্য।’ গুরুদেবের একথা শুনে আমার মনে একটা খটকা লেগেছে। তিনি বারে বারে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে শাস্ত্রবাক্যই উদ্ধৃত করছেন। কিন্তু একবারও নিজের সম্বন্ধে জোর করে বলতে পারলেন না, ‘কেন, আমার তো কাম নেই। আমি কাম জয় করেছি। তুমি ঐ বালকের কথায় কর্ণপাত করবে না। আমিই তো শাস্ত্রের প্রমাণ।’ একথা তো তিনি আমাকে বললেন না! সেইদিন থেকে আমি মনে মনে আপনাকেই খুঁজছি। জানেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘আপনি কি কামত্যাগ করেছেন?’ আমার কথায় তিনি অত্যন্ত ক্রূদ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, ‘তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয়, আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করছো! তোমার কিছুই হবে না।’ আমি আজ বুঝেছি, যা হবার নয়, তা আমারও হবে না, গুরুদেবেরও হয় নি। আমার তখনই আপনার কথা মনে পড়েছিল। এই ন’টি বছর নষ্ট ক’রলাম। কৌপীন কষতে কষতে ব্যথা হয়ে গেল। আর কিছুই হ’ল না। আপনি বলুন, এখন আমার করণীয় কি?

ঠাকুর – মা-বাবা আছেন তো?

ভদ্রলোক – আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠাকুর – ঘরে ফিরে যান। মা-বাবার প্রাণে এতদিন ব্যথা দিয়েছেন বলে ক্ষমা চেয়ে নিন। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বলছি, যে ছেলে মা-বাবাকে দুঃখ দিয়ে ধর্মের নামে বে'র হয়ে যায়, সে ধর্মের আসল তত্ত্ব কতটুকু বুঝতে পেরেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

কয়েকদিন পরে ভদ্রলোক তার মা-বাবাকে নিয়ে এল। ঠাকুরের কাছে এসে অঝোরে কাঁদছে তার বাবা-মা; বলছে, "ঠাকুর, তুমি আমাদের ছেলেকে ঐ আশ্রম থেকে ফিরিয়ে এনেছো। আমরা বহুবার গিয়েছি। আমাদের ছেলের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে দেয়নি।" বাবা, মা ও ছেলে তিনজনেই দীক্ষা নিল। মা-বাবা আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছে, "এখন কি করবো ঠাকুর?"

ঠাকুর বললেন, "ছেলের বিয়ে দাও। যে ছেলে মা-বাবাকে অশ্রদ্ধা করে, আমি সেই ছেলেকে ছেলে বলি না।"

ছেলের বাবা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলো, "আমার ব্যবসায়ে ছেলেকে নামিয়ে দিই?"

ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, তাই দাও [এর প্রায় দেড় বছর পরে, সেই ভদ্রলোক তার বাচ্চার মুখে ভাত দিতে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এসেছে। বাবা-মাও সঙ্গে এসেছে। ঠাকুর রগড় করে বলেন 'এ আবার কি? এটা কি কাম বর্জনের চিহ্ন?' ভদ্রলোক আফশোষ করলেন কিভাবে জীবনের অমূল্য বছরগুলো নষ্ট হয়ে গেছে! (কড়া চাবুক অবলম্বনে)]।" ....

সেবার দোগাছি গ্রামে গেছেন। ঠাকুরের সোনামামা হেরম্বনাথ তর্কতীর্থও এসেছেন দেশের বাড়ীতে। একদিন মামার ইচ্ছা হয়েছে ভাগ্নের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করবেন। অষ্টসিদ্ধির মধ্যে সবচেয়ে বড় যে শক্তি, সেই অণিমাশক্তির বিকাশ তিনি দেখতে চাইলেন। মামা-ভাগ্নের কথা হচ্ছিল দোগাছি বাড়ীর ঠাকুরঘরে বসে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দেখলে আপনি খুশী হবেন, বলুন।" হেরম্বনাথ বললেন, "আচ্ছা, এক কাজ কর, এই বদ্ধ ঘর থেকে তুমি দরজা জানলা না খুলে বহির্গত হও।" ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, মামা।" ঠাকুর-ঘরে দু'জনে বসে আছেন দরজা-জানলা বন্ধ করে। মুহূর্তের মধ্যে মামা দেখলেন, ঠাকুর পূজার ঘরের সব উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম সহ শূন্যে মিশে গেলেন। ঘর প্রায় খালি - মামা একা বসে আছেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বালক ঠাকুর ফিরে এলেন তাঁর আসনে। ঘরটি আবার ভরে উঠল পূজার সাজ-সরঞ্জাম, উপকরণাদিতে। মামা আশ্চর্য হয়ে ভাগ্নের প্রশংসা করতে লাগলেন।.......

ঢাকা থেকেই আবার পাহাড়ের দিকে রওনা হলেন। দার্জিলিং-এ লামার বাড়ীতে দুই একদিন থেকে লামা সন্ন্যাসীর সঙ্গে রওনা হলেন তিব্বতের কাছে এক পাহাড়ে। এই পাহাড়ে বারো বছর পর পর সাধক-মহানদের আলোচনা সভা বসে। সেখানে দেহী-বিদেহী অনেক সাধকের সমাগম হয়। লংটং পাহাড়ের এক

জায়গায় সভা বসেছে। ঠাকুরও গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। সকলেই নানা আলোচনা করছেন - বেশীর ভাগই তাঁরা নির্দ্দিষ্ট সাধনার পথ ধরে কথা বলছেন - যোগসাধনার কথা, তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। তাঁরা এই জাগতিক জীবন সম্বন্ধে বেশী উৎসাহ দেখান না - দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, থাকবেও - সবাই তো মরে যাবে, কেউই তো থাকবে না, সুতরাং মানুষদের দুঃখদুর্দশার অবসান করতে ওঁরা বেশী আগ্রহী নন। তা ছাড়া সবটাই তো আর দৈবের থেকে হয়নি, বেশীর ভাগ দুঃখদুর্দশা মানুষের নিজের তৈরী। সুতরাং সেখানে হস্তক্ষেপ করে সময় নষ্ট না করে তাঁরা সাধনার পথে এগিয়ে যেতে চান। আত্মোন্নতির দিকেই তাঁদের বেশী নজর। তাই তাঁদের আলোচনা বেশীর ভাগই চলে শাস্ত্র-গ্রন্থের ওপর।

বালক ঠাকুরকে তাঁরা সবাই জানেন - শিবের অংশ তাঁর মধ্যে আছে, তা না হলে লং পাহাড়ের সেই বহু যুগ আগে পোঁতা ত্রিশূল একটানে তুলে ফেললেন কি করে! এর পূর্বে অনেকে সংঘবদ্ধ হয়ে দশ বারোজনের শক্তি দিয়েও, দড়ি বেঁধে ত্রিশূলটি টেনে তুলতে চেষ্টা করেছেন - কিন্তু পারেন নি। এটা অবশ্য বাইরের জগতকে বোঝানোর জন্য ঐশ্বরিক শক্তির একটা প্রকাশমাত্র। অন্তরের অনুভূতি রাজ্যে সবাই তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বালক ঠাকুর জন্মগত সুর নিয়ে এসেছেন - তাঁর কথাই আলাদা। সুতরাং বালক ঠাকুর যখন আলাপ করতে শুরু করলেন, তাঁরা বললেন, ‘তুমি তো ত্রিকালজ্ঞ,

তোমার আগেরটাও জানা আছে, পরেরটাও জানা আছে। তোমার বাক্যই শাস্ত্রবাক্য।'

ঠাকুর বললেন, "দেখ, শাস্ত্রগ্রন্থ আমার পড়া নেই। আমি থাকি প্রকৃতির সুর, প্রকৃতির গ্রন্থ নিয়ে। যে জন্মগত সুর নিয়ে এসেছি সেই সুরের কথাই আমি বলতে পারি।" ঠাকুর বললেন যে, এই বিশ্বজগতে যে মহাচৈতন্যের সুর বয়ে চলেছে - সেই সুরের ধারায়, সেই গতির ধারায় জীবজগতের সৃষ্টি। তাই সেই সুর, সেই গতি সদাসর্বদা সবার মাঝে চলছে। তার জন্যই পরিবর্তনের মাঝে পরিবর্তিত হতে হতে, রূপ থেকে রূপে রূপান্তরিত হতে হতে সবাই চলেছে অনন্ত গতির পথে। এই দেহ সেই সুরেরই সাড়া, সুতরাং আমাদের সাধনা যা কিছু সবই সেই অনন্ত সুরের সঙ্গে এক গতিতে মিলবার জন্য। এই দেহবীণাই তাই বাজিয়ে যেতে হবে। সেই সুরের সাথে তোমার সুর যখন একসুরে আসবে, তখন নিজেরাই সুরময় হয়ে যাবে। সব কিছুর সমস্যার সমাধান তখন আপনিই হয়ে যাবে..........।

পাহাড়েই একটা গুহার মুখে বিরাট বিরাট বিষাক্ত সাপ কিলবিল করছে, কেউ সাহস করে গুহার কাছে যায় না। লোকে বলে ভিতরে অনেক গুহ্য জিনিস আছে। ভিতরে কয়েকটি পাথরের আসন পাতা। ঠাকুর ইতস্ততঃ না করে এগিয়ে গেলেন সাপগুলোকে এড়িয়ে। ভিতরে গিয়ে তিনি সব দেখলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন। জায়গায় জায়গায় বিরাট বিরাট যোগী

পুরুষরা ত্রাটক যোগ ক'রে বসে আছেন, বয়স তাঁদের নির্ণয় করা সম্ভব নয় - অন্যত্র কেউ কেউ মাটি চাপা পড়ে গেছেন। কৃচ্ছ্রসাধন আর যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়েই তাঁরা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে সচেষ্ট। দেহের অন্য কোনরকম চাহিদা নেই, শুধু রক্ত চলাচল করছে। এইভাবে বহু বছর ধরে তাঁরা বসে আছেন, যাতে এই জন্মেই তাঁদের অভীষ্ট পেয়ে যান। ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁদের সাধনা ঠিক পথে চলছে কিনা। বালক ঠাকুর হচ্ছেন দৈবের মানুষ, প্রকৃতির সঙ্গে বিরাট যোগাযোগে প্রতিষ্ঠিত, আর এঁরা হচ্ছেন যোগসাধনে রত যোগী। ঠাকুর বলেন, "এতদিন যখন যোগ সাধনা করে এসেছো, তখন তোমাদের পথেই তোমরা থাক।" ঠাকুরের কথা শুনে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন।........ নানা জায়গা ঘুরে ঠাকুর শেষে দেশে ফিরলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার বেরোতে হ'ল। ঢাকা, মৈমনসিং প্রভৃতি অনেক জায়গা পরিক্রমা করে গেলেন শেষে আড়াইহাজার গ্রামে। সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, প্রায়ই ঘরোয়া পরিবেশে ক্লাস করেন। ভক্তশিষ্যদের অদম্য উৎসাহ, তাঁর কথা শুনতে বহু লোক আসে। গ্রামদেশ - বেশী রাত্রিতে রাস্তায় লোক খুবই কম থাকে। তাই সবাই তাড়াতাড়ি দর্শন শেষ করে চলে যায়। হেমেন্দ্র চৌধুরী বাইরে দাঁড়িয়ে একদিন পাহারা দিচ্ছেন যাতে ঠাকুরের ঘরে কেউ না ঢোকে, এমন সময় তিনি ঠাকুরের গলা শুনতে পান – পরিষ্কার ইংরাজীতে তিনি কার সঙ্গে যেন

কথা বলে চলেছেন। হেমেন্দ্র চৌধুরী আশ্চর্য হয়ে যায়, ঠাকুর কোথা থেকে এত ইংরাজী শিখলেন যে অনর্গল ইংরাজী বলে চলেছেন! কৌতুহলবশে হেমেন্দ্র চৌধুরী দরজা ফাঁক করে ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঠাকুর মনে হ'ল একটু বিরক্ত হয়েছেন। হেমেন্দ্র চৌধুরীর বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "তুমি সব নষ্ট করে দিলে, আমি একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে দেহীই হোক, বিদেহীই হোক, যেখানেই হোক - তার সঙ্গে আলাপ করছিলাম। সে যাতে শুনতে পারে, বুঝতে পারে সেই ভাবেই বলছিলাম। কাকে বলছিলাম, সে বিষয়ে কিছু বলতে চাইছি না।" হেমেন্দ্র চৌধুরী শুনে ক্ষমা চাইলেন - বললেন যে, তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি বুঝলেন যে, নিজে যেমন চিন্ময় দেহ ধারণ করে ঠাকুর যেখানে খুশী, যত দূরে খুশী যেতে পারেন, তেমনি আবার অন্যকেও চিন্ময় দেহে নিয়ে আসতে পারেন বা দূর থেকেই কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারেন [ইস্টবেঙ্গল টাইমস পত্রিকায় (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৩) এই প্রসঙ্গে 'একজন আমেরিকানের সঙ্গে কথা বলছিলেন' – বলে লিখিত আছে। ঠাকুর যে বিষয়ে নীরব থাকতে চাইছেন, সেখানে কারও নাম করে বলতে চাই না - সে ব্রিটিশই হোক বা আমেরিকানই হোক। মোট কথা ইংরাজী জানেন না, তবু সেই মুহূর্তে সাবলীল ভঙ্গীতে ইংরাজী কথাবার্তা চালিয়ে গেছেন]।

রাজেন চৌধুরীর আর এক ছেলে ভূপেন্দ্র চৌধুরী ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। ঠাকুর আড়াইহাজার থেকে নৌকাযোগে উজানচর-কৃষ্ণনগর রওনা হলেন, সঙ্গে ভূপেন্দ্র এবং দু'জন ভক্ত। নানারকম আলাপ করতে করতে চলেছেন ঠাকুর; হঠাৎ আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়াতে ঠাকুর বলে উঠলেন, "সাবধান! ঝড় উঠবে।" খটখটে রোদ - আকাশে কোথাও কিছু নেই, সব পরিষ্কার। হঠাৎ আকাশ কালো করে ঝড় উঠলো। একে মেঘনা নদী, তার ওপর আবার ঝড় - সাংঘাতিক অবস্থা! নৌকার ছই উড়িয়ে নিয়ে গেল, হাল ঠিক রাখতে গিয়ে বৈঠা গেল ভেঙে। নৌকা বেসামাল ভাবে স্রোতের টানে পাক খেতে খেতে চলতে লাগলো। মাঝ দরিয়ায় রক্ষা পাওয়া অসম্ভব, তাও আবার মেঘনা নদী। ঠাকুর ভূপেন্দ্রকে বললেন, "জলে নাম।" সে বললো, "কি বলছো, ঠাকুর?" ভূপেন্দ্র জানে যে, এই ঝড়ো অবস্থায় মেঘনা নদীর অতলস্পর্শী জলে নামার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। তাই সে ইতস্ততঃ করতে লাগলো। এদিকে ঠাকুরের আদেশ! কি করে? ঠাকুর এবার ধমক দিয়ে বললেন, "নামলি না? জলে নাম।" আদেশ অমান্য করতে পারে না, অগত্যা ভূপেন্দ্র জলে নামলো। কিন্তু এ কী! এ যে মাত্র হাঁটু জল, কি করে এটা সম্ভব হ'ল? সে আশ্চর্য হয়ে যায়! অবাক হয়ে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে ভূপেন্দ্র বলে, 'ঠাকুর, এ কি করলে?'

ঠাকুর বললেন, 'এবার নৌকা টেনে নিয়ে যা।' ভূপেন্দ্র নৌকা টানতে টানতে নিয়ে গেল। মাঝি তো

হতবাক, হাঁ করে দেখছে এই অদ্ভুত ঘটনা – এ কী করে সম্ভব! সম্ভ্রমে বার বার সে ঠাকুরকে সেলাম করছে। সেই থেকে ভূপেন্দ্রকেও আর দ্বিতীয়বার বলতে হয় না। ঠাকুরের নির্দেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাস। বালক ঠাকুর বড়দিনের ছুটিতে দোগাছিতে এসেছেন এবং তখন পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে ফিরে যান নি। বুড়ী দিদিমা ও কমলা মাসীমার বালক ঠাকুরের ওপর যেমন অগাধ বিশ্বাস, তেমনি অদ্ভুত টান। দিদিমা রোজ রাত্রে চোর-ডাকাতের হাত থেকে বাড়ী রক্ষা করতে নাতির নাম উচ্চারণ করে বাড়ীর চারিদিকে জল ছিটিয়ে দেন। তাঁর বিশ্বাস যে, চোর-ডাকাত আর বাড়ীতে ঢুকতে পারবে না এবং সত্যিই তাই। দেখা যায় নাতির নাম উচ্চারণ করে যে গণ্ডী দিয়ে দেন, তার ভিতর চোর-ডাকাত আর ঢোকে না। কারও গলায় হয়তো কাঁটা ফুটেছে, নাতি 'বীরু'র নাম উচ্চারণ করে গলায় হাত বুলিয়ে দেন, আর তাতেই যন্ত্রণার অবসান হয়। কারও অসুখ করেছে বা কারও কিছু হারিয়েছে, 'বীরু'র নাম উচ্চারণ করে ওষুধ দেন বা 'জল-পড়া' দেন, তাতেই আশ্চর্য ফল ফলে যায়। দিদিমার এই প্রিয় নাতিটি একদিন বসে সবার সঙ্গে ঘরোয়া কথা বলছেন, এমন সময় দিদিমা তাঁর মনের ইচ্ছা জানালেন, "দেখ বীরু, আমি যেন গঙ্গার পাড়ে মরি!" দিদিমা-নাতি সম্পর্ক, তাই ঠাকুর অনেক সময় দিদিমার সঙ্গে বেশ রগড় করেন। তিনি বললেন, "বুড়ো তো ঢাকায় আছে,

[ঢাকা থেকে মাঝে মাঝে ঠাকুর কলকাতা আসা-যাওয়া করতেন। সেবার কলকাতা আসার সময়ে দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। দিদিমা তো ভীষণ খুশী – একে তো গঙ্গাদর্শন করতে পারবেন, তার ওপর আবার তাঁর আদরের নাতির সঙ্গে যাচ্ছেন। দিদিমা বুঝতে পারেন না যে ষ্টীমারের ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন; সেখানে আর কোন যাত্রী নেই দেখে জিজ্ঞাসা করেন, 'ষ্টীমারে আর কোন লোক নেই?' ঠাকুর দিদিমাকে একটু বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখান যাত্রীর ভীড়। কলকাতা পৌঁছে কিছুদিনের মধ্যে দিদিমা অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কয়েকদিন রোগে ভুগে গঙ্গার তীরে দেহ রাখলেন (৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল)। সুতরাং তিনি আর তাঁর নাতনী গীতা দেবীর (ঠাকুরের ছোট বোন) বিবাহ দেখে যেতে (১১ই ফাল্গুন) পারলেন না।] তুমি কি করতে গঙ্গার পাড়ে যাবে?" দিদিমা বললেন, 'বুড়ো সেখানেই থাক, আমি গঙ্গার পাড়ে মরতে চাই।' ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে, তুমি গঙ্গার পাড়েই মরবে।" ঠাকুরের মাসতুতো ভাই অনঙ্গ ভট্টাচার্য্যও সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন। মাসতুতো ভাইদের মধ্যে অনঙ্গের সঙ্গেই ঠাকুরের বেশী হৃদ্যতা ছিল। তিনি প্রায় ঠাকুরের সাথে সাথে-ই ঘুরতেন। অনঙ্গের মত মেধাবী ছাত্র খুবই কম দেখা যায় – যে জিনিস একবার তিনি পড়তেন, তাই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। অনঙ্গ ঠাকুরকে ধরলেন, "বীরুদা, দিদিমাকে তো কথা দিলে - তিনি গঙ্গার পাড়ে দেহ রাখবেন। এবার আমাকে একটা কথা দাও যে,

আমার মৃত্যুর সময় তুমি আমার পাশে থাকবে।” ঠাকুর আস্তে আস্তে বললেন, “ঠিক আছে অনঙ্গ, তাই হবে। তুই যখন বলছিস, তোর মরবার সময় আমি তোর কাছেই থাকবো।”

ঠাকুরের ছোট মাসীমা থাকেন চট্টগ্রামে। মেসোমশাই কৃষ্ণপ্রসন্ন সপ্ততীর্থ ছিলেন বিরাট পণ্ডিত। তিনি যখন পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন, কাশী থেকে তাঁর অধ্যাপক লিখলেন, ‘কৃষ্ণপ্রসন্ন, তুমি আর পরীক্ষা দিও না, তোমার পরীক্ষার খাতা দেখবার মত উপযুক্ত লোক নেই।’ চিকিৎসক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট নামডাক। এই ধরণের দক্ষ কবিরাজ খুবই বিরল। জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি চট্টগ্রামে কাটান [শেষে কৃষ্ণপ্রসন্ন সপ্ততীর্থ এসে কলকাতায় বসলেন। তাঁর মত নাড়ীজ্ঞান প্রায় দেখাই যেত না। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং রোগাক্রান্ত, দুঃস্থ মানুষের ভীড় ক্রমশ: বেড়েই চললো। তাঁর ওষুধে কথা বলতো – এমন ধন্বন্তরী ওষুধ সে যুগে খুবই কম মিলতো। কিন্তু বেশী দিন তিনি দুঃস্থ মানুষের সেবা করতে পারলেন না। দুরারোগ্য ব্যাধি অকালে তাঁর জীবনের অবসান ডেকে আনলো]।

চট্টগ্রামের দৃশ্য, পরিবেশ ঠাকুরের বেশ ভাল লাগতো। তীর্থের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না, চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে আকৃষ্ট করতো। এদিকে অনঙ্গের সঙ্গে কথার পর মাত্র কয়েক

মাস কেটেছে, ঠাকুর ঠিক করলেন চট্টগ্রাম যাবেন এবং সম্ভব হলে অনঙ্গকে নিয়ে পাহাড়টা একবার ঘুরে আসবেন। কিন্তু চট্টগ্রামে পৌঁছে দেখলেন অনঙ্গ ভট্টাচার্য্যের জ্বর – দেখা গেল টাইফয়েড হয়েছে। কিছুদিন ভুগে অনঙ্গ বেশ ভাল হয়ে উঠলেন, চলাফেরা করতেও শুরু করলেন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অসুস্থতা থেকে আর তিনি আরোগ্যলাভ করলেন না। অনঙ্গ মারা গেলেন –মরার সময় তাঁর হাত ধরে ঠাকুর বিছানার পাশে বসা। এইভাবে অনঙ্গকে যে কথা দিয়েছিলেন, তা রাখলেন। উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে স্নেহপরায়ণ মাসীমা ও মেসোমশাই দুজনেই ভেঙে পড়লেন। ঠাকুর ওখানেই রয়ে গেলেন - শোকার্ত পরিবারকে নিজেই রান্না করে খাওয়ান এবং কথাবার্তায় মাসীমা মেসোমশাইকে ভুলিয়ে রাখেন। ঠাকুরের উপস্থিতিতে তাঁদের পুত্রশোক অনেকটা লাঘব হয়ে যায়।

চিকিৎসাশাস্ত্রে সপ্ততীর্থের যেমন অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি ছিল, তেমন ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক বিষয়ে জানার আগ্রহ। হয়তো আগেই তিনি ঠাকুরকে কিছুটা বুঝেছিলেন, এখন তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝলেন যে, তাঁর এই কনিষ্ঠ আত্মীয়টি সাধনপথে অনেকদূর পর্যন্ত সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবেন।

ঠাকুর উজানচর-কৃষ্ণনগরে ফিরে এসেছেন। নানা সমস্যায় তাঁকে ঘিরে ধরেছে। বড় ভাই চট্টগ্রামে

মাসীমার বাড়ী থেকে পড়াশুনা করছিলেন। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেছেন এবং ঢাকায় আই.কম-এ ভর্তি হয়েছেন। ছোট ছোট তিন ভাই-বোন। পিতার যৎসামান্য আয় - সংসার চলে না। তার ওপর আবার বালকের স্কুলের মাইনে যখন এক টাকা বারো আনা ছিল, কষ্টে তিনি চালিয়ে নিতেন, কিন্তু ওপরের ক্লাসে যখন আড়াই টাকা মাইনে হ'ল, তিনি আর মাইনে দিয়ে উঠতে পারেন না। বই কেনার পয়সা নেই - পুরানো বই দিয়ে যে চালাবেন তারও উপায় নেই - অনেক পাতাই নেই। অন্য বই থেকে লিখে নেওয়ারও সময় নেই। তার ওপর ভক্তশিষ্যদের চাপ এত বেড়ে গেছে যে, পড়াশুনা করার সময় পান না। প্রায়ই তাঁকে এদিক-ওদিক যেতে হয়। মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে একদিন খোলাখুলি কথা হ'ল। ঠাকুর যা বললেন, মাস্টারমশাই একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। ঠাকুর বললেন যে, যে শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের উন্মেষে সহায়তা করেনা, যে শিক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বড় করে দেখতে শেখায় এবং ব্যাপ্তির কথা, দেশের কথা উপেক্ষা করে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর করে তোলে, সে শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? যে শিক্ষা দেশাত্মবোধ জাগাতে পারে না, দশের জন্য আত্মত্যাগ করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, সেই শিক্ষায় লাভ কি? তবু পড়তে হয়, তাই তিনি পড়া ছাড়েন নি। কিন্তু সবদিক দিয়েই যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হ'ল, তাতে তাঁর পক্ষে পড়াশুনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। এদিকে নামকরা গণিতশাস্ত্রবিৎ নিবারণবাবুও অন্যান্য

মাষ্টারমশাইদের মত ঠাকুরকে ভালবাসেন। তাঁর মতে তাঁর দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় অনেক ভাল ভাল ছেলে পেয়েছেন, কিন্তু বালকের মত এত মৌলিকত্বে ভরা, প্রতিভাবান ছাত্র তিনি পাননি। বালক যদি পড়াশুনা করেন, তবে শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবীকে একটা নতুন জিনিস দিয়ে যেতে পারবেন। বালকের আর্থিক অবস্থার কথা যখন জানতে পারলেন, তিনি দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি যদি আগে জানতেন, বালকের পড়াশুনার সব খরচ নিজেই বহন করতেন। কিন্তু তখন আর উপায় নেই; বালক স্থির করে বসেছেন যে তিনি স্কুলের পড়া ছেড়ে দেবেন। যিনি তাঁর অভাবের কথা কাউকে বলেন না, এমন কি পিতাকেও সবসময়ে জানতে দেন না, তিনি যে অন্য কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন, এটা অকল্পনীয়।

ক্লাস নাইনের পরীক্ষা আর দিয়ে উঠতে পারলেন না। স্কুল থেকে বিদায় নিলেন। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ওপর তাঁর তেমন আস্থা নেই, তবু অনেকে বলছে, তাই একবার ইচ্ছে হ'ল প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে দেবেন। কয়েকমাস দেখে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর আর পড়াশুনা করবার অবসর হবে না। - এই কয়েক মাসের মধ্যে নানা কাজে তাঁকে একবার চট্টগ্রাম, একবার ঢাকা, একবার মুন্সীগঞ্জ, - একবার গ্রাম, একবার শহর করে বেড়াতে হচ্ছে - বইয়ের পাতা উলটে-পালটে দেখারও আর সময় হচ্ছে না। তাই শেষ পর্যন্ত

গ্রন্থজগতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নামতে হ'ল। তথাকথিত শিক্ষাজগতের দরজা তাঁর কাছে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। পূজার ছুটির কয়েক দিন আগেই গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে শহরের পরিবেশে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আসন্ন বিদায়ের ক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, ততই সবার মনে একটা বিষাদের ছায়া এসে ঘিরে ধরছে।

উজানচর-কৃষ্ণনগর ছেড়ে যাওয়ার আগের দিন রাত্রে অনেকে বালক ঠাকুরের কাছে আসেন। মাস্টারমশায় প্রকাশ বল, আশু সেন, ত্রৈলোক্য সোম এবং আরও অনেকে আছেন তার মধ্যে। সকলেই দুঃখ করছেন - ঠাকুরকে আর এমনি করে তাঁদের মধ্যে পাবেন না। সকলেরই চোখে জল। বালক কথার মোড় ঘুরিয়ে অতীত দিনের আনন্দমুখর এক-একটি দিনের কথা তুলে সবাইকে সজীব করে তুলেছেন। সকলেই সোৎসাহে সেই অতীত দিনের কথা একসঙ্গে বলতে শুরু করেছেন; ভুলে গেছেন তাঁদের দুঃখ-শোক। এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ নজর করেন নি কি ঘটছে। হঠাৎ প্রকাশ বাবু বলে উঠলেন, ‘আরে! কোনটা তুমি?’ সবাই দেখছেন, একই চেহারার পাঁচ-ছয়জন বালক ঠাকুর তাঁদের সামনে বসে কথা বলছেন। ঠাকুর বলছেন, “আমি একেও আছি আবার বহুত্বেও আছি, সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকুন - দুঃখ করবার কি আছে!”

বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত। প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া কি সহজ? এ তো নিছক গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ নয় - এ যে প্রাণের সম্পর্ক - এ যে অন্তরের সম্পর্ক, স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা! প্রতিটি মানুষ যে তাঁর কাছে অতি প্রিয়, অতি আপন জন! প্রত্যেকেই তাঁকে একান্ত আপন অন্তরের জন বলে জানে। আর সেখানে এক বিরাট শূণ্যতা সৃষ্টি করে বালক ঠাকুর চলে যাচ্ছেন দূরে। আর দেখা হবে কিনা জানা নেই - দেখা হলেও এই স্বচ্ছ সহজ পরিবেশের মাঝে কি তাঁকে আর পাওয়া যাবে! অপরিসীম ব্যথায় বুক ফেটে কান্না এসে পড়ে, বলতে ইচ্ছা হয়, ‘তুমি আমাদের পিতা-মাতা, তুমি আমাদের অন্তরের সর্বস্ব - কি করে তোমায় আমরা বিদায় দেব?’ বালকের মধ্যেও সেই ভাব ফুটে ওঠে; আরো স্বচ্ছতা, আরও গভীরতায় ভরা সেই বিচ্ছেদের সুর - গণ্ড বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা।

ধীরে ধীরে তাদের আদরের গোসাঁইকে নিয়ে লঞ্চ এগিয়ে চললো তিতাসের তরঙ্গমালা অতিক্রম করে। অসহনীয় দুঃখব্যথায় ভক্তেরা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অনুসরণ করে লঞ্চের গতিপথ। ধীরে ধীরে দৃষ্টির সীমারেখা পেরিয়ে লঞ্চ চলে যায় বহুদূরে। উজানচরের সেই চিরপরিচিত ঘাট আর দেখা যায় না, তবু কি বালক দৃষ্টি ফেরাতে পারেন? তাঁকে শেষ দেখা দেখার জন্য ঐ যে শিয়ালের দল, জাতি সাপ নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলেছে - তারা তো তাঁর কাছে কম আপন নয়! তিনি যে সবারই,

তিনি যে পরম হিতৈষী, আশ্রিতের পরম আশ্রয়, - যাঁর অনন্ত ভালবাসার নিশ্চিন্ত ছায়ায় শুধু মানুষ নয়, বনের পশু-পক্ষীও পরম শান্তির ছোঁয়াচে ভরপুর হয়ে আছে। তাই তো তাঁকে দেখার শেষ নেই, জানার শেষ নেই - যত দেখে ততই দেখতে ইচ্ছা করে, যত জানে ততই জানতে ইচ্ছা করে ..... শেষ-বিহীনের সঙ্গ ও সঙ্গীতের জন্য এ যে অদম্য পিপাসা, অসীম আকুলতা ....।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

রাম নারায়ণ রাম
লহ প্রণাম